ইতিহাস কথা কয়

আবুল হোসেন ভট্টাচার্য

www.pathagar.com

ইতিহাস কথা কয়

আবুল হোসেন ভট্টাচার্য

জ্ঞান বিতরণী

www.pathagar.com

স্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা-২০১১

প্রচ্ছদ
রোমেল

প্রকাশক
মোহাম্মদ সহিদুল ইসলাম

জ্ঞান বিতরণী
৩৮/২-ক বাংলাবাজার মান্নান মার্কেট (৩য় তলা)
ঢাকা-১১০০, ফোন ঃ ৭১৭৩৯৬৯

অক্ষরবিন্যাস
জন্মভূমি কালার স্পট

মুদ্রণ
নূর প্রিন্টার্স
১০/১ বি, কে দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

যুক্তরাজ্য পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

মূল্য
২০০ টাকা U.S.$-5.00

ETIHASH KATHA KAY
By Abul Hossain Bhattachajjy
Published By Mohammad Shahidul Islam
Gyan Bitaroni, 38/-2ka Banglabazar
Dhaka-1100, Tel : 7173969

ISBN : 984-8747-88-5

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য বইসমূহ

১। বিশ্বনবীর বিশ্বসংস্কার
২। রোযাতত্ত্ব (১৯৪৬)
৩। মরুর ফুল (কাব্য, ১৯৪৬)
৪। আমি কেন ইসলামগ্রহণ করলাম (১৯৭৬)
৫। আমি কেন খৃস্টধর্মগ্রহণ করলাম না (১৯৭৭)
৬। একটি সুগভীর চক্রান্ত ও মুসলমানসমাজ (১৯৭৭)
৭। কারবালার শিক্ষা (১৯৭৮)
৮। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে (১৯৮০)
৯। নবীদিবস (১৯৮১)
১০। ইতিহাস কথা কয় (১৯৮১)
১১। আর্তনাদের অন্তরালে (১৯৮০)
১২। শেষনিবেদন (১৯৭৯)
১৩। দীন-ধর্ম-রিলিজিয়ন (১৯৮২)
১৪। এপ্রিল ফুলের বেড়াজালে মুসলমানসমাজ (১৯৮৩)
১৫। কুরবানির মর্মবাণী (১৯৮১)
১৬। ঠাকুরমার স্বর্গযাত্রা (১৯৮১)
১৭। বিড়ালবিভ্রাট (১৯৮১)
১৮। মূর্তিপূজার গোড়ার কথা (১৯৮২) ইত্যাদি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমণিকা	ঃ	১১
ইতিহাস কী এবং কেন	ঃ	১৬
ইতিহাসের উপাদান	ঃ	১৬
পৃথিবীতে ধর্মের উদ্ভব	ঃ	১৯
মানব সৃষ্টি, সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পরিণতি	ঃ	৪৭
ধর্ম বলতে কি বুঝায়	ঃ	৫০

দ্বিতীয় অধ্যায়

অন্ধত্ব ও অন্ধ বিশ্বাস	ঃ	৫২
সূর্যপূজা দেশে দেশে	ঃ	৫৪
মৃত মানুষের পূজা	ঃ	৫৮
যে কথার শেষ নেই	ঃ	৬৫
একটি বিশেষ ঘটনা	ঃ	৭০
মূলে যদি ভুল থাকে	ঃ	৭৩
একটি পর্যালোচনা	ঃ	৭৭
সত্য সমাগত	ঃ	৭৯

তৃতীয় অধ্যায়

পৃথিবীতে দীনের আবির্ভাব বা নুজুলে দীন	ঃ	৮৭
পটভূমিকা	ঃ	৮৭
বিশ্ব স্রষ্টার পরিচয়	ঃ	৮৯
নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি ও নামকরণ	ঃ	৯১
মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য	ঃ	৯৫
পরিকল্পনা	ঃ	৯৭
প্রস্তাবনা	ঃ	১০০

www.pathagar.com

চিন্তা ও বাক্ স্বাধীনতা	ঃ	১০৪
প্রতিনিধি কী এবং কেন?	ঃ	১০৬
যে পরে এসেছে	ঃ	১০৭
ফাসাদ ও রক্তপাত	ঃ	১১৫
স্তব স্তুতি গুণগান	ঃ	১১৬
মানুষ ও ফেরেশতা	ঃ	১১৯
আদিমানবের সৃষ্টি ও 'আছমা' শিক্ষা	ঃ	১২১
ফেরেশতাদিগের শিক্ষা ও জ্ঞান	ঃ	১২৩
মানব শ্রেষ্ঠত্বের বাস্তব প্রদর্শনী	ঃ	১২৫
অহমিকা ও তার পরিণতি	ঃ	১২৭
ইনসান, জান্নাত এবং নিষিদ্ধ বৃক্ষ	ঃ	১২৯
প্রস্তুতি পর্ব	ঃ	১৩১
ধরার বুকে মাটির মানুষ	ঃ	১৩২
শয়তান কি এবং কেন?	ঃ	১৩৪
বিজ্ঞানের বিভ্রাট	ঃ	১৩৮
আদি মানবের কলেমা শিক্ষা	ঃ	১৪১
পাপ ও পাপী	ঃ	১৪৪
হাত কাটার আইন	ঃ	১৬৯
যুগে যুগে দেশে দেশে	ঃ	১৭৪
দ্বীন, ধর্ম, রিলিজন	ঃ	১৮১
সারকথা	ঃ	১৮৬
উপসংহার	ঃ	১৯৩

www.pathagar.com

সর্বপ্রদাতা ও পরম করুণাময় আল্লাহর নামে

পূর্বকথা

ইতিহাস সত্যভিত্তিক : অতএব তা রচনা করা যায় না, সৃষ্টি করতে হয়। মানুষই ইতিহাস সৃষ্টি করে। অথচ আমাদের জানা যেসব ইতিহাস রয়েছে তার কোনটা বাংলাদেশের ইতিহাস, কোনটা ভারত বর্ষের অথবা অন্য কোন দেশের।

খুব সম্ভব বাংলাদেশী মানুষের ইতিহাস ভারতীয় মানুষ বা ভারতবাসীর ইতিহাস এভাবে লিখতে গেলে শ্রম ও সময়ের অপচয় ঘটার আশঙ্কায় বিজ্ঞ ইতিহাস লেখকেরা এই সংক্ষিপ্ত পথ বেছে নিয়েছেন।

সে যা হোক, আমাদের জানা যেসব ইতিহাস রয়েছে সেগুলো লিখার কাজ শুরু হয়েছে অতি সাম্প্রতিককালে। নানা কারণে ওগুলোকে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বলা যেতে পারে না। ওসব কারণের অন্যতম কারণ হলো ওগুলোতে মানবসৃষ্টির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, কোথা থেকে এবং কিভাবে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে ইত্যাদি বিবরণ তুলে ধরা সম্ভব হয়নি এবং সম্ভব হওয়ার কথাও নয়।

ইতিহাস থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে জাতি তার আত্মপরিচয় লাভ করবে এবং এগিয়ে চলার কর্মপন্থা নির্ধারণ করবে, ইতিহাস লিখার একমাত্র না হলেও অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য এটাই। বলাবাহুল্য, এ কারণেই ইতিহাসের মাধ্যমে পূর্বসূরীদের জন্ম-মৃত্যু, শৌর্য-বীর্য, আনন্দ-বিষাদ, জয়-পরাজয়, উত্থান-পতন প্রভৃতির বাস্তব চিত্র সার্থকভাবে জাতির সম্মুখে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়।

কিন্তু যত চেষ্টাই করা হোক এসব ইতিহাস কোনও দিনই মানবসৃষ্টির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা, আদি মানুষের সৃষ্টি, পৃথিবীতে আবির্ভাব প্রভৃতির নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য বিবরণ তুলে ধরা সম্ভব হবে না। এমতাবস্থায় এসব ইতিহাসকে যে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বলা যেতে পারে না এবং এসব থেকে জাতির পক্ষে আত্মপরিচয় লাভ করা যে সম্ভব নয় সেকথা সহজেই অনুমেয়।

এ কথাও সহজেই অনুমেয় যে, আত্মপরিচয় ছাড়া আত্মপ্রত্যয় এবং আত্মপ্রত্যয় ছাড়া দায়িত্বগ্রহণ কোনও ক্রমেই সম্ভব হতে পারে না। দুঃখের বিষয়, আত্মপরিচয় লাভের সহায়ক নয় এমন অপূর্ণাঙ্গ ইতিহাসই আমাদের পাঠ করতে হয়।

পবিত্র কুরআনকে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান বলা হয়। এটা যে, পূর্ণাঙ্গ দীন বা পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সেকথা বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

কুরআন পাঠ করার পর থেকেই এ বিশ্বাস আমার মনে দানা বেঁধে উঠতে থাকে যে, যেহেতু তা পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান আর যেহেতু সৃষ্টির সূচনা বা জাতীয় জীবনের প্রাথমিক পর্যায় বাদ দিয়ে কোনও পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান রচিত হতে পারে না; অতএব পবিত্র কুরআনে সেই সূচনাকালের ইতিহাস অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে।

অসীম আল্লাহর উদ্দেশ্য অশেষ কৃতজ্ঞতার সাথে বলতে হয় যে, অনুসন্ধান করতে গিয়ে পবিত্র কুরআনের প্রথম সুরাটির মধ্যেই সেই সূচনাকালের ইতিহাস আমার নজরে পড়ে। তা এতই প্রাঞ্জল এবং তাৎপর্যপূর্ণ যে শ্রদ্ধা, বিস্ময় এবং আনন্দে মন ভরে ওঠে।

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা, প্রস্তাবনা, প্রস্তুতিপর্ব ও ধরার বুকে মাটির মানুষ প্রভৃতি উপশিরোনাম দিয়ে এই পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ে সূচনাকালের সেই ইতিহাস আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

এই ইতিহাস পাঠ করার সময় একথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে কোনও স্নেহময় পিতা যেন বিদেশ গমনোদ্যত তাঁর কোনও পুত্রকে উপদেশ ও উদাহরণের সাহায্যে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন।

এ ইতিহাস থেকে আমার মনে এ ধারণাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, প্রস্তুতিপর্বের এই ঘটনাবলীর মাধ্যমে মোটামুটিভাবে গোটা পার্থিবজীবনের পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমার অযোগ্যতা এবং অক্ষতার কারণে আমি যে এই ইতিহাস যথাযোগ্যভাবে তুলে ধরতে পারিনি অকুণ্ঠচিত্তে সেকথা আমি স্বীকার করে নিচ্ছি এবং যোগ্য ব্যক্তিদের আর কালক্ষয় না করে একাজে এগিয়ে আসার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।

এই ইতিহাসের মাধ্যমে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তা অর্জনের উপায়, দায়িত্ব কর্তব্য, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতির যে রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে পদক্ষেপ নেয়া হলে সুখশান্তি এবং কল্যাণ ও মঙ্গলের মহিমামণ্ডিত এক বিশ্বপরিবার গড়ে তোলা সম্ভব বলে আমি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি। এই বিশ্বপরিবার গড়ে তোলার কাজে আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমিন!

লেখক

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়
উপক্রমণিকা

অনুসন্ধিৎসা মানুষের জন্মগত বৃত্তিসমূহের অন্যতম। এই বৃত্তিই তাকে অজানাকে জানা ও অচেনাকে চেনার জন্য উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে। এই বৃত্তিটি আছে বলেই তার মনে জেগে ওঠে নানা প্রশ্ন-নানা জিজ্ঞাসা। আর এইসব প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়ার জন্য সে হয়ে ওঠে তৎপর ও কর্মচঞ্চল।

এইসব প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়ার জন্য সাধারণত চিন্তা-গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ধারণা-বিশ্বাস, বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজন বোধে আন্দাজ-অনুমানের ওপর নির্ভর করা হয়ে থাকে।

কিন্তু হাজার হাজার বছর পূর্বের সেই আদিম জামানার যেদিন শিশুসুলভ জড়তা তদানীন্তন মানুষদের মন-মানসকে একান্তরূপেই আড়ষ্ট ও আচ্ছন্ন করে রেখেছিল; অর্থাৎ যেদিন কোনও বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তো দূরের কথা গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করারও সামান্যতম সুযোগ ছিলনা সেদিন এসব প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়ার জন্য প্রায় ষোল-আনা ক্ষেত্রেই যে ভাবাবেগ ও আন্দাজ অনুমানের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে সেকথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখেনা।

বলাবাহুল্য, এমনিভাবে হাজার হাজার বছর কেটে গিয়েছে। তবে এই সুযোগে দিনে দিনে পরবর্তী মানুষদের মন-মানস যে পরিপক্ক ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারও যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে সেকথা সহজেই অনুমেয়। ফলে তারা যে অতীতের অন্ধ ভাবাবেগ ও আন্দাজ অনুমানের পথ ছেড়ে চিন্তা-গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ ধরে সম্মুখের দিকে এগিয়ে গিয়েছে সেকথার অসংখ্য বাস্তব প্রমাণ আমাদের সম্মুখেই রয়েছে।

এসব বাস্তব প্রমাণ থেকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আমরা বলতে পারি যে, পরবর্তীকালের বাস্তব অভিজ্ঞতা, চিন্তা-গবেষণা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে অতীতের অন্ধ ভাবাবেগ ও অনুমাননির্ভর বহু কিছুই মিথ্যা, অকেজো অথবা যুগের অনুপযোগী প্রমাণিত হওয়ায় পরিত্যক্ত ও বর্জিত হয়েছে।

www.pathagar.com

কিন্তু অতীব দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে এইসব মিথ্যা, অকেজো অথবা যুগের অনুপযোগী হয়ে পড়া বিষয়সমূহের মধ্যে এমনকিছু বিষয়ও রয়েছে যা বংশানুক্রমিকভাবে সুদীর্ঘকাল চালু থাকার ফলে পরবর্তী বংশধরদের কিছুসংখ্যকের মন-মানসে সত্যের রূপ নিয়ে এমনভাবেই শেকড় গেড়ে বসেছে যে পরবর্তীকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাবল তা উপড়ে ফেলতে পারেনি, আর এদের মধ্যে যারা রক্ষণশীল ও কূপমণ্ডুক এ শাবলকে তারা তাদের মন-মস্তিকের ধারেকাছেও যেতে দেন নি।

এনিয়ে পরবর্তী ধর্মের উদ্ভব শীর্ষক নিবন্ধে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা হবে বলে এখানে শুধু এই ইঙ্গিতটুকু দিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছি যে ওসব রক্ষণশীল এবং কূপমণ্ডুকদের নিস্পৃহতা এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রচণ্ড বিরোধিতা স্বত্তেও চিন্তা-গবেষণা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ শুধু অব্যাহতই থাকেনি বরং এই নিস্পৃহতা ও বিরোধিতার ফলে সত্যানুসন্ধিৎসদের শক্তি এবং দৃঢ়তা অনেক গুণে বেড়ে গিয়েছে, আবিষ্কার-উদ্ভাবন ও উন্নতি-অগ্রগতির কাজও অবিশ্বাস্যভাবে তরান্বিত, শক্তিশালী এবং দৃঢ়ভিত্তিক হয়ে উঠেছে।

ফলে একদিন গুহাজীবন থেকে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল আজ অনন্ত আকাশের গ্রহ নক্ষত্রে তার সম্প্রসারণ সম্ভব হয়েছে, এই গতিবেগের শেষ কোথায় অথবা এর কোনও শেষ আছে কিনা একমাত্র ভবিতব্যই সেকথা বলতে পারে।

কিন্তু অবস্থার এটাই সার্বিক চিত্র নয়, এর ভিন্ন একটি দিকও রয়েছে; যা শুধু ভীষণভাবে বেদনাদায়কই নয়, অতি নিদারুণভাবে হতাশাব্যঞ্জকও। আলোর নীচে অন্ধকার থাকার মতো চিত্রের এই দিকটিতে রয়েছে মানুষের অজ্ঞতা ও চরিত্রহীনতার অতি জঘন্য ও ভয়াবহ দৃশ্য।

বিষয়টি খুলে বললে বলতে হয় যে, অজানাকে জানার জন্য যে মানুষ অনন্ত আকাশের গ্রহ নক্ষত্রে সাফল্যজনকভাবে অভিযান চালিয়েছে খোঁজ খবর নিলে দেখা যাবে যে সেই মানুষই তার নিজের সম্পর্কে রয়েছে সীমাহীনভাবে অজ্ঞ ও উদাসীন। আর নিজেকে সৃষ্টির সেরাজীব বলে দাবি করার পরও চরিত্রের দিক দিয়ে অতি নগণ্যসংখ্যক ব্যতিক্রম ছাড়া সে পশুত্বেরও নিম্ন পর্যায়ে নেমে গিয়েছে।

মানুষের নিজের সম্পর্কে সীমাহীন অজ্ঞতাই যে তার এই অধঃপতনের কারণ কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তিই সেকথা অস্বীকার করতে পারে না। নিজের সম্পর্কে মানুষের এই অজ্ঞতার বিস্তারিত বিবরণ এখানে তুলে ধরা সম্ভব নয় এবং তার প্রয়োজনও নেই। এখানে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি যে, মানুষ অজানাকে জানতে গিয়ে পৃথিবীর ছোট-বড় প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টি-তত্ত্ব,

www.pathagar.com

সৃষ্টির উদ্দেশ্য বা গুণাগুণ এবং এই উদ্দেশ্যকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর প্রক্রিয়া-পদ্ধতি আবিষ্কার করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। সুখের বিষয় একাজে তার সাফল্যের পরিমাণও মোটেই নগণ্য নয়।

অথচ অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে যে মানুষ তার নিজের সৃষ্টিতত্ত্ব অর্থাৎ কিভাবে তার সৃষ্টি হল, তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি এবং সেই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার প্রক্রিয়া-পদ্ধতিইবা কি সে সম্পর্কে হয় সে নিদারুণভাবে অজ্ঞ রয়েছে অথবা অতি জঘন্য ধরণের ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে চলেছে।

বলাবাহুল্য, নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্যভাবে এসব তত্ত্ব না জানা পর্যন্ত নিজের প্রকৃত মূল্য এবং মর্যাদা উপলব্ধি করা এবং সঠিক পথে চলা কোনক্রমেই সম্ভব হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোনও বিষয়ে অজ্ঞতা বরং ভাল; কেননা সেক্ষেত্রে জানার অবকাশ এবং আগ্রহ সৃষ্টির আশা থাকে। পক্ষান্তরে, কোনও ভ্রান্ত ধারণা সত্যের রূপ নিয়ে যাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে পড়ে তাদের সংশোধন এমনকি তেমন কোনও উদ্যোগ গ্রহণের মানসিকতাই তাদের কাছে আশা করা যায় না।

দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ নিজের সম্পর্কে এই ভ্রান্ত ধারণার করুণ শিকারে পরিণত হয়ে রয়েছে। দু'একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি সকলের কাছে সহজবোধ্য হয়ে উঠবে বলে আশা করি। তবে এই অজ্ঞতা এবং ভ্রান্ত ধারণার কারণ সম্পর্কে কেউ যদি মনে করেন যে, মানুষ অদ্যাপি নিজের সম্পর্কে জানার কোনও উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টাই গ্রহণ করেনি তবে তিনি মস্ত ভুল করবেন।

কেননা, বলতে গেলে আবহমানকাল ধরেই মানুষের নিজের সম্পর্কে জানার উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টা চলে আসছে। কিন্তু বিশেষ কারণে তা সফল তো হয়ইনি বরং সে উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টিরই সহায়ক হয়েছে। এই বিশেষ কারণটি সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে। এখানে শুধু এই ভ্রান্ত ধারণার দু'একটি নমুনা প্রিয় পাঠকবর্গকে উপহার দিয়ে প্রসঙ্গের ইতি টানছি।

বলা আবশ্যক, যে এসব নিয়ে যাঁরা চিন্তা-গবেষণা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন তাঁদের একজনও মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার প্রক্রিয়া-পদ্ধতি সম্পর্কে একটি কথাও বলেননি। শুধু মানুষের সৃষ্টি-রহস্য সম্পর্কেই তাঁরা আলোকপাত করেছেন। আর তা করতে গিয়ে তাঁদের কেউ বলেছেন, মানুষ একটি বুদ্ধিমান পশু, কেউ বলেছেন, মানবজাতি আসলে বানর বা শাখা মৃগের বংশধর। কেউবা মানবজাতিকে গরিলা, বনমানুষ, শিম্পাঞ্জি, ওরাংওটাং বা এমনি ধরনের অন্য কোনও জন্তুর বংশধর বলে প্রমাণ করার চেষ্টা

www.pathagar.com

করেছেন। কেউ বলেছেন, মানবসৃষ্টি নেহায়েতই একটা দৈব দুর্ঘটনা বা প্রকৃতির খেলা, এবং এর পশ্চাতে কোনও উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনা নেই। আবার কেউবা বলেছেন, অন্য কিছু।

দুঃখের বিষয়, এসব মতামতের সত্যতা, যুক্তিযুক্ততা, পরস্পর বিরোধিতা এবং মানবচরিত্রের ওপর এইসব মন্তব্যের মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব প্রভৃতি সম্পর্কে সামান্যতম বিচার-বিবেচনা না করেই বহুক্ষেত্রে এবং শিক্ষিত বলে পরিচিত মহলের বহু ব্যক্তি অন্ধের মত এসবকে সত্য ও অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করেছেন, আর বংশানুক্রমিকভাবে সুদীর্ঘকাল চালু থাকার ফলে এটা প্রকৃত সত্যের রূপ নিয়ে গোটা মন-মস্তিষ্ককে স্থায়ীভাবে দখল করার সুযোগ পেয়েছে। এসব যে কল্পনার ফসল এবং এসবের মধ্যে যে ভুল-ত্রুটির অবকাশ রয়েছে বা থাকতে পারে এমন কথা শ্রবণ করতেও তাঁরা রাজি নন। এসব নিয়ে যথাস্থানে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং এখানে আর অধিক আলোচনার প্রয়োজন নেই। পরিশেষে এখানে যা বলা প্রয়োজন বলে মনে করি তা হল ঃ

মানুষ যে জীবশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সৃষ্টির সেরাজীব সে সম্পর্কে আজ আর দ্বিমতের কোনও অবকাশই নেই। অতএব শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের সুযোগ এবং প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ দিয়েই যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে অন্যথায় সেও যে পশু এবং ইতর জীব-জন্তুর পর্যায়েই পড়ে থাকতো সে সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ থাকতে পারে না।

অতএব এই সুযোগ এবং উপায় উপকরণসমূহ কি সে সম্পর্কে আন্দাজ-অনুমান নয় বরং নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা একান্তরূপেই অপরিহার্য। কেননা কোনও কিছুকে জানতে হলে এবং ভালভাবে জানতে হলে তার মূল বা সূচনা থেকে জানতে হয়। অন্যথায় তার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য এবং সেই বৈশিষ্ট্যের ফলাফল সম্পর্কে জানা সম্ভব হয় না।

এখানে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে বহু সহস্র বছর পূর্বে এই পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। এমতাবস্থায় আজ এতকাল পর তার মূল বা সূচনা সম্পর্কে অবহিত হওয়া কি করে সম্ভব হতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তর হলো যেহেতু অতীতকে ধরে রাখে ইতিহাস অতএব সেই ইতিহাস থেকেই আমাদের এসব তথ্য জেনে নিতে হবে। আর সাথে সাথে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে যে, সেই ইতিহাস থেকে আমরা কোনও শিক্ষাগ্রহণ করেছি কি না এবং এই গ্রহণ করা বা না করার কি পরিণতি ঘটেছে।

www.pathagar.com

বলাবাহুল্য, সেই ইতিহাস খুঁজে বের করা এবং সর্বসমক্ষে তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই 'ইতিহাস কথা কয়' লিখিত হয়েছে। তাড়াহুড়া এবং অন্যান্য অসুবিধার জন্য প্রথম সংস্করণে নানা ভুলত্রুটি এবং অসঙ্গতি ঘটে গিয়েছিল। সুখের বিষয় আগ্রহী ও সহৃদয় পাঠক সেদিকে ভ্রুক্ষেপ মাত্রও না করে তা সাদরে এবং সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলেন। ফলে মুদ্রণের সাথে সাথেই সব কপি শেষ হয়ে যায়। সেই থেকে অনেকেই পুস্তকখানা সংগ্রহের চেষ্টা করে আসছেন। নানা কারণে দ্বিতীয় সংস্করণ বের করা এতদিন সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সেজন্য আমি বিশেষভাবে লজ্জিত এবং দুঃখিত।

দ্বিতীয় সংস্করণে পূর্বের ভুলত্রুটির সংশোধন এবং অসঙ্গতি ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় বিষয়াদি পরিবর্জনের সাধ্যানুযায়ী প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে। আমার নিজের অযোগ্যতার কারণে সে কাজে সফল হয়েছি এ দাবি আমি করতে পারিনা। সহৃদয় পাঠকবর্গ যদি দয়া করে একাজে সহযোগিতা করেন আর বেঁচে থাকি তবে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে এ সম্পর্কে নতুন করে উদ্যোগ নেয়া হবে। 'ইতিহাস কথা কয়' যদি যথার্থ অর্থে সমাজ কর্তৃক গৃহীত হয় তবে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করবো এবং আমার এই বৃদ্ধ বয়সের শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবো। পরম করুণাময় আল্লাহ আমাদের ইতিহাস থেকে শিক্ষাগ্রহণের তওফিক দান করুন। আমিন।

www.pathagar.com

ইতিহাস কী এবং কেন

বর্তমানকে অতীতের বুকে লীন করে দিয়ে সময় এগিয়ে চলে– বিরামহীন, বিশ্রামহীন, একঘেঁয়ে, একটানা তার গতি। সময়ের স্রোত ধরে রাখা যায় না আর অতীতও কোনও দিন ফিরে আসে না; অতীতকে ধরে রাখে ইতিহাস। আজ যা ঘটছে কাল তা ইতিহাস এবং আগামী দিনের পাথেয় হয়ে থাকবে।

আমরা জানি এবং বেশ ভালভাবেই জানি যে, বর্তমানের এই বিস্ময়কর এবং অভূতপূর্ব উন্নতি অগ্রগতি একদিনে বা আকস্মিকভাবে সাধিত হয়নি; কোটি কোটি মানুষের হাজার হাজার বছরের কঠোর এবং নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় একে গড়ে তুলতে হয়েছে।

এই সাধনা করতে গিয়ে কেউবা ভয়াল সাগরের অতলে ডুব দিয়েছেন, কেউবা তরুহীন ছায়াহীন রুদ্রমরুর ভয়াল বুকে পাড়ি জমিয়েছেন। আবার কেউবা শ্বাপদসঙ্কুল প্রাণঘাতী অরণ্যানীর গভীরে প্রবেশ করেছেন।

ইতিহাস সৃষ্টিকারী এসব দুর্জয় ও দুঃসাহসিক অভিযান চালাতে গিয়ে কত মূল্যবান প্রাণ যে কত মর্মান্তিক অবস্থায় লোকচক্ষুর অন্তরালে অকালে ঝরে পড়েছে তার কোন হিসাব নেই, ইয়ত্তা নেই। সুদূরের সেই আদিম জামানা থেকে এমনিভাবে উন্নতি-অগ্রগতির বিভিন্ন দিকে চলেছে ইতিহাস সৃষ্টিকারী বিভিন্নমুখী অভিযান ও কর্মতৎপরতা।

এইসব অভিযাত্রীবাহিনী ভাবিকালের জন্য তাদের পরিচয়, বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং সাফল্য ও ব্যর্থতার বিবরণ সম্ভাব্য উপায়ে তুলে ধরতে চেয়েছেন, ভাস্বর করে রাখতে চেয়েছেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষেরা কিংবদন্তী, জনশ্রুতি, বংশপঞ্জী, উপাখ্যান, লোকগাথা প্রভৃতির মাধ্যমে লোকপরম্পরায় এসব ধরে রেখেছেন আর তা থেকে শিক্ষা ও প্রেরণা লাভ করে নতুন অভিযাত্রীবাহিনী গড়ে উঠেছে।

ইতিহাসের উপাদান

ইতিহাস শব্দের ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্য হলো ইতিহ-আস-ঘঞ, অধি, বি; পুং। অর্থাৎ পূর্ব বৃত্তান্ত, প্রাচীন কথা বা ইতিবৃত্ত। ইতিবৃত্ত বলতে বুঝায় ইতি (এই প্রকার) বৃত্ত (অতীত)। অর্থাৎ অতীত এই প্রকার (ছিল)।

www.pathagar.com

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের সম্মুখে যে ইতিহাস রয়েছে তা সুদূর অতীত তো নয়ই দূর অতীতের বৃত্তান্তও বহন করে না। এর কারণ হলো লেখ্যভাষা উদ্ভাবনের পরও ইতিহাস লিখার মতো যোগ্যতা এবং মনমানস গড়ে উঠতেও সুদীর্ঘকাল কেটে গিয়েছে।

অবশ্য লেখ্যভাষা উদ্ভাবিত হওয়ার পূর্ববর্তী হাজার হাজার বছরের অবলুপ্ত ও অলিখিত ইতিহাস উদ্ধার করার যথেষ্ট উদ্যোগগ্রহণ করা হয়েছে এবং আজও সে উদ্যোগ অব্যাহত রাখা হয়েছে।

গুহাচিত্র, শিলালিপি, আদিম মানুষের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল, মাথার খুলি, ব্যবহৃত অস্ত্র-শস্ত্র ও তৈজষপত্রাদি নিয়ে গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং আন্দাজ অনুমানের ওপর নির্ভর করে অদ্যাপি ইতিহাসের যেটুকু উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় তা অতি নগণ্য এবং একান্তরূপেই অকিঞ্চিৎকর। আর ওসব তত্ত্ব ও তথ্যাদির সবগুলোকে পরিপূর্ণরূপে সত্যভিত্তিক ও নির্ভরযোগ্য বলাও সঙ্গত হবে না।

অতএব প্রাগৈতিহাসিক যুগের হাজার হাজার বছরের নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস আমাদের নাগালের বাইরেই থেকে যাচ্ছে। তারপর লেখ্যভাষার যে ইতিহাস আমাদের সম্মুখে রয়েছে তাকেও পরিপূর্ণরূপে সত্যভিত্তিক, নির্ভরযোগ্য এবং ত্রুটিহীন বলার উপায় নেই।

কেননা মানুষের পক্ষে ভুলত্রুটি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাছাড়া মানুষের সীমাবদ্ধতা রয়েছে, রয়েছে ভাবপ্রবণতা এবং একদেশদর্শীতাও। ফলে নির্ভুল, নিরপেক্ষ এবং ত্রুটিহীন ইতিহাস যে তার নিকট থেকে আশা করা যেতে পারে না সেকথা সহজেই অনুমেয়।

অতএব একদিন গুহাজীবন থেকে যাত্রা শুরু করে পরবর্তীকালে যত উন্নতি-অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার একমাত্র না হলেও অন্যতম প্রধান উপায় যে অতীত বা ইতিহাস থেকে শিক্ষাগ্রহণ সে সম্পর্কে সন্দেহের কোনও অবকাশই থাকতে পারে না।

বিষয়টি এভাবেও তুলে ধরা যেতে পারে : মানুষ প্রগতিশীল জীব; তাই এগিয়ে চলাই তার কাজ, তার স্বভাব। জন্মের পর থেকে শৈশব, বাল্য, কৈশোর প্রভৃতির পথ ধরে তাকে যেমন পরিণতির দিকে এগিয়ে চলতে হয় এর কোনও অবস্থায় স্থবির হয়ে থাকা যেমন সম্ভব নয় তেমনি সম্ভব নয় জীবনযুদ্ধ বা স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের কোনও পর্যায়ে স্থবির হয়ে পড়ে থাকা।

তাই একদিনের গুহাজীবী মানুষ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা বা টিকে থাকার প্রয়োজনে উন্নততর জীবনগড়ার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে চেয়েছে এবং পুরাতন

www.pathagar.com

প্রস্তরযুগ থেকে ক্রমোন্নতির ধাপে ধাপে সৃষ্টি করেছে নতুন প্রস্তরযুগ, লৌহযুগ, তাম্রযুগ প্রভৃতি। এজন্য ছেড়ে আসা যুগের জয়-পরাজয়, সাফল্য-ব্যর্থতা এবং উত্থান-পতনের ঘটনাবলী বংশানুক্রমিক বাস্তব অভিজ্ঞতা অন্য কথায় অলিখিত ইতিহাস থেকে তাদের যে শিক্ষাগ্রহণ করতে হয়েছিল সেকথা অনস্বীকার্য। তবে এখানে বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, গল্প-উপন্যাস, কেচ্ছা-কাহিনী প্রভৃতি রচনা করা যায়, কিন্তু ইতিহাস রচনা করা যায় না। কেননা, ইতিহাস হয় বাস্তব এবং সত্যভিত্তিক। আর যা বাস্তব এবং সত্যভিত্তিক তা রচনা করা যায় না, সৃষ্টি হয়।

বাস্তব এবং সত্যভিত্তিক হওয়ার কারণে ইতিহাস বড় নির্মম ও কঠোর হয়ে থাকে। ইতিহাস ক্ষমা করতে জানে না। একদেশদর্শিতা, পক্ষপাতিত্ব এবং ভাবপ্রবণতারও ধার ধারে না। যা সত্য এবং বাস্তব তা সুন্দর বা কুৎসিত যাই হোক আর তার অনুষ্ঠাতা যিনিই হোন সেদিকে ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করে গোটা আলেখ্যকে বুকে ধারন করা এবং আগামীদিনের জন্য ভাস্বর করে রাখাই ইতিহাসের কাজ।

তাইতো দেখতে পাই যে, ইতিহাস থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে যারা এগিয়ে গিয়েছে ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম চিরভাস্বর ও সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। আর যারা তা করেনি তারা বিভ্রান্তির করুন শিকারে পরিণত হয়ে নিজেদের ঠাঁই করে নিয়েছে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে।

তারপর ইতিহাসের উপাদান হিসাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দিক-বিজয়ী বীর বা রাজা-বাদশাহদের কীর্তি-কাহিনী, যুদ্ধ-বিগ্রহ, জয়-পরাজয় এবং রাজ্যশাসন সংক্রান্ত নিয়মাবলীকেই প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে। এটা যে ঘটে যাওয়া ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের এক অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র সে সম্পর্কে দ্বিমতের কোনও অবকাশ থাকতে পারে না।

তবে বলা আবশ্যক যে, সার্বিক ও সত্যিকারের ইতিহাস না থাকার ফল যা হওয়ার তা হয়েছে এবং হতে থাকবে। তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। এখানে যা বলা আবশ্যক তা হলো এই ত্রুটিবিচ্যুতি এবং অপূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও ইতিহাস বলে যা চালু রয়েছে তাকে বাদ দেয়া যেতে পারে না। কেননা, অতীত অবলম্বন করেই ভবিষ্যতের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। অতএব প্রচলিত ইতিহাসে যতটুকু সত্য এবং শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে তা বেছে নিয়ে আগামীদিনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে আর সাথে সাথে যতদূর সম্ভব সত্য, নির্ভেজাল এবং পরিপূর্ণ ইতিহাস লিখার কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

www.pathagar.com

এখানে প্রশ্ন উঠা খুবই স্বাভাবিক যে, যেখানে আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান ইতিহাস সর্বাংশে নির্ভরযোগ্য নয় এবং যেহেতু সে ইতিহাসও অতি সাম্প্রতিককালের সেখানে মানবসৃষ্টির মূল অর্থাৎ আমাদের অভিপ্সিত হাজার হাজার বছর পূর্বের ইতিহাস কি করে সংগ্রহ করা সম্ভব হবে?

এই প্রশ্নের উত্তর যথাস্থানেই দেয়া হবে। উৎসাহী পাঠকবর্গকে ধৈর্য ধারণের অনুরোধ জানিয়ে অতঃপর উপক্রমনিকায় আমাদের অঙ্গীকৃত 'ধর্মের উদ্ভব' সম্পর্কীয় কিছু তত্ত্ব ও তথ্যকে নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে।

পৃথিবীতে ধর্মের উদ্ভব

এখানে প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক যে ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে ধর্মকে টেনে আনার কি প্রয়োজন থাকতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর হল ঃ ইতিহাসের অর্থ যদি ইতিবৃত্ত বা অতীতের কথা হয় তবে ধর্মও একটি ইতিহাস। শুধু তাই নয়, ধর্মের উদ্ভব মানবেতিহাসের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ও। অতএব এই অধ্যায়টি বাদ দিয়ে যে ইতিহাস তা হবে 'কানা ছেলের পদ্মলোচন' নামের মতই অর্থহীন এবং সঙ্গতিবিহীন।

এ প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে ধর্ম যেমন ইতিহাস তেমনি ধর্মেরও ইতিহাস বা পটভূমিকা রয়েছে। আর এক্ষেত্রে ধর্মকে টেনে আনার অন্য যে বিশেষ কারণটি রয়েছে তা হলো, যতদূর জানা যায় পৃথিবীতে ধর্ম এবং মানুষের উদ্ভব সমসাময়িক। সুতরাং ধর্মের উদ্ভব সংক্রান্ত ঘটনাবলীর মধ্যে আমাদের উদ্দিষ্ট মানবসৃষ্টির মূল বা সূচনা সংক্রান্ত কোনও না কোনও তথ্য খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। বলাবাহুল্য, একাজ খুবই কঠিন এবং ঝামেলাপূর্ণ, তথাপি চেষ্টা করে দেখা যাক সামান্যতম ইঙ্গিতও খুঁজে পাওয়া যায় কি না।

আলোচনার শুরুতেই পুনরুক্তি করে বলতে হচ্ছে যে, মানুষ সৃষ্টির সেরা বা সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হলেও পৃথিবীতে মানুষই যে সর্বাধিক দুর্বল, সর্বাধিক অসহায় এবং সর্বাধিক পরমূখাপেক্ষী এই কথাটি স্মৃতিপটে বিশেষভাবে জাগরূক রেখে আমাদের বক্ষ্যমাণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় ধর্মের উদ্ভব ঘটার কারণ সম্যকরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়ে উঠবে না।

তবে মানুষের এই দুর্বলতা, অসহায়তা এবং পরমুখাপেক্ষিতাকে কেউ যাতে অভিশাপ বলে ভুল না করেন সেজন্য বলে রাখতে হচ্ছে যে, সেটা মানুষের জন্য অভিশাপ তো নয়ই বরং আশীর্বাদ। কেননা, এসব দুর্বলতা থাকার জন্যই তাকে জীবনসংগ্রাম বা পৃথিবীতে টিকে থাকার অলঙ্ঘ্য প্রয়োজনে সর্বাধিক সজাগ,

www.pathagar.com

সর্বাধিক সতর্ক এবং সর্বাধিক কর্মতৎপর হতে এবং অন্যভাবে এই অভাব পূরণের প্রচেষ্টাগ্রহণ করতে হয়েছে।

বলাবাহুল্য, এই প্রচেষ্টাগ্রহণের ফলেই তার প্রজ্ঞা-প্রতিভা, বুদ্ধি-বিবেক, সাহসিকতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি অভ্যন্তরীণ গুণাবলীর উন্মেষ ঘটা সম্ভব হয়েছে যা দিনে দিনে বিকাশ লাভ করে তাকে সৃষ্টির সেরাজীবে উন্নীত করেছে।

আপাতত সেকথা রেখে এই পৃথিবীতে আবির্ভাবের পর আদিম মানুষদের অবস্থা কত করুণ ও কত অসহায় ছিল একবার সেকথা ভেবে দেখা যাক। এ সম্পর্কে একটি বাস্তব উদাহরণ এখানে তুলে ধরা যেতে পারে। উদাহরণটি হল ঃ

আজ বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে যেদিন জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সভ্যতা, আবিষ্কার-উদ্ভাবন প্রভৃতির ক্ষেত্রে আমরা শুধু প্রভূত উন্নতি অগ্রগতি সাধনেই সক্ষম হইনি, প্রকৃতির দুর্দান্ত শক্তিটাকেও বহুলাংশে আমাদের আজ্ঞাবহ ভৃত্যে পরিণত করতে পেরেছি। এই তো সেদিন যখন ঝড়-তুফান, বন্যা-প্লাবন, ভূমিকম্প-মহামারি প্রভৃতি প্রচণ্ড আকারে দেখা দিতো তখন আমরা ভীষণভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত এবং বিহ্বল ও দিশাহারা হয়ে পড়তাম।

এমতাবস্থায় হাজার হাজার বছর পূর্বের মানুষ, যাদের মন-মানস শিশুসুলভ জড়তায় একান্তরূপেই আড়ষ্ট-আচ্ছন্ন ছিল, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সভ্যতা প্রভৃতি যেদিন ছিল মানবমনের লক্ষ্য যোজন দূরে, প্রতিরোধশক্তি বা প্রতিকার-প্রতিবিধানের সামান্যতম যোগ্যতাও যেদিন ছিল না, সেদিন প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং বিরুদ্ধ শক্তিসমূহের হুঙ্কার-আস্ফালনে তারা কত বেশি ভীত-সন্ত্রস্ত এবং কত বেশি বিহ্বল ও দিশাহারা হয়ে পড়তো সেকথা সহজেই অনুমেয়।

সে যা হোক, বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণাদি থেকে একথা সুস্পষ্টরূপে জানা গিয়েছে যে, একদিকে জরা-মৃত্যু রোগ-ব্যাধি প্রভৃতি একান্তরূপে অসহায় আদিমানুষদের ভীষণভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত করেছে। ঝড়-তুফান, বন্যা-প্লাবন, ভূমিকম্প-মহামারি, হিংস্র ও অতিকায় শ্বাপদের হুঙ্কার-আক্রমণ তাদের অস্তিত্বকে কাঁপিয়ে তুলেছে।

আবার অন্যদিকে চাঁদের আলো, প্রভাতসূর্য, আকাশভরা নক্ষত্রের আবির্ভাব, শান্ত প্রকৃতি, সুমিষ্ট ফল, ঠাণ্ডা প্রস্রবণ প্রভৃতি তাদের মন আশা ও আনন্দে ভরপুর করে তুলেছে। বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই ভয় এবং আশা থেকেই সেদিন ধর্মের উদ্ভব ঘটে। বিষয়টি আরও পরিস্কার করে বলা যেতে পারে যে, নিজেদের সীমাহীন দুর্বলতা এবং নিদারুণ অসহায়তা থেকে তারা নিজেদের গোটা সৃষ্টির অধীন এবং মুখাপেক্ষী বলে ধরে নিয়েছিল।

তারা ধরে নিয়েছিল যে শরীরি ও অশরীরি শক্তিসমূহের ক্রোধ এবং সন্তুষ্টির ওপরই মানুষের সুখ-দুঃখ, জীবন-মরণ, বিপদ-আপদ, আনন্দ-বিষাদ, ভাল-মন্দ

www.pathagar.com

প্রভৃতি সবকিছু নির্ভরশীল। অতএব এইসব শক্তির ক্রোধ-প্রশমন ও সন্তুষ্টি-বিধান ছাড়া রক্ষা লাভের আর কোনও উপায়ই নেই।

কোনও ক্রোধান্ধ মানুষের ক্রোধপ্রশমন ও সন্তুষ্টিবিধানের উপায় উপকরণাদি সম্পর্কে কিছুটা বাস্তব অভিজ্ঞতা ততদিনে তারা লাভ করেছিল। সেই অভিজ্ঞতা এবং নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী তারা ভিন্ন ভিন্ন শক্তির স্বভাব-চরিত্র, মেজাজ-মর্জি প্রভৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা করে নিয়ে তদনুযায়ী তাদের ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানব, পিশাচ, কবন্ধ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে নিয়েছিল।

এই স্বভাবচরিত্র ও মেজাজ-মর্জি হিসাবে এই শক্তিসমূহের কে কোন ধরনের কাকুতি-মিনতি আদর-আপ্যায়ন, অনুরোধ-উপরোধ, উপচার-উপঢৌকন পছন্দ করে এবং তার অনুষ্ঠান ও নিবেদনের নিয়ম পদ্ধতি কি সেটাও তারা ঠিক করে নিয়েছিল। বলাবাহুল্য, এভাবেই পৃথিবীতে ধর্মের উদ্ভব ঘটে। তবে এর মূলে যে ভয় এবং আশা বিশেষভাবে প্রেরণা যুগিয়েছে সেকথা বলাই বাহুল্য। এ থেকে নিঃসন্দেহে ধরে নেয়া যেতে পারে যে, আশা এবং ভয়ই পৃথিবীতে ধর্মের উদ্ভব ঘটার মূল কারণ।

'আরণ্য সংস্কৃতি'র লেখক আবদুস সাত্তার সাহেব 'ধর্ম ও বিশ্বাস' শীর্ষক নিবন্ধে এ বিষয়টি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। উক্ত নিবন্ধের কিছু অংশ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে হুবহু উদ্ধৃত্ত করা হলো ঃ

"আদিম সমাজের অতি-প্রাকৃতে বিশ্বাসের মূল কেন্দ্রবিন্দু কি? এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে, আদিমসমাজ জীবনসংগ্রামে টিকে থাকতে গিয়ে যখন দেখেছে যে, প্রকৃতির অন্তরালের অদৃশ্য শক্তির কাছে তারা বড়ো অসহায় তখনই তারা হাত বাড়িয়েছে অদৃশ্য শক্তির (unseen forces) কাছে। কেননা, জন্ম-মৃত্যু, রোগ-জড়া, ভয়ভীতি ইত্যাদি তাদের আয়ত্বের বাইরে এবং নিশ্চয়ই এসব অদৃশ্য শক্তি দ্বারা পরিচালিত। তাই সে অদৃশ্য শক্তির অন্বেষণ করতে গিয়ে গোটা প্রকৃতিই তাদের পূজার উপজীব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং এ জন্যই আদিম-সমাজকে প্রকৃতির পূজারী বা জড়োপাসক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'অ্যানিমিজম' (Animism)।'

এখানে এ কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, প্রখ্যাত চিন্তাবিদ, নৃতত্ত্ববিদ প্রভৃতিরা পৃথিবীর সেই আদিম অধিবাসীদের প্যাগান (pagan) এবং তাদের তদানীন্তন ধর্মকে প্যাগানিজম (paganism) নামে অভিহিত করেছেন। সুপ্রসিদ্ধ Encyclopaedia Britannica য় pagan শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, Pagan means a heathen, one who worships a false god or false gods, or one who belongs to a race or nation which practices idolatrous rites and professes polytheism ... it was in the rural

www.pathagar.com

districts that the old faith ligered .... (Encyclopaedla Britannica. Vol xvii p. 26)

Encyclopaedia of religion and Ethics-এ প্যাগানিজম (Paganism) সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

Paganism .... Represents the primitive period of human history. This period has assumed different forms in different places and at verious times. Hence, Paganism too has assumed numerous and varied forms. The Pagan has worshipped every conceivable objects : right from vegetation, animals and human beings in verious forms to spirits, earth, heaven, and so many other things which are too numerous to be counted. So paganism as it has existed in the past and as it exists today has had too many forms to be enumerated. (Encyclopaedia of religions and Ethics. vol x p. 113)

'Living religions of the world' নামক গ্রন্থের লেখক Ahmad Abdullah al Masdoosi BA. L.L.B তাঁর গ্রন্থের 'Primitive Paganism' শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেন ঃ

Religion in the elementary stage of its evolution is termed as 'Paganism'. An analysis of the religious beliefs and practices which go along with Paganism reveals that religion, which in reality is the expression of the inner voice of untarnished human nature, as manifested in the belief of the oneness of god, got mutilated in course of time and came to signify no more than the worship of supernatural beings and supernatural forces.

The Period of Paganism represents the most primitive stage of man's cultural growth. This is a period when human life was enormously simple .... . Due to the immaturity of the primitive human mind, the diversity of the phenomena of nature led man to believe in paganism.

.... In all its primitive and pagan forms religion merely consists of belief in a set of dogmas and observance of a few religious rituals which are not very deeply or directly connected with man's collective life. Hence primitive paganism had the narrowest possible conception of religion and had no impact on man's social conduct.

www.pathagar.com

অতঃপর 'Advance paganism' বা ধর্মের ক্রম-বিকাশ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করে এই নিবন্ধের ইতি টানছি।

এ কথা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে প্রাথমিক অবস্থায় আদিম মানবদের সম্মুখে খাদ্য, আশ্রয় এবং আত্মরক্ষা এই তিনটি মৌলিক সমস্যাই অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। তন্মধ্যে খাদ্যসমস্যাই ছিল সর্বাধিক প্রকট। কেননা, খাদ্যগ্রহণ না করে কোনও প্রাণী বাঁচতে পারে না এবং খাদ্য দ্বারাই ক্ষুধা মিটানো সম্ভব, এর কোনও বিকল্প নেই।

উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে যে, লজ্জা ও শীতনিবারণের জন্য বস্ত্রের প্রয়োজন, বস্ত্রের অভাবে গাছের পাতা বা অন্য কিছুর সাহায্যে লজ্জা নিবারণ করা যেতে পারে; অগ্নির সাহায্যে বা কঠিন পরিশ্রমের দ্বারা শীত নিবারণ সম্ভব। কিন্তু খাদ্য ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা এবং অন্য কোনওভাবে ক্ষুধা নিবারণ সম্ভব নয়।

এই প্রকট খাদ্য সমস্যার সমাধানের জন্য আদিম মানুষদের বন-জঙ্গলের প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত ফলমূল ও পশুপাখির কাঁচা মাংসের ওপর নির্ভর করতে হতো। আর তা সংগ্রহের জন্য পরিবারের প্রত্যেকটি সক্ষম মানুষকে সর্বদা অতিমাত্রায় ব্যস্ত-বিব্রত থাকতে এবং দল বেঁধে বন থেকে বনান্তরে ছুটে বেড়াতে হতো। এমনিভাবে ব্যস্ত-বিব্রত থাকা এবং যাযাবর বৃত্তি অর্থাৎ অন্নচিন্তায় ব্যস্ত ও বিভোর থাকার কারণে অন্যচিন্তা করার সুযোগ যে তাদের ছিল না সেকথা সহজেই অনুমেয়।

শুধু তাই নয় কৃষি উদ্ভাবনের ফলেই স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়ে; মানুষকে গৃহ-নির্মাণ, সমাজগঠন প্রভৃতির দিকে মনোযোগী হতে হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, চিন্তার প্রসার, জগত ও জীবন সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসা, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন প্রভৃতি নিত্য নূতন প্রয়োজন এবং নিত্য নূতন সমস্যার সৃষ্টি করতে থাকে। ফলে কর্মবিভাগের প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

কৃষি-পশুপালন, ব্যবসা-বাণিজ্য, সমাজের নিরাপত্তা ও শান্তি শৃংখলা বিধান, সমাজের শিক্ষাদীক্ষা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির পরিচালনা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কাজের দায়িত্ব যোগ্যতা এবং অনুরাগ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মানুষের ওপর অর্পিত হয়।

সমাজের শিক্ষা-দীক্ষা এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পরিচালনার দায়িত্ব যাদের ওপর অর্পিত হয়েছিল বা যারা এ দায়িত্বগ্রহণ করেছিলেন তারাই ছিলেন জ্ঞান-বুদ্ধি-নিষ্ঠা প্রভৃতির দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সম্মানার্হ।

এখানে যে বিষয়টির প্রতি সুধী পাঠকবর্গের গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন বলে মনে করি তা হলো, প্রতিটি মানুষই অন্তত তার নিজের এবং

www.pathagar.com

একান্ত আপনজনদের জ্বরা, ব্যাধি, মৃত্যু, বিপদাপদ, ক্ষয়-ক্ষতি, পরকাল প্রভৃতি সম্পর্কে সর্বদা ভীত ও চিন্তাগ্রস্থ অবস্থায় কালাতিপাত করে এবং এসব থেকে দূরে থাকতে চায়।

আর যেহেতু ধর্মকেই এসব থেকে রক্ষা ও পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায় হিসাবে আবহমানকাল যাবত বংশানুক্রমিকভাবে একটা বিশ্বাস তার মনে গভীরভাবে দানা বেঁধে রয়েছে। অতএব ধর্ম সম্পর্কে সে কোনওক্রমে এবং কোনও অবস্থায়ই উদাসীন থাকতে পারে না।

এমতাবস্থায় কর্ম বিভাগের কারণে ধর্মীয় বিষয়াদি একটি বিশেষ শ্রেণীর কুক্ষীগত হয়ে পড়ার পরিণতি কি হতে পারে সেকথা সহজেই অনুমেয়। তা নিয়ে কোনও আলোচনা এখানে করতে চাই না। সুধী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই এই পরিণতির কথা জানা, এমনকি সে সম্পর্কে যথেষ্ট বাস্তব এবং তিক্ত অভিজ্ঞতাও রয়েছে।

এখানে যা বলা প্রয়োজন বলে বোধ করি তা হলো যেহেতু মানুষ ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারেনা অতএব অতি স্বাভাবিকভাবেই ধর্মীয় ব্যাপারে সাধারণ মানুষদের উক্ত বিশেষ শ্রেণীটির ওপর একান্তরূপে নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়। অন্য কথায় বলা যেতে পারে যে, ধর্মসংক্রান্ত ছোট বড় যেকোনও ব্যাপারে উক্ত বিশেষ শ্রেণীটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে ধরে নেয়া ছাড়া আর কোনও গত্যন্তরই থাকে না।

ওপরে বর্ণিত এই অবস্থার কথা স্মৃতি-পটে জাগরূক রেখে অতঃপর আসুন এর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে চেষ্টা করি।

ইতোপূর্বে আমরা জেনেছি যে, সে সময় যারা জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, সদাচারী, নিষ্ঠা-পরায়ণ এবং ধর্মের প্রতি বিশেষভাবে অনুরাগী ছিলেন সমাজের শিক্ষাদীক্ষা, ধর্মীয় বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা এবং ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানাদি পরিচালনার দায়িত্ব তাঁদের ওপরই অর্পিত হয়েছিল অথবা তাঁরা সে দায়িত্বগ্রহণ করেছিলেন।

এখানে বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন যে, এই সব ব্যক্তি প্রায় সকলেই যে পরিপূর্ণ নিষ্ঠা, ধৈর্য এবং একাগ্রতার সাথে তাঁদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁদের প্রণীত ধর্মীয় গ্রন্থাবলী তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ বহন করছে।

এইসব গ্রন্থের অধিকাংশেরই ভাব, ভাষা, রচনাশৈলী প্রভৃতি এতই মধুর, প্রাঞ্জল, উন্নতমানের এবং নানাবিধ তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ যে সেগুলো পাঠ করার সাথে সাথে মুগ্ধ এবং বিমোহিত হতে হয়। ওপরন্তু আজ থেকে কয়েক হাজার বছর পূর্বের মানুষ হয়েও বিজ্ঞতা এবং পাণ্ডিত্যের দিক দিয়ে এত উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে তাঁদের উদ্দেশে অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন না করে পারা যায় না।

www.pathagar.com

কিন্তু এতসব স্বত্বেও গভীর বেদনার সাথে এখানে বলতে হচ্ছে যে, তাঁদের এই অক্লান্ত সাধনা এবং নিরলস কর্ম-তৎপরতা শুধু অতি নিদারুণভাবে ব্যর্থতাই বরণ করেনি, নানারূপ জটিল এবং অসমাধ্য সমস্যারও সৃষ্টি করেছে।

এই মন্তব্য অনেকের কাছেই বেদনা-দায়ক এবং অসমীচিন বলে বিবেচিত হতে পারে। কেউ কেউ রাগান্বিতও হতে পারেন। তবে নিরপেক্ষ ও সত্যানুসন্ধিৎসু মন নিয়ে বিচার-বিবেচনা করলে তাঁরাও যে আমাদের সাথে ঐকমত্যে উপনীত হবেন এ দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের রয়েছে। তাঁরা যাতে সহজে এবং ভালভাবে এ সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে কতিপয় লক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি কিছুটা আলোক-সম্পাত করা যাচ্ছে ঃ

বিষয়টি খুবই জটিল এবং বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ; অথচ খুবই স্পর্শ-কাতর। অতএব ভুল বোঝাবুঝির যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। এমতাবস্থায় কিছুটা বিরক্তিকর বিবেচিত হলেও একান্ত বাধ্য হয়ে ইতোপূর্বে আলোচিত বিষয়ের কিছুটা জেড় টেনে এবং কিছুটা নূতন বিষয় টেনে এনে বলতে হচ্ছে ঃ

ক) ওপরোক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ যাদের ওপর ধর্মীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তাঁরা যে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতির দিক দিয়ে একই রূপ ছিলেন কোনওক্রমেই সেকথা মনে করা যেতে পারে না। অতএব কোনও কোনও বিষয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যেতে পারে না।

খ) তাঁদের মধ্যে এমন মানুষও ছিলেন যারা পশ্চাৎপন্থী, রক্ষণশীল এবং কূপমণ্ডুক; আর এটাকেই তাঁরা ধার্মিকতার পরাকাষ্ঠা বলে মনে করতেন। যেহেতু আজ এই বিংশ শতাব্দীর উজ্জ্বল উন্নত যুগেও ও ধরনের মানুষের অভাব নেই। অতএব আজ থেকে কয়েক হাজার বছর পূর্বে এমন মানুষের সংখ্যা যে মোটেই কম ছিল না বেশ দৃঢ়তার সাথেই এ কথা বলা যেতে পারে।

এমতাবস্থায় তাঁরা যে বংশানুক্রমিকভাবে পাওয়া সেই আদিম যুগের চিন্তা-ধারাকেই অতীব নিষ্ঠার সাথে তাঁদের মনমস্তিষ্কে বহন করে চলেছিলেন অতএব পরবর্তী কালের অর্থাৎ আলোচ্য সময়ে গড়ে ওঠা অপেক্ষাকৃত উন্নত পরিবেশ এবং ধারণা বিশ্বাসকে তাঁরা যে শুধু সভয়ে পরিহারই করেননি বরং নিজেদের মনমস্তিষ্কে করে বয়ে আনা ধারণা বিশ্বাসকেই অতীব নিষ্ঠার সাথে জনগণের ওপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছেন সে কথাকেও কোনওক্রমেই অস্বীকার করা যেতে পারে না।

বলা আবশ্যক যে, তাঁদের ধারণা-বিশ্বাস যে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমাদের হাতে রয়েছে। যথাস্থানে তা তুলে ধরা হবে।

www.pathagar.com

গ) ধর্ম একান্তরূপেই বিশ্বাসের বিষয়। অতএব তার বিষয়বস্তু সহজ সরল এবং বোধগম্য হতে হয়। যা বোধগম্য নয় তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন সম্ভব হতে পারে না।

এমতাবস্থায় আজ থেকে কয়েক হাজার বছর পূর্বে অর্থাৎ আলোচ্য সময়ে বিদ্যমান মানুষদের মন-মানস, পরিবেশ, প্রয়োজন প্রভৃতি অনেক বিষয়ই যে আজ কয়েক হাজার বছর পরের উন্নততর পরিবেশের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে এবং তাই যে স্বাভাবিক সেকথাও কোনওক্রমে অস্বীকার করা যেতে পারে না।

এই যুগের অনুপযোগী হয়ে যাওয়া সম্পর্কে প্রকৃষ্ট তথ্যপ্রমাণ আমাদের কাছে রয়েছে, যথাস্থানে তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

ঘ) সত্য যা তা সনাতন, চিরন্তন এবং সর্বজনীন। যেহেতু ধর্মও একটি সত্য ব্যতীত নয় অতএব ধর্মীয় বিধানকেও সর্বকালীন এবং সর্বজনীন বা নিরপেক্ষ হতে হবে!

তাছাড়া ধর্মীয় বিধানের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো– সাদা-কালো, ছোট বড়, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, গোত্র-বর্ণ প্রভৃতি নির্বিশেষে বিশ্বের গোটা মানবজাতিকে ইহ-পরকালের প্রকৃত শান্তি ও কল্যাণের প্রেরণা এবং পথ-নির্দেশ দান।

অতএব যিনি এই ধর্মীয় বিধান রচনা করবেন তাকে যে অবশ্যই সকল প্রকারের ভুলত্রুটি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও স্বাধীন, নিরপেক্ষ, বিশ্ব তথা মানবসৃষ্টির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত, সর্বজনীন শান্তি-কল্যাণ, ইহকাল-পরকাল প্রভৃতি সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অন্য কথায় সর্ব ও সর্বদর্শী হতে হবে সে সম্পর্কে দ্বিমতের কোনও অবকাশই থাকতে পারে না।

যেহেতু মানুষ ওসব গুণ ও যোগ্যতার অধিকারী নয় অতএব মানুষের পক্ষে কোনও নির্ভুল, ত্রুটিহীন, নিরপেক্ষ, সর্বজনীন ও সর্বকালীন ধর্মীয় বিধান রচনা সম্ভব হতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ধর্মীয় বিধান যদি ভুল-ত্রুটিপূর্ণ এবং পক্ষপাতদৃষ্ট হয় তবে তদ্বারা শান্তি ও কল্যাণ তো দূরের কথা পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা-অবহেলা, দ্বন্দ্ব-কোলাহল, অহংকার-আত্মম্ভরিতা প্রভৃতি সৃষ্টির মাধ্যমে গোটা পৃথিবীটাকেই একটা ভয়ঙ্কর ধরনের অশান্তি ও অকল্যাণের আস্তানায় পরিণত করার আশঙ্কাই প্রবল ও আবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

ঙ) ধর্মীয় বিধানকে অবশ্যই যুগোপযোগী হতে হবে। কেননা প্রগতিশীল প্রাণী হিসাবে স্বাভাবিক নিয়মেই মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রভৃতির দিক দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকবে। এমতাবস্থায় ধর্ম যদি এই সব অগ্রসরমান মানুষদের যথাযোগ্যভাবে পথ-নির্দেশ দিতে ব্যর্থ হয়, ওপরন্তু

www.pathagar.com

অধর্ম ও পরকালের ভয় দেখিয়ে দুর্নিবার গতিতে পশ্চাতের দিকে টানতে থাকে তবে মানুষকে উভয় সঙ্কটে পড়ে হাবুডুবু খেতে হবে। আর সেই দোটানা অবস্থায় মানুষ যে সত্যিকার অর্থে ধর্মকে না মেনে 'নকল ধার্মিক' সাজবে অথবা 'ধর্ম-নিরপেক্ষতা'র রক্ষাকবচ ধারণ করতে বাধ্য হবে তার জাজ্জ্বল্যমান বহু প্রমাণ মহাকালের পাতায় এমনকি আমাদের নিজেদের সম্মুখেও বিদ্যমান রয়েছে।

ওপরের এই কথাগুলোকে স্মৃতিপটে জাগরূক রেখে অতঃপর দেখা যাক ধর্মীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত শ্রেণীটি মানুষের মন-মস্তিষ্কের মাধ্যমে সেই প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা ধর্মীয় ধারণা-বিশ্বাসসমূহের উন্নতি ঘটানোর জন্য কত নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে কাজ করে গিয়েছেন ঃ

এই বিশ্বের স্রষ্টা, প্রতিপালক, পরিপোষক এবং পরিচালক যে মাত্র একজনই এবং তিনি যে স্বয়ম্ভু, সর্বশক্তিমান, অবিনশ্বর, সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী এবং সবকিছুর মালিক ও প্রভু পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি সমাজেই আজ এই বিশ্বাস অন্তত এই বিশ্বাস থাকার দাবি চালু রয়েছে।

কিন্তু সুদূর অতীতে এ বিশ্বাস বা তা চালু থাকার দাবি যে ছিলনা এবং মানুষ যে সুদীর্ঘকাল যাবত ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানব, গাছ, বৃক্ষ, চন্দ্র, সূর্য, পাহাড়, পর্বত প্রভৃতিকে মানুষের ইষ্টা-নিষ্ট, সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, বিপদাপদ প্রভৃতির কর্তা সাব্যস্ত করে উপাস্যজ্ঞানের পূজা করে এসেছে তার প্রমাণ ইতোপূর্বে তুলে ধরা হয়েছে।

তবে এখানে শ্রুতিকটু হলেও না বলে পারা যাচ্ছে না যে, বেশ কিছুকাল থেকে চলে আসা একত্ববাদে বিশ্বাসের এই দাবি যথার্থরূপে শক্তিশালী, নির্ভেজাল এবং ক্রটিমুক্ত নয়। এ সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য তথ্যপ্রমাণাদি যথাস্থানে তুলে ধরা হবে। তবে এই বিশ্বাসের দাবি যত দুর্বল এবং ক্রটিপূর্ণই হোক, ভূত-প্রেত, জন্তু-জানোয়ার, গাছ-পালা প্রভৃতির প্রতি প্রভুত্ব আরোপ করার চাইতে এটা যে অপেক্ষাকৃত উত্তম এবং উন্নতমানের সে সম্পর্কে সন্দেহের কোনও অবকাশই থাকতে পারে না।

অপেক্ষাকৃত উত্তম ও উন্নতমানের বিশ্বাস সৃষ্টির প্রশংসা এককভাবে না হলেও সেদিনের ধর্মীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণকারীদেরও এতে অংশ রয়েছে। এককভাবে না হলেও' বলার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। অতএব ইঙ্গিতস্বরূপ বলে রাখা প্রয়োজন যে, একত্ববাদে বিশ্বাস সৃষ্টির মূলে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র-ধরনের একটি ধারাও সেই থেকে বিশেষভাবে কার্যকর রয়েছে। যথাস্থানে এই স্বতন্ত্র ধারাটির পরিচয় আমরা তুলে ধরতে চাই।

www.pathagar.com

চ) একথা খুলে বলার প্রয়োজন হয় না যে মানুষ যাতে সৃষ্টির সেরা হয়ে গড়ে উঠতে সক্ষম হয় সেজন্য তাকে নীতিবোধে উদ্বুদ্ধকরণ ও পথ-নির্দেশ দান ধর্মের একমাত্র না হলেও অন্যতম প্রধান লক্ষ্য, অন্তত তাই হওয়া উচিত। এজন্য প্রয়োজন প্রাঞ্জল উপদেশ, উৎকৃষ্ট যুক্তি এবং মনোজ্ঞ ও গ্রহণযোগ্য উপমা উদাহরণের

পক্ষান্তরে কোনও ধর্মীয় বিধান যদি দুর্বোধ্য হেঁয়ালি, অশ্লীল ও অশালীন কেচ্ছা-কাহিনী এবং উপমা-উদাহরণ পরিবেশন করে তা চরিত্রগঠনের পরিবর্তে চরিত্র তথা নৈতিকতা ধ্বংসেরই কারণ হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় তা যে গ্রহণযোগ্য এমনকি ধর্মীয় বিধান বলে বিবেচিত হওয়ারই যোগ্যতা রাখে না সেকথা খুলে বলার প্রয়োজন হয় না। অথচ প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা অধিকাংশ ধর্মীয় বিধানই লীলাকাহিনী, চরিতামৃত, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি নামে ভীষণভাবে অশ্লীল, অশালীন, অবান্তর এবং হেঁয়ালিপূর্ণ কেচ্ছা-কাহিনী এবং উপমা-উদাহরণ পরিবেশন করে চলেছে।

ছ) মানুষের স্বভাব হচ্ছে, সে আপনাপেক্ষা নিম্নস্তরের মানুষের আদেশ ও উপদেশকে কোনওরূপ গুরুত্ব দিতে চায়না; কেউ কেউ সেই আদেশ ও উপদেশ মেনে চলাকে অপমানজনক বা আত্মসম্মানের পক্ষে হানিকর বলে মনে করে। বিশেষ করে সে আদেশ ও উপদেশ যদি অকেজো বা গুরুত্বহীন বিবেচিত হয় তবে তো তা মেনে চলার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

ধরে নেয়া যাক, আজ থেকে কয়েক হাজার বছর পূর্বে যাদের ওপর ধর্মীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তদানীন্তনকালে তাঁরা যতবড় জ্ঞানী-গুণী বলেই বিবেচিত হোন না কেন আধুনিককালের সকলের না হলেও বেশ কিছুসংখ্যক জ্ঞানী-গুণীর জ্ঞান-গরীমা, প্রজ্ঞা, ধীশক্তি প্রভৃতি যে তাঁদের তুলনায় অনেক বেশি কোনওক্রমেই সেকথা অস্বীকার করা যেতে পারে না।

এমতাবস্থায় স্বভাবতই তাঁদের রচিত ধর্মীয় বিধানের মাধ্যমে তাঁরা যেসব উপদেশ ও আদেশ দিয়েছেন তা আধুনিককালের জ্ঞানী ও গুণীদের কাছে অকেজো বা গুরুত্বহীন বিবেচিত এবং প্রত্যাখ্যাত হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। তবে লোক-লজ্জা, পূর্বসংস্কার বা সমাজের ভয়ে তাঁরা হয়তো প্রকাশ্যে ওসব মেনে চলতে অস্বীকৃতি নাও জানাতে পারেন।

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে যাঁদের ওপর এই ধর্মীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তাঁরাও ছিলেন সেই আদিমানবদেরই উত্তর-পুরুষ বা অধঃস্তন বংশধর। সুতরাং তাঁরাও যে বংশানুক্রমিকভাবে এবং উত্তরাধিকারসূত্রে নিজেদের মন-মস্তিষ্ক, আচার-আচরণ, এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে সেই

www.pathagar.com

Paganism বা অতীতকালের ধারণা-বিশ্বাসকেই অতীব নিষ্ঠা ও সততার সাথে বহন করে চলেছিলেন সে সম্পর্কে সন্দেহের কণামাত্র অবকাশ থাকতে পারে না।

অতএব প্রথমে সেই ধারণা-বিশ্বাস মন থেকে মুছে ফেলা এবং সেখানে উন্নত ধরনের ও যুগোপযোগী ধারণা বিশ্বাসের সৃষ্টি করা মোটেই সহজ কাজ ছিল না। এটাকে 'আমুল পরিবর্তনই বলতে হয়। বলাবাহুল্য, একদিনে বা আকস্মিকভাবে এ পরিবর্তন সম্ভব ছিল না। দিনে দিনে, বহু যুগের সাধনার এবং ক্রমোন্নতির ধাপে ধাপে তাঁদের এগিয়ে চলতে হয়েছিল।

যতদূর জানা যায়, বহুত্ববাদ, জড়বাদ, পিশাচবাদ, প্রভৃতিকে পশ্চাতে ফেলে একত্ববাদের দিকে এগিয়ে চলার পথে তাঁরা আরও বেশ কিছুসংখ্যক বাদ-এর উদ্ভাবন করে নিয়েছিলেন। সেগুলোর মধ্যে দ্বিত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ, সাকারবাদ, নিরাকারবাদ, অবতারবাদ, শূন্যবাদ, আকাশবাদ, অহংবাদ, সোহহংবাদ, অদ্বৈতবাদ, অঘোরবাদ, মায়াবাদ, লীলাবাদ, পৌত্তলিকতাবাদ, গুরুবাদ, পৌরহিত্যবাদ, প্রকৃতিবাদ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বলাবাহুল্য, এসব বাদ-এর প্রত্যেকটিরই ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য রয়েছে। প্রিয় পাঠকবর্গের অবগতি এবং আলোচনার সুবিধার জন্য এই বাদসমূহের কয়েকটি মাত্রের তাৎপর্য অতিসংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

দ্বিত্ববাদ ঃ (ক) ধর্মীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা যখন লক্ষ্য করলেন যে, পৃথিবীতে জন্ম-মৃত্যু, ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, সৃষ্টি-বিনাশ, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, উত্থান-পতন, রোগ-সুস্থতা প্রভৃতি পরস্পর-বিরোধী অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। অতএব তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে, পৃথিবীতে নিশ্চিতরূপেই দু'জন ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিদ্যমান।

একজন সৃষ্টি করেন এবং বিনাশের কাজ করেন অন্যজন। একজন ভাল করেন, মন্দ করেন অন্যজন। একজন সুখ দান করেন, দুঃখ দেয়ার কাজে অন্যজন রত রয়েছেন।

(খ) এঁদের কেউ কেউবা নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছিলেন যেহেতু সৃষ্টির কাজ এককভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়, নর এবং নারী এ উভয়ের প্রয়োজন হয়ে থাকে অতএব সুনিশ্চিতরূপেই বিশ্বসৃষ্টির এই কারখানাও পরিচালিত হচ্ছে দু'জন উপাস্যের দ্বারা। তাদের একজনের নাম পুরুষ আর অন্য জনের নাম হল প্রকৃতি।

এমনিভাবে এই উপাস্যদ্বয়ের বিশ্বপিতা, বিশ্বমাতা, জগৎ-পিতা, জগন্মাতা, পিলচুহড়ম ও পিলচুবুড়ি প্রভৃতি নামকরণ করা হয়েছিল। মোটকথা পৃথিবীতে এমনিভাবেই দ্বিত্ববাদের উদ্ভব ঘটে।

www.pathagar.com

ত্রিত্ববাদ ঃ দ্বিত্ববাদের ধারণা কিছুটা সম্প্রসারিত হয়ে ত্রিত্ববাদের ধারণা গড়ে উঠেছিল। দ্বিত্ববাদ-এ স্রষ্টা ও সংহারক বা জন্ম এবং মৃত্যুর কথা হিসাবে দু'জন স্বতন্ত্র, সার্বভৌম ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ঈশ্বরের কল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু ভেবে নেয়া হয়েছিল যে, সৃষ্টি এবং সংহার অথবা জন্ম এবং মৃত্যুই সবকথা নয়। এ উভয়ের মাঝখানে প্রতিপালন রূপ বিরাট কাজটা চালু রয়েছে, আর নিশ্চিতরূপেই একজন স্বতন্ত্র ঈশ্বর এই কাজটার কর্তৃত্ব করে চলেছেন। বলাবাহুল্য, ত্রিত্ববাদের অর্থ হল– জন্ম, মৃত্যু এবং প্রতিপালন এই তিন কাজ ভিন্ন ভিন্ন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ তিন জন স্বতন্ত্র ঈশ্বরে করে চলেছেন, এই বিশ্বাস পোষণ করা।

নিরাকারবাদ ঃ বলাবাহুল্য, একত্ববাদ-এর ধারণা থেকেই নিরাকারবাদ-এর উদ্ভব। শুধু নিরাকারবাদই নয়, সাকারবাদ, অবতারবাদ, সোহহংবাদ, অহংবাদ, লীলাবাদ, সর্বেশ্বরবাদ প্রভৃতির উদ্ভবও ঘটেছিল একত্ববাদ-এর ধারণা থেকেই। আলোচনা দীর্ঘায়িত করার অবকাশ না থাকায় অতি সংক্ষেপে এই বাদগুলো সম্পর্কে নিম্নে পৃথক পৃথকভাবে কিছুটা আলোকপাত করা যাচ্ছে।

'মাত্র একজনই সবকিছুর মূলে রয়েছেন' এই ধারণা সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে তাঁর স্বরূপ, শক্তিমত্তা, অধিকার, কার্যকলাপ প্রভৃতি সম্পর্কে নানা প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। স্বাভাবিক নিয়মেই এসব প্রশ্নের উত্তর লাভের জন্য চিন্তা-গবেষণাও যে শুরু হয়েছিল সেকথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু মানবীয় জ্ঞান-গবেষণার সীমাবদ্ধতার জন্য প্রকৃষ্ট ও সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে সম্ভব হয়েছিল না তার বহু প্রমাণই বিদ্যমান রয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে 'যত মুনি তত মত'; এই প্রবাদবাক্যই আমাদের সম্মুখে প্রকট হয়ে ওঠে। মোটকথা, তাঁদের কেউবা তাঁকে নিরাকার, কেউবা সাকার, আবার মধ্যপন্থী কেউবা তাঁকে 'সাকার এবং নিরাকার' এ উভয়টা বলেই সাব্যস্ত করে নিয়েছিলেন। একটু বিস্তারিতভাবে বললে বলতে হয় যে,

❑ কেউ চিন্তা-ভাবনা করে স্থির করে নিয়েছিলেন যে, যেহেতু তিনি চর্মচক্ষে পরিদৃশ্যমান নন এবং যেহেতু তিনি স্বয়ম্ভু অর্থাৎ কেউ তাঁকে সৃষ্টি করেনি অতএব তাঁর কোনও আকার থাকতে পারে না। অর্থাৎ তিনি নিরাকার। এটা হলো ঃ নিরাকারবাদ।

❑ কেউবা স্থির করে নিয়েছিলেন, যেহেতু অদৃশ্য কোনও বস্তু সম্পর্কে কোনও ধারনায় উপনীত হওয়া সম্ভব নয় এবং তাঁকে ধ্যান করতে গিয়েও কোনও অবলম্বন বা মধ্যবর্তী ছাড়া মনকে একাত্ম ও নিবদ্ধ করা যায় না। অতএব কোনও কিছুকে তাঁর প্রতীক বা প্রতিভূ হিসাবে সাব্যস্ত করে যদি বিশেষ মন্ত্র ও প্রক্রিয়াসহকারে সেই প্রতীকের মধ্যে তাঁর আবাহণ ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলে সেখানে তিনি আবির্ভূত হন। সেই অবস্থায় ভক্তের বক্তব্য তাঁর

www.pathagar.com

শ্রুতিগোচর হয়; উপচর-উপহারাদি তিনি গ্রহণ করেন অর্থাৎ তখন সেই 'প্রতীক' এবং 'তিনি'-এর মধ্যে আর কোনও পার্থক্যই থাকে না, একাকার হয়ে যায়। এটা হলো ঃ পৌত্তলিকতাবাদ।

❑ অবতারবাদীরা সাব্যস্ত করেন যে, আসলে তিনি নিরাকার। কিন্তু বিশেষ বিশেষ অলৌকিক কার্য সম্পাদনের জন্য তিনি প্রয়োজনানুযায়ী কখনোবা মানুষ, কখনোবা জন্তু-জানোয়ার আবার কখনোবা অন্য কিছু রূপে তাঁর নির্দিষ্ট স্থান থেকে এই ধরা-ধামে অবতীর্ণ হন। এটা হলো ঃ অবতারবাদ।

❑ কেউবা ধারণা করে নিয়েছেন যে, ধর্মের গ্লানি দূরীভূতকরণ, সাধু ব্যক্তিদের পরিত্রাণ দান, অসাধু ব্যক্তিদের বিনাশ সাধন এবং বিভিন্ন লীলা প্রদর্শনের জন্য তিনি সময় সময় অলৌকিকভাবে জন্মগ্রহণ করেন। এটা হলো লীলাবাদ।

❑ কেউবা এই মীমাংসায় উপনীত হয়েছিলেন যে, ঈশ্বর বিশ্বব্যাপী বিরাজিত রয়েছেন। সুতরাং গোটা সৃষ্টিই তাঁর মাঝে রয়েছে। অতএব গোটা সৃষ্টিই 'ঈশ্বর-ময়'। অর্থাৎ সৃষ্টির ছোট-বড় সবকিছুই ঈশ্বরের অংশ বিশেষ। এটা হলো অংশবাদ।

❑ অন্য কেউবা এই সিদ্ধান্ত করে নিয়েছিলেন যে, যেহেতু বিশ্ব-নিখিলের সবকিছুর মধ্যেই তিনি বিদ্যমান রয়েছেন অর্থাৎ তাঁর মধ্যেই বিশ্বনিখিল রয়েছে আমিও রয়েছি অতএব 'তিনিই আমি।' এটা হলো ঃ সোহহংবাদ।

❑ সমসাময়িক অন্যজন এই ধারণার প্রেক্ষিতে অভ্যাস করে নিয়েছিলেন যে, যেহেতু বিশ্বের ছোট-বড় সবকিছুর মধ্যেই চৈতন্য স্বরূপ তিনি বিদ্যমান রয়েছেন, আমার মধ্যেও রয়েছেন; অতএব 'আমিই তিনি।' এটা হলো ঃ অহংবাদ।

আশাকরি তদানীন্তন অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণায় উপনীত হওয়ার জন্য ওপরের এই কয়েকটি উদাহরণই যথেষ্ট হবে; আর অধিক উদাহরণের প্রয়োজন হবে না।

এসব উদাহরণ থেকে বুঝতে পারা সহজ যে, ধর্মীয় ব্যবস্থাপনার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা-গবেষণা করেও কোনও স্থিরসিদ্ধান্ত কিংবা ঐকমত্যে উপনীত হতে পেরেছিলেন না এবং কারো সিদ্ধান্তের সমর্থনেই অকাট্য, শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য কোনও যুক্তি এবং তথ্য প্রমাণ ছিল না। সবই ছিল মানবীয় চিন্তাধারার স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

ফলে কেউ কারো অভিমত খণ্ডন করতে পারছিলেন না আবার সমর্থন জানানোও সম্ভব হয়ে উঠছিল না। সুতরাং অবস্থাটা এই দাঁড়িয়েছিল যে, ভিন্ন

www.pathagar.com

ভিন্ন এই সব অভিমতকেই সত্য এবং অভ্রান্ত বলে ধর্মীয় বিধানের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়েছিল।

বলা আবশ্যক যে, ওসব ধর্মীয় বিধানের অনেকগুলোই প্রাচীনত্ব এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও অদ্যাপি অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান। আমাদের এই অভিমতের সত্যতা যাচাই-এর জন্য যে কেউ ওগুলো পাঠ করে দেখতে পারেন।

শুধু তাই নয় যারা আজও ওসব ধর্মীয় বিধানকে সত্য এবং অভ্রান্ত বলে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন তাঁদের ধারণা-বিশ্বাস, কার্যকলাপ, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য করলেও আমাদের এই অভিমত যে কত সত্য তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যাবে।

এ নিয়ে আর অধিক আলোচনায় না গিয়ে এখানে এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি যে, শুধু আমাদের অভিমতই নয়– পাশ্চাত্যের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ, দার্শনিক এবং গবেষকদেরও অভিমত এই যে, পৃথিবীর কোনও কোনও দেশে এবং কোনও কোনও সমাজে ধর্মের নামে আজও সুদূর অতীতের সেই Paganism-ই Primitive form-এ অথবা Advanced form-এ চালু রয়েছে। আর এ সম্পর্কে অন্য কারো অভিমত জানার বা তথ্য-প্রমাণের কোনও প্রয়োজনও হয় না। কেননা আশেপাশে একটু নজর ফেরালে যে কেউ স্বচক্ষেই গাছ-মাছ, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, ইতর জীবজন্তু প্রভৃতির পূজা এবং ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব প্রভৃতির প্রতি বিশ্বাস পোষণের দৃশ্য দেখতে পারেন, আর এসব যে Paganism ছাড়া আর কিছু নয় সেকথা বলাই বাহুল্য।

অতীব দুঃখ এবং বেদনার সাথে বলতে হচ্ছে যে, যাঁরা এসব মেনে চলছেন তাঁদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা-সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতিতে প্রভূত-উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়েছে এমনকি জ্ঞানী-বিজ্ঞানী হিসাবে বিশ্বজোড়া যাঁদের খ্যাতি রয়েছে এমন মানুষও আছেন। সুদূর অতীতের ওসব ধারণা বিশ্বাসের প্রায় সবকিছুই যে মিথ্যা, অবান্তর এবং সম্পূর্ণরূপে যুগের অনুপযোগী এমন তথ্যপ্রমাণও তাঁদের হাতে রয়েছে। তবু ধর্মীয় চিন্তাধারার দিক দিয়ে আজও তাঁরা সেই প্যাগানিজমই আঁকড়ে ধরে রয়েছেন।

এখানে বলা আবশ্যক যে, এই প্যাগানিজম যাদের নিকট থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে নিজেদের মনমস্তিষ্কে করে বয়ে আনা হচ্ছে আধুনিক ভাষায় তাদের 'অসভ্য' এবং 'বর্বর' বলে আখ্যায়িত করা হয় আর যে যুগে তাঁদের মন মস্তিষ্কে এই প্যাগানিজমের সৃষ্টি হয়েছিল আধুনিক ভাষায় সে যুগটাকে বলা হয়, বর্বর যুগ।

এখন থেকে হাজার হাজার বছর পূর্বে ছেড়ে আসা সেই যুগের উলঙ্গ থাকা, জঙ্গলের স্বতঃউৎপন্ন ফল-মূল বা কাঁচামাংস খাওয়া, পর্বত-গহ্বর বা বৃক্ষকন্দরে

www.pathagar.com

বসবাস, ইশারা-ইঙ্গিতে ভাব প্রকাশ, যাযাবর বৃত্তি, অনরসুলভ আচরণ প্রভৃতির কোনওটাই যেখানে ধরে রাখা সঙ্গত বিবেচিত হয়নি বরং ভীষণভাবে জঘণ্য ও অমর্যাদাকর বলে ঘৃণা ভরে বর্জন করা হয়েছে, সেখানে ধর্মীয় ব্যাপারে সে যুগের, (আধুনিক ভাষায় সেই বর্বর যুগের) ধারণা-বিশ্বাস বা প্যাগানিজমকে আঁকড়ে ধরে রাখার কোনও যৌক্তিকতাই থাকতে পারে না, তবু তাকে আঁকড়ে ধরে রাখা হয়েছে। কেন রাখা হয়েছে সে সম্পর্কে যথাস্থানে আলোকপাত করা হবে। তবে ধরে যে রাখা হয়েছে এবং তা যে প্যাগানিজম ছাড়া আর কিছু নয় সে সম্পর্কে আরও কিছু তথ্যপ্রমাণ নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে।

পৃথিবীর অনেক দেশেই কোনও কোনও সম্প্রদায় কর্তৃক আজও যে সুদূর অতীতের সেই প্যাগানিজমকে[১] ধরে রাখা হয়েছে সে সম্পর্কে সুপ্রসিদ্ধ Encyclopeadia এবং Living religions of the world এই গ্রন্থদ্বয় থেকে মাত্র একটি করে উদ্ধৃতি নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে ঃ

"Hence Paganism too has assumed numerous and veried form. The Pagan has worshipped every conceivable objects : right from vegetation, animals and human beings in verious forms, to spirits, earth, heaven and so many other things which are too numerous to be counted. So Paganism as it has existed in the past and as it exists to-day, has had too many forms to be enumerated." –Living religions of the world P. 114.

মোট কথা প্যাগানিজম-এর ধরণ যেমন ভিন্ন ভিন্ন রয়েছে সংখ্যাও রয়েছে তেমনি প্রচুর। প্যাগানরা গাছ-গাছড়া থেকে শুরু করে পৃথিবী, আকাশ প্রভৃতি নির্বিশেষে তাদের ধারণাযোগ্য-প্রতিটি পদার্থের পূজা করে আসছে। অতএব হিসাব করে দেখা যাবে যে তা অতীতে যেমন ভিন্ন ধরনের বিদ্যমান ছিল আজও ঠিক সেই অবস্থায় বিদ্যমান।

Encyclopaedia of religions and Ethies vol x P 113-তে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

"The development of polytheism in each religion was determind by so many veried and verying factors that no simple uniformity, but a bewildering veriety appeared. Physical conditions, racial

১. অভিধানানুযায়ী Paganism শব্দের অর্থ 'হিদেন (Hethen) -দের ধর্ম।' আর হিদেন শব্দের অর্থ হল– যে ব্যক্তি ইহুদি খ্রিস্টান বা মুসলমান নয় এমন মানুষ; ধর্ম ও চিন্তাবিহীন ব্যক্তি, পৌত্তলিক, প্রতিমাপূজক, অধার্মিক, অসভ্য, বর্বর, প্রভৃতি। (ইংরেজি ভাষার যে কোনও অভিধান দ্রষ্টব্য)।

www.pathagar.com

characteristics, political circumstances all affected the forms assumed by the belief and worship of many gods."

প্রত্যেক ধর্মে বহুত্ববাদ বা বহু ঈশ্বরবাদ শক্ত হয়ে চেপে বসার মূলে ভিন্নতা-মূলক ও ভিন্নতা-জনক এত বিষয় রয়েছে যে ওসবের মাঝে সাধারণ ঐক্য খুঁজতে গেলে হতবুদ্ধি হতে হয়। তবে ভিন্ন ভিন্ন বহু ঈশ্বর এবং তাদের উপাসনার এই ভিন্নতা-সম্পর্কীয় বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য মানুষের দৈহিক অবস্থা, সামাজিক গঠন, রাজনৈতিক পরিবেশ প্রভৃতিই বিশেষভাবে দায়ী।

দু'টি জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ

সুদূর অতীতের সেই Paganism বা ধর্মের প্রতি গড়ে ওঠা অন্ধবিশ্বাস হাজার হাজার বছর পর আজও যে হুবহু বিদ্যমান তার বহু প্রমাণই তুলে ধরা যেতে পারে। আলোচনা সংক্ষিপ্তকরণের জন্য তা থেকে দুটি মাত্র উদাহরণ আমরা নিম্নে তুলে ধরছি। এ দুটির একটি হলো আমাদের এই পৃথিবী আর অন্যটি হলো আকাশের ঐ সূর্য।

পৃথিবী ঃ প্রথমেই উল্লেখ্য যে, স্থানাভাববশত বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ না থাকায় অতি সংক্ষেপে শুধু দু'চারটি দিকের প্রতি কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েই আমাদের আলোচনার ইতি টানতে হবে।

যতদূর জানা যায়, পৃথিবীতে আবির্ভূত হওয়ার বহুকাল পর ভাবের আদান-প্রদানের জন্য মানুষ ভাষার উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছিল। বলাবাহুল্য, লেখ্য ভাষার উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছিল তারও বহুকাল পর।

পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তার আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কে প্রাথমিক যুগের মানুষেরা কি আন্দাজ-অনুমান করে নিয়েছিল সেকথা আমরা জানি না; জানা সম্ভবও নয়। তবে তাদের সেই-আন্দাজ অনুমানকেই যে পরবর্তী মানুষেরা বংশানুক্রমিকভাবে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে অন্য অনেক কিছুর মত সত্য এবং অভ্রান্ত বলে নিজেদের মন-মস্তিষ্কে করে বয়ে চলছিল সেকথা অনায়াসে বলা যেতে পারে।

লেখ্য ভাষার উদ্ভাবন, ধর্মীয় বিধানাদির রচনা এবং সেগুলোকে লেখ্য ভাষার মাধ্যমে সংরক্ষণের উদ্যোগগ্রহণ প্রভৃতি যে বহু পরবর্তী সময়ের ঘটনা এবং তখন যে মানুষের মন মগজ-উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পরিপক্ক ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারও অনেকখানি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে সেকথা বলাই বাহুল্য।

আর কিছুটা স্পষ্ট করে বলা যেতে পারে যে, ধর্মীয় বিধানে নানা তত্ত্ব ও তথ্যাদির সাথে সাথে বহু কিছুর নামের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এ থেকে অনায়াসে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, নানা তত্ত্ব ও তথ্য সম্বলিত ধর্মীয় বিধান রচনা

www.pathagar.com

এবং বিভিন্ন বস্তুর গুণাগুণ সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করে অথবা কোনও বস্তু সম্পর্কে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা ধ্যানধারণার ভিত্তিতে তার যথাযোগ্য নাম সাব্যস্ত করার মত যোগ্যতা সেদিন তাদের হয়েছিল।

কিন্তু অন্যান্য দিকে বেশ কিছুটা উন্নতি-অগ্রগতি হলেও অন্তত ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার দিক দিয়ে বিশেষ কোনও উন্নতি-অগ্রগতি যে হয়েছিল না বরং তাঁরা যে তখনও বংশানুক্রমিকভাবে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে সুদূর অতীতের সেই প্যাগানিজমকেই নিজেদের মন-মস্তিষ্কে করে বহন করছিলেন তাঁদের রচিত ধর্মীয় বিধানসমূহই সেকথার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ বহন করছে।

উদাহরণ স্বরূপ 'নামকরণ' প্রসঙ্গটি তুলে ধরা যেতে পারে। বিভিন্ন উপাস্য ও দৃশ্যমান বহু পদার্থের নামকরণ কিভাবে এবং কিসের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে ধর্মীয় বিধানে তার উল্লেখ রয়েছে। আসুন এবারে দেখা যাক কিসের ওপর ভিত্তি করে তাঁরা এই পৃথিবীর নাম পৃথিবী, মেদিনী এবং ব্রহ্মাণ্ড রেখেছিলেন।

(ক) বেন রাজার পুত্রের নাম পৃথু। তিনি বাহুবলে পৃথিবীর সকল রাজাকে পরাস্ত করেন। তাঁর দ্বারা পৃথিবী 'প্রোথিত' হয় তাই তিনি 'পৃথু' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। (মহাভারত)

(খ) বেন অত্যন্ত অত্যাচারী রাজা ছিলেন। তার দক্ষিণ বাহু মন্থন করার ফলে পৃথুর জন্ম হয়। পৃথু রাজা হয়ে প্রজাদের সন্তোষবিধান করেন। তিনি ধনুর্বান দ্বারা পাহাড় কেটে পৃথিবী সমতল করেছিলেন। (হরিবংশ)

(গ) বেন নামক রাজার বাহুদ্বয় মন্থন করা হলে পৃথু নামে পুত্র এবং অগ্নি নামে কন্যার জন্ম হয়। পৃথু ভগিণী অগ্নিকে বিবাহ করেন। ফলে ধরিত্রীর নাম হয় পৃথিবী। (ভাগবত)

মেদিনী : প্রলয় পয়োধিশায়ী ভগবান বিষ্ণুর থেকে মধু এবং কৈটভ নামক দুই দৈত্যের উদ্ভব ঘটে। উভয়ে মিলিতভাবে ভগবান বিষ্ণুকে আক্রমণ করে। উভয়েই বিষ্ণুর হাতে নিহত হয়। তাদের মেদ দ্বারা পৃথিবীর সৃষ্টি হয় বলে পৃথিবীর নাম রাখা হয় মেদিনী। (বিষ্ণুপুরাণ)।

ব্রহ্মাণ্ড : প্রলয়ের শেষে ভগবানের সৃষ্টির ইচ্ছা হলে প্রলয়ের অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায় এবং কারণ-বারিতে সৃষ্টি-বীজ নিক্ষিপ্ত হয়। ফলে এক সুবর্ণময় অণ্ডের উদ্ভাবন ঘটে। উক্ত অণ্ড বিভক্ত হয়ে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি হয়। এবং তার অভ্যন্তর থেকে ব্রহ্মা আবির্ভূত হন। ব্রহ্মা এই অণ্ডের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন বলে এই পৃথিবীর নাম 'ব্রহ্মাণ্ড' রাখা হয়। (মার্কণ্ডেয়পুরাণ)।

(আশুতোষ দেবকৃত নূতন বাঙ্গালা অভিধান দ্রঃ)

www.pathagar.com

পৃথিবীর পরিচয় সংক্রান্ত এমনি ধরনের ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় বিধানে বিদ্যমান রয়েছে। এসব বিবরণই যে নিছক কল্পনা-প্রসূত এবং সত্য বা বাস্তবতার সাথে এসবের বিন্দুমাত্র সম্পর্কও যে নেই এবং থাকতে পারে না সেকথা সহজেই অনুমেয়। ধর্মীয় বিধান থেকে পৃথিবীর পরিচয় সংক্রান্ত আর একটি মাত্র বিবরণ এখানে তুলে ধরে প্রসঙ্গান্তরে গমন করছি।

কোনও এক সময় হিরণ্যাক্ষ নামক জনৈক দৈত্য পৃথিবীকে চুরি করে পাতালে নিয়ে যায়। উদ্ধারের আশায় পৃথিবী ভগবানের উদ্দেশে কাতরভাবে প্রার্থনা জানাতে থাকে। ভগবান বরাহের (শূকর) রূপ ধারণ করে ধরাধামে অবতীর্ণ হন (তৃতীয় অবতার) এবং দন্ত দ্বারা পৃথিবীকে পাতাল থেকে উত্তোলন করেন। এই অবস্থায় ক্রুদ্ধ হিরণ্যাক্ষের সাথে ভগবানের সহস্র বছরব্যাপী যুদ্ধ চলতে থাকে। হিরণ্যাক্ষ নিহত হয়।

পরে পৃথিবীর সাথে ভগবানের মিলন ঘটে। ফলে নরকাসুর নামক দৈত্যের জন্ম হয়। (বিষ্ণু পুরাণ)

সূর্য : সূর্য আজও আমাদের কাছে এক বিরাট কৌতুহলের বস্তু হয়ে রয়েছে। এমতাবস্থায় আদি যুগের সেই শিশু-মানুষদের মনে সূর্য যে কত বেশি কৌতুহল সৃষ্টি করেছিল সেকথা সহজেই অনুমেয়।

সূর্য যেমন বৃহৎ এবং বিস্ময়কর তার উৎপত্তি এবং কার্যকলাপ সম্পর্কেও তেমনি অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর বহু কল্পকাহিনী রচিত হয়েছে।

সূর্যের এই বিস্ময়কর অবস্থার জন্য আদি-মানবেরা তাকে বহু নামে বিভূষিত করেছিল। এই নামসমূহের মধ্যে কাশ্যপ, আদিত্য, সবিতা, উষাপতি প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বলাবাহুল্য, এই ভিন্ন ভিন্ন নামকরণের পশ্চাতে ভিন্ন ভিন্ন কারণ রয়েছে। এবারে ধর্মীয় বিধান থেকে সেই কারণসমূহ জানার চেষ্টা করি।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য, মানুষ সূর্য সম্পর্কে শুধু কল্প-কাহিনী রচনা করেই ক্ষান্ত হয়নি। বাস্তবক্ষেত্রেও যাবতীয় গ্রহ-উপগ্রহ এমনকি তাদের কল্পিত অসংখ্য অগণিত উপাস্যের মধ্যে সূর্যকেই সর্বাধিক শ্রদ্ধা-সম্মান দেখিয়েছে ও পূজা-প্রণাম জানিয়েছে এবং আজও সর্বাধিক নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে সে কাজ চালু রেখেছে।

ভাল করে খোঁজখবর নিলে দেখা যাবে যে, সারা পৃথিবীতে যেন সূর্য-পূজার এক মহাসমারোহ চালু রয়েছে; আর পূজার্চনার অধিকারী-অনধিকারী নির্বিশেষে সবাই এই সমারোহে যোগ দিয়েছে।

www.pathagar.com

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে; পৃথিবীর যেখানেই প্যাগানিজম চালু রয়েছে সেখানেই দেখা যাবে যে একটি বিশেষ শ্রেণী ছাড়া অন্য কেউ প্রত্যক্ষভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করতে পারে না। কারণ ধর্মীয় বিধান সে অধিকারই তাদের দেয়নি। অথচ সূর্যের স্তুতি ও প্রণতির (পূজা নয়) বলায় দেখতে পাওয়া যায় যে, ঐ সব অনধিকারীরাও প্রভাতে সূর্য দর্শনমাত্র, প্রত্যহ স্নানের পরে, দু'প্রহরকালে এবং সুযোগ ও প্রয়োজন মত বিশেষভঙ্গিতে সূর্যের উদ্দেশে নমস্কার জানাচ্ছে।

সে যাহোক, অতঃপর সূর্যপ্রণামের বিশেষ মন্ত্রটি নিম্নে হুবহু উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ঃ

ওঁ জবাকুসুম সংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম
ধ্যান্তারীং সর্বপাপঘ্নং প্রনোতহস্মী দিবাকরং ॥

অর্থাৎ জবাফুলের মত আভাযুক্ত, কশ্যপ মুনির পুত্র, মহাদ্যুতিময় সকল প্রকারের পাপ ধ্বংসকারী হে দিবাকর! আমি তোমার ধ্যান করছি তোমাকে প্রণাম জানাচ্ছি। (পুরোহিত দর্পন, হিন্দুসর্বস্ব, নিত্যকর্ম পদ্ধতি প্রভৃতি দেখুন)।

লক্ষণীয় যে, ওপরোদ্ধৃত এই মন্ত্রে সূর্যকে কশ্যপ মুনির পুত্র এবং সর্বপাপ হরণকারী বলা হয়েছে। আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার জন্য পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন শাস্ত্রের উদ্ধৃতি তুলে ধরার পরিবর্তে আমরা অতঃপর আশুতোষ দেবের নূতন বাঙ্গালা অভিধান' থেকে সূর্য সম্পর্কীয় বিবরণটুকু নিম্নে হুবহু উদ্ধৃত করবো।

সূর্য আদিত্য মণ্ডলের অধিষ্ঠাতা দেব। কশ্যপমুনির ঔরসে অদিতির গর্ভে তাঁর জন্ম। তাঁর দুই পত্নী সংজ্ঞা ও ছায়া। সংজ্ঞার গর্ভে মনু ও জম নামে পুত্রদ্বয় এবং যমুনা নামে কন্যা হয়। পরে ছায়ার গর্ভে শনি নামে পুত্র এবং তপতী নামে এক কন্যা জন্মে। অতঃপর সংজ্ঞার গর্ভে অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের জন্ম হয়। কুন্তীর গর্ভে তাঁর কর্ণ নামে এক পুত্র জন্মে (মহাভারত)। সুগ্রীবও তাঁর পুত্র (রামায়ণ)।

রামায়ণ ও মহাভারতের মত প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থে এসব অদ্ভূত, অবিশ্বাস্য ও প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত বিবরণ রয়েছে বলে কেউ কেউ হয়তো বিস্মিত হতে পারেন। কিন্তু এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই এবং যাঁরা এ-সবের প্রণেতা তাঁদের সম্পর্কে কোনও বিরূপ মন্তব্য প্রকাশেরও সুযোগ নেই।

কেননা, আজ বহুকাল পরে এবং বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে, সূর্য প্রাণহীন জড়-পদার্থ এবং আয়তনে আমাদের এই পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় চৌদ্দ লক্ষ গুণ বড়।

অথচ যে সময় ধর্মীয় বিধানের এসব বিবরণ রচিত হয় সে-সময় আন্দাজ-অনুমান ছাড়া এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সামান্যতম সুযোগও বিদ্যমান ছিল না। তাছাড়া সে-সময় ধর্মীয় বিধানের প্রণেতারা অন্যান্য দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য

www.pathagar.com

উন্নতি অগ্রগতির অধিকারী হলেও ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁরা তখনও সেই প্যাগানদের ধারণা-বিশ্বাসকেই সত্য এবং অভ্রান্ত বলে নিজেদের মন-মস্তিষ্কে করে বয়ে চলেছিলেন। সুতরাং সূর্য সম্পর্কে এর চেয়ে উন্নত ধরনের কোনও বিবরণ তাঁদের কাছ থেকে আশা করা যেতে পারে না।

যদি সেদিন তাঁরা জানতেন যে- সূর্য আয়তনে আমাদের এই পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় চৌদ্দ লক্ষ গুণ বড় তা'হলে এই পৃথিবীতে বসবাসকারিণী অদিতির পক্ষে যে এত বেশি বড় সূর্যকে গর্ভে ধারণ এবং প্রসব করা সম্ভব নয় সেকথা তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেন এবং নিশ্চিতরূপেই এ কাহিনী রচনা থেকে বিরত থাকতেন। অতএব এ কাজের জন্য তাঁদের দায়ী করা বা তাঁদের কাজ দেখে বিস্ময় বোধ করার কোনও যৌক্তিকতাই থাকতে পারে না।

কিন্তু যখন দেখা যায় যে, এই বিংশ শতাব্দীর মত উজ্জ্বল-উন্নত যুগের অধিবাসী এবং সূর্য সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভের পরও এক শ্রেণীর মানুষ সূর্যকে অদিতির গর্ভজাত, পাপ মার্জনাকারী, সন্তানের জন্মদাতা এবং মহাসম্মানিত উপাস্য হিসাবে পূজা-প্রণিপাত করে চলেছেন, তখন ক্ষোভ, দুঃখ এবং বিস্ময়ে হতবাক না হয়ে পারা যায় না।

এতক্ষণ পুরাণ ভাগবতাদি গ্রন্থের উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়েছে, এবারে আসুন সর্বজন স্বীকৃত ও সর্বজনমান্য ধর্মীয় বিধানসমূহের অন্যতম বেদ সূর্য সম্পর্কে কি বলে তা জানতে চেষ্টা করি–

❑ উদুতং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবম্, দৃশে বিশ্বায় সূর্যম্।

অর্থাৎ সূর্য দীপ্তিমান এবং সকল প্রাণীদের জানেন; তাঁর অশ্বসমূহ তাঁকে সমস্ত জগতের দর্শনের জন্য উর্ধ্বে বহন করছে।

– ঋঋৃদে সংহিতা ১ম মণ্ডল ৫০ মুক্ত ১ম ঋক

স্বপ্তাত্মা হরিতো রথে বহন্তি দেব সূর্য।

অর্থাৎ হরিৎ নামক সপ্ত অশ্ব-রথ সূর্যদেবকে বহন করে। – ঐ ৮ম ঋৃক

❑ অযুক্ত সপ্ত শুন্ধ্যবঃ সুরো রথস্য নপ্ত্যঃ। তাভির্যাতি স্বযুক্তভিঃ।

অর্থাৎ সূর্য রথ-বাহক সাতটি অশ্বীকে যোজিত করলেন। সেই স্বয়ং যুক্ত অশ্বীদের দ্বারা তিনি গমন করছেন। – ঐ ৯ম ঋৃক

চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুমিত্রস্য বরুণো স্যাপ্নে;

....

তন্মোমি ত্রো বরুণো মামহুন্তা সদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবীঃ উত-দ্যৌঃ ॥

অর্থাৎ বিচিত্র তেজঃপুঞ্জ কুপ, মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চক্ষু স্বরূপ সূর্য-উদয় হয়েছেন। দ্যাবা পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ স্বীয় কিরণে পরিপূর্ণ করছেন, সূর্য জঙ্গম ও

www.pathagar.com

স্থাবন সকলের আত্মা স্বরূপ। মানুষ যেরূপ নারীর পশ্চাৎ গমন করে সূর্য সেরূপ দীপ্তিমান উষার পশ্চাতে আসছেন।

এ সময়ে দেবতাকাঙ্ক্ষী মানুষগণ বহুযুগ প্রচলিত যজ্ঞকর্ম বিস্তার করেন। সুফলার্থে কল্যাণ কর্ম সম্পন্ন করেন। সূর্যের কল্যাণরূপ হরিৎ নামক বিচিত্র অশ্বসমূহ এ পথ দিয়ে গমন করে, তারা সকলের স্তুতিভাজন। আমরা অশ্বদের অর্চনা করছি। তারা আকাশপৃষ্ঠে উঠেছে এবং একবারেই দ্যাবা পৃথিবী ব্যাপ্ত করেছে।

সূর্যের এরূপ দেবত্ব মহাত্ম যে মানুষদের কর্ম অসমাপ্ত থাকতেই তিনি তাঁর বিস্তীর্ণ রশ্মিজাল স্মরণ করেন। যখন তিনি রথ থেকে হরিৎ নামক অশ্বসমূহ বিযুক্ত করেন তখন রাত সর্ব লোকে অন্ধকার রূপ আবরণ বিস্তার করেন।

মিত্র ও বরুণের দর্শনার্থ আকাশের মধ্য ভাগে সূর্য স্বীয় জ্যোতির্ময় রূপ প্রকাশ করছেন। তাঁর হরিৎ নামক অশ্বসমূহ একদিকে তাঁর অনন্ত দীপ্তিমান বল ধারণ করে অন্যদিকে কৃষ্ণবর্ণ (অন্ধকার) নিস্পাদন করে। হে দেবগণ! অদ্য সূর্যের উদয়ে আমাদের পাপ মুক্ত কর, মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবীওদ্যু আমাদের রক্ষা করুণ। – ঐ ১ম মণ্ডল ১১৫ সূক্ত ১-৬ ঋক

❑ আয়ং গৌ : পৃশ্নির ক্রমীদ সদন্মাতরং পুরঃ। পিতংর প্রয়ন্ত স্বঃ ॥

অর্থাৎ এই যে উজ্জ্বল বর্ণধারী বৃষ অর্থাৎ সূর্য ইনি প্রথমে আপন মাতা পূর্ব দিককে আলিঙ্গন করলেন। পরে আপন পিতা আকাশের দিকে যাচ্ছেন।

– ঐ ১০ মণ্ডল ১৯০ মুক্ত ১ম ঋক

❑ সামা সত্যোক্তি : পরিপাতু বিশ্বতো দ্যাবা চ যত্র ততনগ্ন হানি চ। বিশ্ব মন্যন্নি বিশতে যজেজতি বিশ্বা হাপো বিশ্বা-হো-দেতি সূর্যঃ ॥

অর্থাৎ সে যে সত্যবাক। আকাশ এবং দিবা যাকে অবলম্বন করে বর্তমান আছে। বিশ্বভুবন এবং প্রাণীবর্গ যার আশ্রিত, যার প্রভাবে প্রতিদিন জল প্রবাহিত হচ্ছে এবং সূর্যদেব উদয় হচ্ছেন।

❑ যজুর্বের্দ সংহিতা ১ম অঃ ১৬ মন্ত্রের টীকায় সূর্যের নাম হিরণ্য পাণি' হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে— দৈত্যগণের প্রাশিত্র নামক অস্ত্রের প্রহারে সবিতা (সূর্য) দেবের পাণি বা হাতদুটো ছিন্ন হওয়ায় দেবগণ তাঁকে সুবর্ণময় হস্ত প্রদান করেন। এই কারণে সবিত্রি (সূর্য) দেবকে 'হিরণ্যপাণি' বলা হয়ে থাকে।

❑ প্রমিনতী মনুষ্যা যুগাণি যোষা জারস্য চক্ষসা বিভাতি।

অর্থাৎ প্রনয়ী সূর্যের স্ত্রী উষাদেবী মনুষ্যগণের আয়ু হ্রাস করে বিশেষ রূপে প্রকাশিত হন। – ঐ ৯৪ সূক্ত ১১ ঋক

www.pathagar.com

এ সম্পর্কে আর কোনও উদ্ধৃতি তুলে ধরার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি না। তবে সহৃদয় পাঠকবর্গকে শুধু এটুকু বলার প্রয়োজন বোধ করছি যে, শুধু পৃথিবী এবং সূর্যই নয়, বায়ু, বরুণ, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, এমনকি ভেক সম্পর্কেও এমনি ধরনের অদ্ভুত বিবরণ বেদে বিদ্যমান।

সূর্যের এই গুরুত্ব সম্পর্কে বেদ-পুরাণাদিতে বিশ্বাস পোষণকারী বিশেষ করে পুজকসম্প্রদায়ের মনে যে ধারণাটি বিশেষভাবে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে এখানে তার কিছুটা আভাস দেয়া প্রয়োজন। অন্যথায় আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

তাঁদের ধারণায় এটা বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে যে, বিশেষ বিশেষ সময় পালাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহাদেব সূর্যমণ্ডলের মধ্যে অবস্থান করেন। এই কারণেই তারা ত্রি-সন্ধ্যায় যখন গায়ত্রী পাঠ করেন তখন সূর্যের সাথে সাথে তাঁদের ঐ দেবতা ত্রয়েরও ধ্যান করতে হয়।

এখানে বলা আবশ্যক যে, গায়ত্রী মন্ত্রের অংশ বিশেষ হলো, 'তৎসবিতু র্বরেণ্যং ভার্গোদেবস্য ধীমহি" অর্থাৎ ঐ সবিতা (সূর্য) বরণীয়। আমি উক্ত দেবের রূপের ধ্যান করছি।

এই ধ্যানের সময় সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যায় যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহাদেবের চেহারা হুবহু মানস-লোকে ফুটিয়ে তুলতে হয়। ত্রিবেদীয় সন্ধ্যাবিধি, পুরোহিতদর্পন, নিত্যকর্মপদ্ধতি, হিন্দুসর্বস্ব প্রভৃতি গ্রন্থে উক্ত দেবতাত্রয়ের চেহারা সম্পর্কে নিম্নরূপ বর্ণনা রয়েছে ঃ

"(ললাটে) শ্বেতং দ্বিভুজং ত্রিশূল ডমরু করং অর্দ্ধচন্দ্র বিভূষিতং ত্রিনেত্রং বৃষভারুঢ়ং শম্ভুংধ্যায়ণ ॥"

অর্থাৎ ললাটে শ্বেতবর্ণ, দ্বিভূজ, ত্রিশূল ডমরুধারী, অর্ধচন্দ্রবিভূষিত, ত্রিনয়ন, বৃষভারুঢ় সম্ভুর ধ্যান করি।

"(নাভৌ) রক্তবর্ণং চতুর্ম্মুখং দ্বিভূজং অক্ষসূত্র কমণ্ডলু করং
হংসাসন সমারুঢ়ং ব্রহ্মানং ধ্যায়ন ॥"

অর্থাৎ, নাভি দেশে রক্তবর্ণ, চতুর্ম্মুখ, দ্বিভূজ, একহস্তে অক্ষসূত্র (রুদ্রাক্ষের মালা) এবং অপর হস্তে কমণ্ডলুধারী হংসারুঢ় ব্রহ্মার ধ্যান করি।

"(হৃদি) নীলোৎপল দলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্ম হস্তং
গরুড়ারুঢ়ং কেশবং ধ্যায়ন।"

অর্থাৎ, হৃদয়ে নীলোৎপল কান্তি-সদৃশ, চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্র গদা-পদ্মধারী গরুড়ারুঢ় শ্রীকেশব (বিষ্ণু) এর ধ্যান করি।

বলা বাহুল্য, সূর্যমণ্ডলের মধ্যে ওপরোক্ত তিনজন ঈশ্বরের বিদ্যমানতায় বিশ্বাসসূর্যের গুরুত্ব এবং মাহাত্মবর্ধনে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। এ নিয়ে আর আলোচনা বাড়াতে চাই না। প্রসঙ্গের উপসংহারে সুধী পাঠকবৃন্দের কাছে অত্যন্ত

www.pathagar.com

বিনয়ের সাথে শুধু এইটুকু অনুরোধ করেই বিদায় নিতে চাই যে, আপনারা ওপরের এই ঋকসমূহ পাঠ করুন এবং অভিনিবেশসহকারে ভেবে দেখুন—

আজ থেকে কয়েক হাজার বছর পূর্বে এমন সুন্দর, সাবলিল, প্রাঞ্জল, শব্দালঙ্কারে সুসমৃদ্ধ এবং ভক্তি ও ভাবের উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ এমন গ্রন্থ যাঁরা রচনা করতে পেরেছিলেন তারা কত বড় পণ্ডিত এবং ভক্তিমান ছিলেন। ভেবে দেখুন, তাঁদের পাণ্ডিত্য এবং ভক্তিময়তা আজ কয়েক হাজার বছর পরবর্তী সময়ের এই আধুনিক যুগের পণ্ডিতমণ্ডলীর যোগ্যতা এবং ভক্তিময়তাকে ম্লান করে দেয় কি না।

তবে এ সম্পর্কে কিছু ভ্রান্ত ধারণা এবং কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি যে বহুকাল থেকেই চলে আসছে সেকথা অস্বীকার করতে বা পাশ কাটিয়ে যেতে আমি চাই না। বরং আমার অতিক্ষুদ্র ও অতি নগণ্য শক্তিতে যত দূর সম্ভব সেই ভ্রান্ত ধারণা ও ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটানো অন্তত সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়াকে আমি আমার একটি নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করি।

এই সব ভ্রান্ত ধারণা এবং ভুল বোঝাবুঝি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। তাই অতি সংক্ষেপে তার কিছুটা আভাস দিয়ে সে সম্পর্কে আমার সুদৃঢ়, বাস্তব এবং অপরিবর্তনীয় অভিমত আমি তুলে ধরছি।

❑ কিছুসংখ্যক মানুষ দুঃখের সাথে বলে থাকেন, "এইরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধর্মীয় বিধান যাঁরা রচনা করতে পারলেন তাঁরা কি করে ওপরে বর্ণিত ওসব অদ্ভুত-অবিশ্বাস্য এবং প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত ঘটনাসমূহকে বিশ্বাস এবং তার বিবরণকে ধর্মীয় বিধানের অন্তর্ভুক্ত করতে পারলেন?"

* ইতোপূর্বে আলোচনা প্রসঙ্গে এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে। তথাপি পরিস্কার উপলব্ধির জন্য এখানে বলা যাচ্ছে যে, এই সব ঘটনার অধিকাংশ বিবরণই তাঁরা উত্তরাধিকার সূত্রে সত্য এবং অভ্রান্ত বলে গভীরভাবে বিশ্বাস পোষণ করে চলেছিলেন। লেখ্য-ভাষার উদ্ভাবন এবং এতে পাণ্ডিত্যঅর্জনের পরে তদানীন্তন সমাজ এবং ভাবীকালের মানুষদের ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলা এবং উদ্বুদ্ধ করে রাখার স্থায়ী, কার্যকর এবং বিশ্বাসযোগ্য ব্যবস্থা হিসাবে সেগুলো লিপিবদ্ধ করার মহান দায়িত্ব তাঁরা পালন করেছেন। এজন্য সমালোচনার পরিবর্তে বরং তাঁদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা এবং প্রশংসা জানানোকেই আমি কর্তব্য বলে মনে করি।

বিষয়টি সম্যকভাবে উপলব্ধি করার জন্য উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, যা সত্য এবং অভ্রান্ত নয়— নিছক কল্পনামাত্র, কেউ যদি তাকে সত্য এবং অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করে অভিধানের বাছা বাছা শব্দগুলো দিয়ে তা সুসজ্জিত করে এবং তার স্বপক্ষে খুব উচ্চমানের প্রশংসা-গীতি রচনা করে' নিয়ে সুললিত

www.pathagar.com

কণ্ঠে আবৃত্তি করতে থাকে তদ্বারা তা যেমন সত্য ও অভ্রান্ত হয়ে যায় না ঠিক তেমনিই আবৃত্তিকারীকে নির্দোষ, সরল-বিশ্বাসী এবং সুপণ্ডিত বলা গেলেও সত্য-দ্রষ্টা, ধীশক্তিসম্পন্ন এবং নির্ভুল সিদ্ধান্তগ্রহণকারী বলে আখ্যায়িত করা যায় না।

দুঃখের বিষয়, তদানীন্তন অবস্থার কথা ছেড়ে দিয়ে বর্তমান অবস্থার দিকে নজর দিলেও শুধু সেই একই অবস্থার পুনরাবৃত্তিই লক্ষ্যিভূত হবে না বরং দেখতে পাওয়া যাবে যে, সেই অসত্য, বিভ্রান্তিকর এবং নিছক কল্পনা-প্রসূত বিষয়কেই শব্দের মারপেঁচ, কূটতর্কের ধূম্রজাল এবং দর্শনের ঝংকার দিয়ে সত্য এবং অভ্রান্ত বলে প্রমাণ করার এক অবিরাম প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

❑ অভিযোগকারীদের দ্বিতীয় অভিযোগ হলো, উক্ত ধর্মীয় বিধানসমূহের মধ্যে লীলা-কাহিনীর নামে এমন সব অশ্লীল, অশালীন ও যৌন-উত্তেজনামূলক ঘটনার বিবরণ রয়েছে যা শুধু ভীষণভাবে লজ্জাজনকই নয়— ব্যক্তি এবং সমাজের পক্ষেও ভয়ংকরভাবে ক্ষতিকর।

তাছাড়া ওসব ধর্মীয় বিধানের প্রতি বিশ্বাসপোষণকারী ব্যক্তিদের দ্বারা উলঙ্গ-অর্ধ উলঙ্গ নারী, যুগলমিলন ও নর-নারীর যৌন-অঙ্গ প্রভৃতির মূর্তি অতি প্রকাশ্যে এবং মহা ধুমধামের সাথে সম্পূজিত হয়ে আসছে। এটাও শুধু দৃষ্টিকটু এবং লজ্জাজনকই নয়— নৈতিক চরিত্রের পক্ষেও ভীষণভাবে ক্ষতিকর। কি করে এ সবকে পবিত্র ধর্মের কাজ বলা যেতে পারে আর কি করেইবা এই বিংশ শতাব্দীর মত উজ্জ্বল-উন্নত যুগেও তা চালু রাখা হয়েছে?

* বলাবাহুল্য, দু'চার কথায় এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে, ওসব ধর্মীয়-বিধান রচনার কাজ চলছিল এখন থেকে কয়েক হাজার বছর পূর্বে। প্রকৃতপক্ষে সেটা ছিল সভ্য সমাজ গড়ার প্রাথমিক অবস্থা।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিশেষজ্ঞদের অভিমতানুযায়ী তার পূর্বে বহুদিন যাবৎ মানুষ উলঙ্গ থেকেছে। তার পরে গাছের ছাল বা পাতা দিয়ে শুধুমাত্র লজ্জাস্থানটুকু ঢেকে রেখেছে। এই অবস্থার পরবর্তী স্তরে অর্থাৎ আলোচ্য সময়ে মানুষের মধ্যে যতটুকু লজ্জাবোধ জাগ্রত হওয়া সম্ভব ততটুকুই তাদের নিকট থেকে আশা করা যেতে পারে।

যতদূর জানা যায় আমাদের আলোচ্য মানবগোষ্ঠির মধ্যে তখন বিবাহপ্রথা চালু হলেও নর-নারীর অবাধ মেলামেশা বা স্বামীর ইচ্ছায় বা অনুমতিক্রমে ভিন্ন পুরুষের অঙ্ক-শায়িনী হওয়া এবং সন্তানোৎপাদন করে নেয়া প্রভৃতি দোষণীয় বা লজ্জাজনক বলে বিবেচিত হয়নি। সুতরাং ওসব ঘটনার বিবরণ ধর্মীয় বিধানে লিপিবদ্ধ করে রাখাও যে দোষণীয় বা লজ্জার কাজ বলে বিবেচিত হয়েছিল না সেকথা সহজেই অনুমেয়।

www.pathagar.com

* এর পরে যৌনাঙ্গের পূজা সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, আদিম মানুষেরা সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে এই বাস্তব অভিজ্ঞতাই লাভ করেছিল যে সন্তান সৃষ্টির জন্য নর-নারীর যৌনঅঙ্গের মিলন একান্তরূপেই অপরিহার্য। সুতরাং যৌনাঙ্গকেই তারা সৃষ্টির মূল বলে ধরে নিয়েছিল। সে সময়ের সেই জড়তাগ্রস্থ শিশুমন যদি ধরে নিয়ে থাকে যে কোন বিশেষ দেব এবং দেবীর যৌনমিলনের ফলেই এই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে তাহলে তদানীন্তন অবস্থার প্রেক্ষিতে সেটাকে অন্যায় বা অস্বাভাবিক বলা যেতে পারে না। আর এই মানসিকতা নিয়ে তারা যদি সুন্দর স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী পুত্রলাভের আশায় বিশেষ কোনও যৌনাঙ্গের পূজা চালু করে থাকে তবে সেটাকেও স্বাভাবিক বলেই ধরে নিতে হবে।

বর্তমান যুগেও যাঁরা ওসব পূজা চালু রেখেছেন তাঁরা ভাল করছেন বা মন্দ করছেন তা ভেবে দেখার দায়িত্ব তাঁদের ওপরই ছেড়ে দিয়ে আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশেই ধর্মের নামে এসব জঘন্য কাজ চালু ছিল। আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে তা দূরীভূত এবং সুদূর অতীতের ইতিহাসে পরিণত হয়েছে।

সুতরাং এখনও যেসব স্থানে এসব কাজ চালু রয়েছে আজ হোক আর কাল হোক তা দূরীভূত হয়ে যাবে। কেননা, যা সত্য নয় তা টিকে থাকতে পারে না। তবে এসবের অনুষ্ঠাতাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তাঁরা একাজে যত বিলম্ব করবেন, তাঁদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসও ততই ক্ষুব্ধ এবং ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতে থাকবে। আর এ অবস্থায় তাঁরা নিজেদের সনাতন, সভ্যতম, মহত্তম প্রভৃতি যা কিছু বলেই দাবি করুন না কেন তা হবে একান্তই মূল্যহীন এবং জাগ্রত জনতা সেটাকে অসারের তর্জনগর্জন বলেই প্রত্যাখ্যান করবে।

❑ এ সম্পর্কীয় তৃতীয় অভিযোগটি হল, ধর্ম একান্তরূপেই বিশ্বাসের বিষয়। আর বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে কর্মের মাধ্যমে। অর্থাৎ বিশ্বাসের দাবি এবং কর্মানুষ্ঠানের মধ্যে গরমিল বা অসামঞ্জস্য থাকলে সেটাকে বলা হয় কপটতা। গরমিল যত বেশি হয় বিশ্বাসের দাবিদাররাও তত বড় কপট বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

আমরা আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই জানি যে, যতক্ষণ কোনও বস্তু বা বিষয়কে জানা যায় না ততক্ষণ তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। আর এই জানার গভীরতা যত বেশি হয় বিশ্বাসের মাত্রা এবং দৃঢ়তাও তত বেশি হয়ে থাকে।

এথেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, যেহেতু ধর্ম একান্তরূপেই বিশ্বাসের বিষয় অতএব এই বিশ্বাস স্থাপনের জন্য ধর্মকে জানতে হবে। আর এই জানার গভীরতা যত বেশি হবে ধর্মের প্রতি বিশ্বাসও তত দৃঢ় এবং শক্তিশালী হবে।

www.pathagar.com

বলাবাহুল্য, ধর্মীয় বিধানই হলো ধর্মকে জানার নির্ভরযোগ্য, স্থায়ী এবং শক্তিশালী মাধ্যম।

অথচ আলোচ্য ধর্মীয় বিধানসমূহের মধ্যে 'নানা মুনির নানা মত'-এর সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। ফলে এসবের কোনটাকে ছেড়ে কোনটাকে গ্রহণ করা যাবে তা নির্ণয় করতে না পেরে মানুষ নিজ নিজ ইচ্ছা বা পরিবেশের চাপে যেকোনও মতের সমর্থক হয়ে পড়েছে। আর তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে গড়ে উঠছে পরস্পর বিবদমান, হিংসা ও ঘৃণা-বিদ্বেষপরায়ণ অসংখ্য দল এবং উপদল।

স্থান এবং ক্ষেত্রবিশেষে এমনও দেখা যায় যে একই মানুষ সকল মুনির সমর্থক হতে গিয়ে নিজেকে বহুরূপীতে পরিণত করেছেন। অর্থাৎ তিনি নিজেকে একাধারে একত্ববাদ, জড়বাদ, চিন্ময়বাদ, অহংবাদ, সোহহংবাদ প্রভৃতি পরস্পরবিরোধী মতের গোঁড়া সমর্থক বলে দাবি করে চলেছেন।

এখন কথা হলো, ধর্মীয় বিধানে বিদ্যমান এসব স্ববিরোধী এবং পরস্পর বিরোধী অভিমতসমূহের সবগুলো যে সত্য নয় সেকথা অনস্বীকার্য। এমতাবস্থায় সত্য নয় এমন কিছুকে কেন ধর্মীয় বিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হলো আর কেনইবা সর্বসম্মতভাবে যেকোনও একটি মত গ্রহণ করা হলো না?

* বলাবাহুল্য, এই প্রশ্নের উত্তরও দু'চার কথায় দেয়া সম্ভব নয়। অথচ বিস্ত ারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। যারা এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে আগ্রহী তাঁদেরকে আমার লিখিত 'মূর্তি পূজার গোড়ার কথা' গ্রন্থটি পাঠ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এখানে অতি সংক্ষেপে বলা যাচ্ছে যে, কিরূপ প্রচণ্ড ও ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে চারদিকে সাহায্যের হাত বিছাতে গিয়ে তদানীন্তন ধর্ম বা প্যাগানিজমের উদ্ভব ঘটানো হয়েছিল ইতোপূর্বে সে আভাস দেয়া হয়েছে।

পরবর্তী বংশধরেরা এই অবস্থার যথেষ্ট পরিমাণে উন্নতি-অগ্রগতি সাধনে সক্ষম হলেও যেহেতু তাঁরা ছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে সেই প্যাগানিজমেরই একনিষ্ঠ ধারক এবং বাহক আর যেহেতু নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়া এই প্যাগানিজমের সত্যতা যাঁচাইয়ের কোনও নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড[১] তাঁদের কাছে ছিল না অথবা থাকলেও অন্ধবিশ্বাসের নাগপাশ ছিন্ন করে সে মানদণ্ডকে তাঁরা গ্রহণ করতে পেরেছিলেন না। অতএব তাঁদের যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা নিবদ্ধ হয়েছিল সেই প্যাগানিজমকে কেন্দ্র করেই।

---

১. এই মানদণ্ডটি সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে।

www.pathagar.com

অন্যদিকে সত্যতা যাঁচাই-এর কোনও নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য মানদণ্ডের অভাবে তাঁরা না পারছিলেন কোনও ঐকমত্যে উপনীত হতে আর না পারছিলেন একের মত অন্যে খণ্ডন বা গ্রহণ করতে। যার ফলে একত্ববাদ বহুত্ববাদ, সাকারবাদ-নিরাকারবাদ, জড়বাদ-চিন্ময়বাদ, নরকবাদ-জন্মান্তরবাদ, বৈরাগ্যবাদ-বর্ণাশ্রমবাদ, মায়াবাদ-শূন্যবাদ প্রভৃতি পরস্পরবিরোধী মতবাদ ও চিন্তাধারা ধর্মের অঙ্গনে এমনভাবে একসঙ্গে ভীড় জমানোর সুযোগ পেয়েছে।

পরবর্তীকালে ভাষার লালিত্য, দর্শনের অলঙ্কার, কূটতর্কের মারপ্যাঁচ, ভাবের উচ্ছ্বাস, আনুষ্ঠানিকতার বর্ণাঢ্য আয়োজন, আপ্তবাক্যের প্রলেপ প্রভৃতি দিয়ে প্রকৃতপক্ষে সেই প্যাগানিজমকেই প্রতিষ্ঠাদানের কাজ চালিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং আজও চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এ সম্পর্কীয় সর্বশেষ প্রশ্নটি হলো, বেদকে সত্য, সনাতন, অপৌরষেয় এবং স্বর্গীয় আপ্তবাক্য বা স্বয়ং ভগবানের পবিত্র মুখ-নিসৃত বলা হয়ে থাকে। এ কথা সত্য হলে এত সব কল্পিত দেব-দেবী ও প্রাকৃতিক পদার্থের স্তুতি-বন্দনা, প্রাকৃতিক পদার্থ সম্পর্কে অযৌক্তিক ও বিভ্রান্তিকর বর্ণনা বিবৃতি, জাতিভেদ প্রথা ও মানুষে মানুষে ঘৃণাবিদ্বেষ সৃষ্টির প্ররোচনামূলক ব্যবস্থাদি স্থান পেল কেমন করে?

* এই প্রশ্নের সরল সোজা উত্তর হল, বেদ যে মানবরচিত তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বেদেই বিদ্যমান। বৈদিক পণ্ডিতদের অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সুধী ব্যক্তিরাও বেদকে মানবরচিত বলেই জানতেন। পরবর্তী সময়ে ভাবের আধিক্য, ভক্তির উচ্ছ্বাস, শ্রেণীবিশেষ কর্তৃক বেদকে কুক্ষিগত করার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা এবং সাধারণ মানুষের মনে বেদের সত্যতা সম্পর্কীয় বিশ্বাস স্থায়ী ও সুদৃঢ়করণ প্রভৃতি নানা উদ্দেশ্যে বেদকে স্বর্গীয়-আপ্তবাক্য অর্থাৎ স্বয়ং ভগবানের পবিত্র মুখনিসৃত বলে প্রচারণা চালানো হয়েছে।

যিনিই বেদপাঠ করেছেন তিনিই লক্ষ্য করেছেন যে, প্রতিটি বেদমন্ত্রের প্রথমেই উক্ত মন্ত্রের প্রণেতা, কোন দেবতার উদ্দেশে রচিত, কোন ছন্দে পাঠ করতে হবে এবং কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে সেকথা সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণিত রয়েছে। যারা বেদপাঠ করেননি বা যাদের তা পাঠ করার সময়-সুযোগ কিংবা অধিকার নেই তাদের অবগতির জন্য এ সম্পর্কীয় কতিপয় তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

ঘোর-পুত্র ঋষি কণ্ব বেদ রচনাকারীদের এই বলে উপদেশ দিচ্ছেন ঃ

মিমীহি শ্লোক মাস্যে পর্জন্য ইব ততনঃ।
গায় গায় ত্রমুক্থ্যম ॥

www.pathagar.com

অর্থাৎ মুখে মুখে শ্লোক রচনা কর, পর্জন্যের ন্যায় তা বিস্তার কর। স্তুতিবিশিষ্ট গায়ত্রীচ্ছন্দে রচিত (সুক্ত) পাঠ কর।

– ঋগ্বেদ সংহিতা ১ম মণ্ডল ৩য় পুক্ত ১৪ ঋক

বলাবাহুল্য, এমনি ধরনের বহু শ্লোকই রয়েছে, বাহুল্যবোধে পরিত্যক্ত হল। তবে বেদের ইতিহাস যাঁরা জানেন না তাঁদের অবগতির জন্য বেদপ্রণেতাদের কে কতগুলো করে বেদসুক্ত রচনা করেছেন তার সংক্ষিপ্ত আভাস নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে। যাঁরা ইচ্ছা করেন বা যাঁদের সুযোগ রয়েছে তাঁরা অনুগ্রহ করে এই আভাসের সত্যতা যাঁচাই করে দেখতে পারেন।

❑ ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ৪৩টি সূক্তের মধ্যে ৪০টির প্রণেতা হলেন ঋষি গৃৎসমদ। বাকি ৫, ৬ এবং ৭ সংখ্যক সুক্ত রচনা করেছেন ভৃগু ঋষির পুত্র সোমাহুতি।

❑ উক্ত বেদের তৃতীয় মণ্ডলের সুক্ত সংখ্যা ৬২; এর ২৩ সংখ্যক সুক্ত বাদে বাকি ৬১টি সুক্ত একই পরিবারের কতিপয় ব্যক্তি রচনা করেছেন। তাঁরা হলেন প্রখ্যাত ঋষি বিশ্বামিত্র, তাঁর পিতা গাথি, পুত্র প্রজাপতি, ঋষভ এবং কচের পুত্র উৎকীল। ২৩ সংখ্যক সুক্তটি রচনা করেছেন দেবশ্রবা ও দেববাত। এরা এই পরিবারভুক্ত ছিলেন কি না তা জানা যায় না।

❑ অনুরূপভাবে ৪র্থ মণ্ডলের ৫৮টি সুক্তের মধ্যে ঋষি রামদেব রচনা করেছেন ৪২টি। ৪২, ৪৩ ও ৪৪ সংখ্যক সুক্তত্রয়কে রচনা করেছেন যথাক্রমে ত্রত দস্যু, ঋষি পুরমীল্হ ও আজমীল্হ।

❑ পঞ্চম মণ্ডলের ৮৭টি সুক্তের প্রায় সব ক'টিই অত্রি ঋষি এবং তাঁর পুত্রদের রচিত। তাঁর কন্যা বিশ্ববারাও এর একটি সুক্ত রচনা করেছেন।

❑ ষষ্ঠ মণ্ডলের ৭৫টি সুক্তের মধ্যে ৪৪, ৪৫ ও ৪৬ সংখ্যক সুক্তের রচয়িতা বৃহস্পতি ঋষির অন্যতম পুত্র শংকু। ৪৮ সংখ্যক সুক্ত রচনা করেছেন তৃণপাণি। বাদবাকি সুক্তগুলোর রচয়িতা হলেন বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজ এবং তাঁর পুত্রগণ।

❑ ৭ম মণ্ডলের ১০৪টি সুক্তের মাত্র ৪৩ সংখ্যকে সুক্তটি বশিষ্ট এবং তাঁর পুত্রগণ মিলিতভাবে রচনা করেছেন। বাকি ১০৩টি সুক্তই রচনা করেছেন বশিষ্ট মুনি।

শুধু পুরুষরাই নন, মহিলারাও যে বহু সংখ্যক বেদমন্ত্র রচনা করেছেন সে প্রমাণেরও অভাব নেই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে–

(ক) ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডলের ১৭৯ সংখ্যক সুক্তটি রচনা করেছেন ঋষি অগস্তের পত্নী লোপামুদ্রা।

(খ) ঋগ্বেদ ৫ম মণ্ডলের ২৮ সংখ্যক সুক্তটি রচনা করেছেন অত্রি কন্যা বিশ্বরা।

www.pathagar.com

(গ) ঋগ্বেদ ৮ম মণ্ডলের ৯৬ সংখ্যক সুক্তটি রচনা করেছেন অপালা।

(ঘ) ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডলের ৩৯ ও ৪০ সংখ্যক সুক্তটি রচনা করেছেন অক্ষিবৎ-কন্যা ঘোষা।

(ঙ) ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডলের ৮৫ সংখ্যক সুক্তটি রচনা করেছেন সাবিত্রী সূর্য।

(চ) ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডলের ২৫ সংখ্যক সুক্তটি রচনা করেছেন অভৃন কন্যা বাক্।

(ছ) ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডলের ১৪৫ সংখ্যক সুক্তটি রচনা করেছেন ইন্দ্রানী।

বেদ মনুষ্য-রচিত হওয়া সম্পর্কে কারো মনে কোনওরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে থাকলে এই প্রমাণাদি থেকে তা নিরসন ঘটবে বলে দৃঢ় আশা রাখি। এখানে একথাও বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য যে, একই পরিবারের পিতা, পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, ভ্রাতা-ভগ্নি, কন্যা, ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি সকলে সমভাবে জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, ধীশক্তিসম্পন্ন, ধর্মভীরু বা মহাপুরুষ হতে পারেন না। এমতাবস্থায় পরিবারের প্রতিটি মানুষের দ্বারা রচিত শ্লোক বা ঋক বেদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বেদকে সামগ্রিকভাবে মহাপুরুষ রচিত বলাও যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না।

তবে বেদকে ভগবানের মুখ-নিসৃত বলার একটা কারণ এই হতে পারে যে, শাস্ত্রানুযায়ী কোনও মানুষ ঐশ্বর্য-বীর্যাদি ছয়টি গুণের অধিকারী হলেই ভগবান হয়ে যান। আবার ব্রাহ্মণমাত্রই বেদ-পগার হওয়ার সাথে সাথে জগতের ঈশ্বর হন (ঈশ সর্বস্বো জগতো ব্রাহ্মণঃ বেদঃ পারগাঃ) বলেও উল্লেখ রয়েছে। কোনও শাস্ত্রে বলা হয়েছে, "বেদ শাস্ত্রার্থ তত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসন্ইহৈব লোক তিষ্ঠাশ্চ ব্রহ্ম ভূয়ায় কল্পতে।"

অর্থাৎ যিনি বেদের শাস্ত্র এবং তত্ত্ব অবগত আছেন তিনি যেখানেই থাকুন না কেন তিনি 'ব্রহ্ম' হয়ে যান।

বঙ্গানুবাদ ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণেও দেখা যায় "ব্রাহ্মণ-কৃষ্ণের দেহ বেদে নিরূপণ; ব্রাহ্মণ-কৃষ্ণতে ভেদ নাহি কদাচন।"

এমতাবস্থায় বেদের রচনাকারীরা অনায়াসেই ভগবান, ঈশ্বর, ব্রহ্ম এবং শ্রীকৃষ্ণ-এর যেকোনও একটা হতে পারেন। বলাবাহুল্য, এই দৃষ্টিকোণ থেকে বেদকে ভগবানের পবিত্র মুখনিসৃত বলাটা কোনও ক্রমেই দোষণীয় হতে পারে না।

মানব সৃষ্টি, সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পরিণতি

সুধী পাঠকবর্গের অবশ্যই একথা মনে রয়েছে যে, 'ইতিহাস কথা কয়" লিখার মূল উদ্দেশ্যই হলো মানব-সৃষ্টি অর্থাৎ কিভাবে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে, এই

www.pathagar.com

সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি এবং তার পরিণতিইবা কি সেকথা জানা এবং এই জানার জন্যই ধর্মীয় বিধানের সাহায্য নেয়া।

সুখের বিষয় প্রসিদ্ধ ধর্মীয় বিধান মনুসংহিতায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উক্ত বিধান থেকে সংশ্লিষ্ট বিবরণের প্রয়োজনীয় অংশগুলো নিম্নে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে।

বিশ্বসৃষ্টি

সোহ ভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষু বিবিধাঃ প্রজাঃ

....

পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব ব্যালাশ্চোভয় তোদতঃ ॥

– মনু সংহিতা ৯ম অঃ ৮-৪৩ শ্লোক। দ্রষ্টব্য–

❑ সেই পরামাত্মা প্রকৃতিরূপে পরিণত আপন শরীর হইতে নানা প্রকার প্রজা সৃষ্টি করিবার অভিলাষে কিরূপে সৃষ্টি-সম্পাদন হইবে, এই সঙ্কল্প করিয়া প্রথমতঃ "জল হউক" বলিয়া আকাশাদিক্রমে জলের সৃষ্টি করিলেন ও তাহাতে আপন শক্তিরূপ বীজ অর্পন করিলেন–। ৮।

❑ অর্পিত বীজ সুবর্ণ নির্ম্মিতের ন্যায় ও সূর্য সদৃশ প্রভাবযুক্ত একটি অণ্ড হইল ঐ অণ্ডে সকল লোকের জনক স্বয়ং ব্রহ্মাই শরীর পরিগ্রহ করিলেন, (৯)

❑ নর নামক পরমেশ্বরের দেহ হইতে জলের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া উহাকে নার বলা যায়, যেহেতু ঐ জল সকল প্রলয়কালে পরমাত্মার অয়ন অর্থাৎ স্থান হয়, এই জন্য পরমাত্মা নারায়ণ শব্দে কথিত হইয়াছেন– (১০)

❑ ভগবান ব্রহ্মা সেই অণ্ডে ব্রাহ্ম পরিমাণে এক বৎসর কাল বাস করিয়া, "অণ্ড দ্বিধা হউক" মনে হইবামাত্র স্বয়ং সেই অণ্ডকে দুই খণ্ড করিলেন। ১২।

❑ তিনিই সেই দুই খণ্ডের উর্দ্ধে খণ্ডে স্বর্গ ও অপর খণ্ডে পৃথিবী করিলেন এবং মধ্যভাগে আকাশ, অষ্টদিক ও চিরস্থায়ী সমুদ্র নামক জলাধার প্রস্তুত করিলেন। ১৩।

❑ সৃষ্টিকর্তা জগদীশ্বর আপন শরীরকে দুই খণ্ড করিয়া অর্দ্ধাংশে পুরুষ ও অর্দ্ধাংশে নারী হইলেন, ঐ উভয়ের পরস্পর সংযোগে বিরাট নামক পুরুষ উৎপন্ন হইল। ৩২।

❑ হে দ্বিজসত্তম! সেই বিরাট পুরুষ বহুকাল তপস্যা করিয়া যাহাকে সৃষ্টি করিলেন আমি সেই মনু, আমাকে সৃষ্টিকর্তা বলিয়া অবগত হও। ৩৩

❑ অনন্তর আমি প্রজা সৃষ্টি করিবার অভিলাষে বহুকাল কঠোর তপস্যা করিয়া প্রথমত প্রজা সৃজনে সমর্থ দশজন প্রজাপতির সৃষ্টি করিলাম। ৩৪।

www.pathagar.com

❑ ইঁহারা যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, অসুর, অজগরাদি নাগ ও সর্প, গরুড়াদি পক্ষিগণ; আজ্যপাদি নামক পিতৃগণকে পৃথক পৃথকরূপে সৃষ্টি করিলেন। ৩৪।

উল্লেখ্য, বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার একটি কারণই থাকতে পারে। আর তাহল প্রকৃতই যা সত্য তা নিয়ে কোনও ভিন্নতার সৃষ্টি হয় না। দুই এবং দুই-এ চার হয় এটা পৃথিবীর সর্বত্রই হয়, চিরদিন হয়েছে এবং হতে থাকবে। আর যেহেতু সকল মানুষের কল্পনাশক্তি সমান নয়, অতএব ভিন্ন ভিন্ন জনের কল্পনার ফসল ভিন্ন ভিন্নই হয়ে থাকে, আর তাই স্বাভাবিক। এখানেও তা-ই হয়েছে।

এই ভিন্নতা সম্পর্কে একটিমাত্র উদাহরণ দিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছি। এখানে অর্থাৎ মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, "সৃষ্টিকর্তা জগদীশ্বর আপন শরীরকে দুইখণ্ড করিয়া অর্দ্ধাংশে পুরুষ ও অর্দ্ধাংশে নারী হইলেন (৩১) অথচ বায়ু পুরাণে জগদীশ্বরের পরিবর্তে ব্রক্ষার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ 'ব্রহ্মা তার শরীরকে দু'ভাগ করে অর্ধেক ভাগ দ্বারা নারী সৃষ্টি করেন' বলে বলা হয়েছে। এই নারীর নাম সাবিত্রী; অন্য কোনও নারী না থাকায় ব্রহ্মা স্বীয় কন্যা এই সাবিত্রীর সাথে মিলিত হন এবং সন্তানোৎপাদন করেন। এ প্রসঙ্গে মূল শ্লোকটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলে বিষয়টি আরও পরিস্কার হবে বলে আশা করি।

ততঃ স্বদেহ সম্ভুতা মাত্মজা মিত্যকল্পয়ৎ
শতরূপাচ সাক্ষাতা সাবিত্রীচ নিগদ্দতে
সাবিত্রীং লোক সৃষ্টাংশ্চ হৃদিকৃত্তা সমস্থিতা ॥

এর মোটামুটি তাৎপর্য হল, নিজের দেহ থেকে উৎপন্ন বিধায় সাবিত্রী হলেন ব্রহ্মার আত্মজা অর্থাৎ কন্যা, সেই কন্যার সাথে মিলিত হয়ে ব্রহ্মা লোক সৃষ্টি করেন।

আমি মনে করি যে, শাস্ত্রকর্তা এখানেও ভুল করেছেন। কেননা আত্মজা বা কন্যাকে যেভাবে জন্ম দেয়া হয় অর্থাৎ জন্ম দেয়ার স্বাভাবিক যে পদ্ধতি সেই পদ্ধতি অনুযায়ী তিনি সাবিত্রীকে জন্ম দিয়েছিলেন না। 'নিজ দেহ বিভক্ত করে' অর্ধেক ভাগকে নারীতে পরিণত করেছিলেন। এই হিসাবে সাবিত্রীকে ব্রক্ষার আত্মজা না বলে অর্ধাঙ্গিনী বলাই সঙ্গত। শাস্ত্রকর্তা হয়তো কথাটা ভাল করে ভেবে দেখেছিলেন না সেটাই এই ভ্রম-প্রমাদের কারণ। তবে এই সব বিবরণ থেকে আমরা মোটামুটি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি তা হলো, ব্রহ্মা প্রথমে সৃষ্ট হয়েছিলেন; অতএব তিনিই প্রথম মনুষ্য এবং তাঁর শরীরের অর্ধাংশ থেকে সৃষ্ট সাবিত্রীই বিশ্বের প্রথমা নারী। অতঃপর দেখা যাক, মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধর্মীয় বিধানে কোনও বিবরণ খুঁজে পাওয়া যায় কি না।

www.pathagar.com

মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য

মনুসংহিতায় মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে :

প্রজনার্থ স্ত্রিয়ঃ স্রষ্টাঃ সন্তানার্থঞ্চ মানবাঃ।

তস্মাৎ সাধারণো ধর্ম্মঃ শ্রুতো পত্ন্যা সহোদিতঃ॥

– মনুসংহিতা ৯ম অধ্যায়- ৯৬ শ্লোক

অর্থাৎ বিধাতা প্রজনন (গর্ভগ্রহণ)-এর জন্য স্ত্রী এবং গর্ভদানের জন্য মানবসৃষ্টি করেছেন। সাধারণের এটাই ধর্ম। গর্ভোৎপাদন কার্য পত্নীসহকারে নিষ্পন্ন হয় এজন্য সর্বদা পত্নীকে পোষণ করবে।

কিভাবে মানব সৃষ্টি হয়েছিল এবং এই সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি ছিল উপরোক্ত ধর্মীয় বিধান থেকে তা আমরা জানতে পারলাম। ধর্মীয় বিধানের এই সব বিবরণ বাস্তবসম্মত এবং বিশ্বাসযোগ্য কি না তা ভেবে দেখার দায়িত্ব সুধী পাঠকবর্গের ওপর ছেড়ে দিয়ে আসুন 'ধর্ম বলতে কী বোঝায়' বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের সাহায্যে আমরা সেকথা জানতে চেষ্টা করি।

ধর্ম বলতে কি বুঝায়

এ ব্যাপারে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের বিবরণ উদ্ধৃত করতে গেলে পাঠকবর্গের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে। আলোচনা দীর্ঘায়িত করে ইতোমধ্যেই ধৈর্যচ্যুতির যথেষ্ট কারণ সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব একখানা বিখ্যাত বাঙ্গলা অভিধান থেকে এ সম্পর্কীয় বিবরণটুকু উদ্ধৃত করেই নিবন্ধের ইতি টানছি।

ধর্ম (র্ম্ম) ১। সৎকর্ম অনুষ্ঠান জন্য গুণ বিঃ। সুকৃত, শুভাদৃষ্ট, পুণ্য; শাস্ত্রানুযায়ী আচার, ব্যবহার, বেদ-বিহিত অনুষ্ঠান, রীতি, আচার, কর্তব্য, ভাব, স্বাভাবিক অবস্থা, গুণ, শক্তি, Property, attribate, স্বভাব, সাদৃশ্য, গ্রহের নবম স্থান, দেশ বিঃ বা জাতি বিশেষ, ঈশ্বর, পরকাল, প্রঃ অলৌকিক পদার্থ বিষয়ক বিশ্বাস ও উপাসনা প্রণালী উচিত কর্ম, অবশ্য কর্তব্য কর্ম, ষড়বিধ পুণ্যকর কার্য [যথাযোগ্য পাত্রে দান, কৃষ্ণে মতি, মাতাপিতার সেবা, শ্রদ্ধা, বলি, গরুকে আহার্য দান।] ধর্মের অঙ্গ দশটি ঃ যথা– ব্রহ্মচৈর্য, সত্য, তপঃ, দান, নিয়ম, ক্ষমা, শুচিতা, অহিংসা, শান্তি, অস্তেয় (চুরি না করা)। ধর্মের মূল এই গুলো আদ্রোহ, অলোভ, দম্, জীবে দয়া, তপঃ ব্রহ্মচের্য, সত্য, ক্ষমা, ধৃতি। (অভিধান মতে) সৎসঙ্গ, (দিপীকা মতে) পুরুষের বিহিত ক্রিয়া সাধ্যগুণ; (মহাভারত মতে) অহিংসা; (পুরাণ মতে) যা দ্বারা লোকস্থিতি বিহিত হয়; (যুক্তিবাদী মতে) মনুষ্যের যা কর্তব্য তা সম্পাদন; (জ্ঞানবাদ মতে) মনের যে প্রবৃত্তি দ্বারা বিশ্ববিধাতা পরমাত্মার প্রতি ভক্তি জন্মে বিংপুং বাক্সী।

www.pathagar.com

২। যম, আত্মা, জীব, ন্যায় অন্যায় ও পাপ পুণ্যের বিচারকর্তা, ঈশ্বর, দেবতা বিঃ [বিষ্ণুর বক্ষস্থল থেকে এর জন্ম হয়; ইনি দক্ষের ত্রয়োদশ কন্যাকে বিবাহ করেন] ধৃ + মং কর্তৃ; বি; পুং। ধর্মের ষাড়, বৃষোৎসর্গে উৎসর্গীকৃত বৃষ, স্বচ্ছন্দচারী ব্যক্তি।

❑ লক্ষ্যণীয় যে এখানে ঈশ্বর, পরকাল, যম, আত্মা, জীব, ধর্মের ষাঁড়, বৃষোৎসর্গে (শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে) উৎসর্গীকৃত বৃষ, দেশ বিশেষ প্রভৃতিকে ধর্ম বলা হয়েছে। এসব কি করে ধর্ম হতে পারে সেকথা বোঝা সম্ভব নয়।

❑ তারপর সুকৃত, শুভাদৃষ্ট, গুণ, শক্তি, সত্য, তপঃ, দান, ক্ষমা, শুচিতা অলোভ, জীবেদয়া, গরুকে আহার্য দান প্রভৃতিকে ধর্ম বলার কোনও যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যাবে না। এগুলোকে 'ধর্মীয় অনুষ্ঠান' বা 'ধর্মীয় কাজ' বলা হলেই ঠিক বলা হত বলে মনে করি।

❑ মহাভারত থেকে জানতে পারা যায় : পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসকালে ধর্ম 'বকরূপ' ধারণ করে পাণ্ডবদের নানা প্রশ্ন করেছিলেন।

❑ মহাভারত এবং কতিপয় পুরাণের বর্ণনা মতে যমকেও ধর্ম বলা হয়ে থাকে। পাণ্ডুর স্ত্রী কুন্তির গর্ভে তিনি যুধিষ্ঠীরকে জন্মদান করেছিলেন বলে যুধিষ্ঠীরকে ধর্মপুত্র বলা হয়।

❑ স্কন্দপুরাণে নীল বলদকে চতুষ্পদ অর্থাৎ 'ষোল আনা' ধর্ম বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

❑ ধর্ম বিষ্ণুর বক্ষস্থল থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং রাজা দক্ষের ত্রয়োদশ কন্যাকে বিবাহ করেছেন বলেও ওপরের বর্ণনা থেকে জানতে পারা যাচ্ছে।

জানিনা, এই বিবরণ থেকে ধর্ম বলতে যে আসলে কি বোঝায় সুধী পাঠকবর্গ বহু চেষ্টা করেও সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনও ধারণায় উপনীত হতে পারবেন কি না।

অবস্থা দৃষ্টে এক মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে, আসলে ধর্ম বলতে যে কি বোঝায় শাস্ত্রকর্তারা সেকথা জানতেন না। আর জানার কথাও নয়। কারণ যেভাবে ধর্মের উদ্ভব ঘটানো হয়েছিল এবং ধারণা, বিশ্বাস, সামাজিক চরিত্র এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে তার যে পরিচয় অতীতে পাওয়া গিয়েছে এবং বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে ধর্মের কোনও সংজ্ঞা নির্ণয় করা সম্ভব হতে পারে না। আর পারে না বলেই এমনিভাবে গোঁজামিল দিয়ে একটা কাঠামো দাঁড় করাতে গিয়ে হ-য-ব-র-ল অবস্থার সৃষ্টি করতে হয়েছে। জানি, আমার এ মন্তব্য খুবই কঠোর, শ্রুতিকটু এবং বেদনাদায়ক বলে বিবেচিত হবে। কাজেই অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এবং নিরপেক্ষ, উদার ও আবেগ-উত্তেজনাহীন মন নিয়ে বিষয়টি ভালভাবে ভেবে দেখার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানিয়ে রাখছি।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়
অন্ধত্ব ও অন্ধ বিশ্বাস

অন্ধত্ব অভিশাপ। কিন্তু অন্ধ-বিশ্বাস তার চেয়েও প্রচণ্ড অভিশাপ। কেননা অন্ধ দৃষ্টিশক্তির অধিকারী নয়; পক্ষান্তরে অন্ধ-বিশ্বাসীরা দৃষ্টি শক্তির অধিকারী। শুধু তাই নয় এমন অনেক অন্ধ-বিশ্বাসী রয়েছেন যাদের দৃষ্টি অনন্ত আকাশ থেকে সুদূর পাতাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে বিস্তৃত শব্দের দ্বারা একথাই বোঝানো হয়েছে যে, আকাশে-পাতালে বিদ্যমান ছোটবড় এমনকি অণু-পরমাণু নির্বিশেষে প্রায় প্রতিটি বস্তুর অবস্থান, চরিত্র, শক্তি-সামর্থ প্রভৃতির প্রতিও তাঁদের সজাগ এবং সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে।

বিশ্ব-নিখিলের এসব তত্ত্ব ও তথ্য জানার জন্য এঁরা বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা, চিন্তা-গবেষণা প্রভৃতির মাধ্যমে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রয়োজন হলে এজন্য যেকোনও দুঃখ-কষ্ট, আঘাত-বেদনা সহ্য করতে এমনকি নিজেদের অতি মূল্যবান জীবন বাজি রাখতেও তারা পশ্চাৎপদ হন না। কারণ তাঁদের দাবি হলো যথাযোগ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং প্রকৃষ্ট যুক্তি প্রমাণ ছাড়া এঁরা কোনও কিছু সত্য বলে মানেন না, গ্রহণ করেন না।

অথচ এই ব্যক্তিরাই ধর্ম এবং অন্যান্য কতিপয় ক্ষেত্রে কোনওরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা চিন্তা-গবেষণার সামান্যতম প্রয়োজনও অনুভব করেন না। এমনকি সেসবের ত্রুটি, ভুল-ভ্রান্তি এবং অকেজো ও যুগের অনুপযোগী হয়ে যাওয়া সম্পর্কে সুপরিক্ষিত এবং নির্ভরযোগ্য যুক্তি প্রমাণাদি উপস্থাপিত করা হলে সেসব তাঁরা অপরিসীম ঘৃণা ও নিদারুণ ভীতির সঙ্গে শুধু প্রত্যাখ্যানই করেন না, সর্বশক্তিতে তার বিরোধিতায়ও লেগে যান।

এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, অন্ধ ব্যক্তিরা তাদের ত্রুটি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত থাকেন। সুতরাং সর্বাধিক সতর্কতার সাথে পা টিপে টিপে এবং সম্ভাব্য উপায়ে পথের অবস্থা যাঁচাই করে পা ফেলেন। অবশ্য এতসব স্বত্ত্বেও এদের কেউ কেউ অকস্মাৎ গর্তে পতিত হন। তবে সে গর্তটা থাকে অপরের তৈরি এবং তাতে অন্ধ ব্যক্তিটি একাই পতিত হয়ে থাকেন।

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে অন্ধ-বিশ্বাসীরা তাঁদের ক্রটি সম্পর্কে অবহিত তো ননই বরং সে সম্পর্কীয় অজ্ঞতাকেই তাঁরা নিষ্ঠা ও ধার্মিকতার পরাকাষ্ঠা বলে মনে করেন। এবং যাঁরা তা করেন না তাদের অধার্মিক, ভ্রান্ত, পথ-ভ্রষ্ট ইত্যাদি বলা এবং তাদের সম্পর্কে জঘন্য মন্তব্য প্রকাশকে একটি নৈতিক দায়িত্ব বলেও বিবেচনা করতে থাকেন।

শুধু তা-ই নয়, অদ্ভুত অলৌকিক কেচ্ছা-কাহিনীর মাধ্যমে এইসব তথাকথিত পথ-ভ্রষ্টদের হেদায়েত করা এবং অন্যদের স্বমতে দীক্ষা দানের এক প্রচণ্ড অভিযানও তারা চালিয়ে যেতে থাকেন।

উল্লেখ্য, অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই অবস্থা চলে আসছে। প্রাচীন কালের তথ্য-প্রমাণাদি থেকে জানা যায় ঃ সে সময়ে সমাজের প্রতিভাধর এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যখনই উন্নত ধরনের কিছু আবিস্কার উদ্ভাবন করেছেন, তখনই এই শ্রেণীর মানুষেরা তাদের বানর, রাক্ষস, কপি, কবন্ধ, ম্লেচ্ছ, যবন, অচ্ছুৎ অসুচী প্রভৃতি যেকোনও একটা আখ্যা প্রদান করে সমাজ থেকে বহিষ্কার করেছেন এবং তাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ভিন্ন করেছেন।

সে যাহোক, এইসব অন্ধ-বিশ্বাসী নিজেদের ক্রটি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা এবং কুপমণ্ডুকতার কারণে সাবধানে ও সতর্ক হয়ে পথ চলেন না। কারণ সে প্রশ্নই তাদের মনে জাগ্রত হয় না। অতএব পথের অবস্থা যাঁচাই করে পা ফেলার প্রয়োজনীয়তাও তাঁরা অনুভব করেন না। ফলে তাঁরা গর্তে পড়েন আর সে গর্তটা থাকে তাঁদের নিজেদেরই তৈরি এবং পড়েনও নিজ নিজ দলবলের সবাইকে নিয়েই। সেই কারণেই বলছিলাম যে, অন্ধত্বের চেয়ে অন্ধ-বিশ্বাস অনেক বড় এবং অনেক প্রচণ্ড অভিশাপ।

প্রথম অধ্যায়ে প্যাগানিজম[১] সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর প্যাগানিজম সম্পর্কে এমনকিছু জাজ্জ্বল্যমান তথ্য-প্রমাণ তুলে ধরবো যা থেকে এটা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে শুধু প্যাগানিজমই নয়, সেই আদি অকৃত্রিম প্যাগানিজম যাকে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদেরা Primitive Paganism বলে মন্তব্য করেছেন আজও তা সম্পূর্ণ অক্ষত অবিকৃত অবস্থায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান।

প্রথম অধ্যায়ের শেষের দিকে মহাসমারোহে সূর্যপূজা চালু থাকার কথা বলা হয়েছে। সূর্যই যে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের দ্বারা সর্বাধিকভাবে পূজিত হয়ে

---

১. ইতোপূর্বে প্যাগানিজম শব্দের আভিধানিক তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে। অভিধানসংকলক প্রকৃতপক্ষে প্যাগান শব্দের অর্থ করেছেন বর্বর, অসভ্য, চিন্তাহীন ব্যক্তি প্রভৃতি। আদি মানবদের বর্বর, অসভ্য, প্রভৃতি বলে, আখ্যায়িত করা আমাদের বিবেক-বিরুদ্ধ বিধায় আমি সর্বত্র প্যাগান এবং প্যাগানিজম শব্দই ব্যবহার করেছি।

www.pathagar.com

আসছে সেকথাও সেখানে বলা হয়েছে। অতএব আসুন অতঃপর প্রথমেই আমরা সূর্যপূজা দেশে দেশে' এই শিরোনাম দিয়ে এবং পরে প্রয়োজনানুসারে অন্য শিরোনাম দিয়ে সহৃদয় পাঠকবর্গের সম্মুখে আমাদের দ্বিতীয় অধ্যায় উপস্থাপিত করি।

সূর্য পূজা দেশে দেশে

❑ আমেরিকার চেয়েন্নী (Chayenne) নামক আদিম সমাজ সূর্যদেবতাকে সম্মান দেখানোর জন্য পূর্বদিকে মুখ করে বাড়ি তৈরি করে। সংস্কারাবদ্ধ ধারণার জন্য তারা কখনও ঘরের পশ্চিম দিকে দরজা রাখে না। বৃষ্টিপাত ও ফসল বৃদ্ধির জন্য তাদের মধ্যে সূর্য-নৃত্যের প্রথা প্রচলিত রয়েছে।

❑ মিসিসিপি শহরে নাটসেস (Natchez) এবং পেরু অঞ্চলের ইনকাস (Incas) সূর্যপূজারই সাক্ষ্যবহন করছে।

❑ ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের আদিম সমাজে প্রস্তরনির্মিত সূর্যমূর্তির পূজা এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সূর্য-নৃত্য প্রচলিত রয়েছে।

❑ প্রায় শত শত বছর পূর্বে আমেরিকার পোয়েবলো-ইণ্ডিয়ান কর্তৃক মেসা ভারদে ন্যাশনাল পার্ক (Mesa verde National Park)-এ এক সূর্যমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং সেখানে প্রস্তরনির্মিত এক সূর্যমূর্তি স্থাপন করা হয়।

❑ মেক্সিকো শহরে সূর্যপিরামিড (Pyramid of the Sun) বিদ্যমান।[১]

❑ পারস্যের ধর্মগ্রন্থ জেন্দাবেস্তায় বর্ণিত সূর্যদেবতা হবারে (Hvare) এবং ঋগ্বেদে বর্ণিত সূর্যদেবতা 'শবর' এরই অনুরূপ। গ্রিকদের হেলিওস (Hellos) নামক সূর্যদেবতার সাথে 'হবারে' এবং 'শবর'-এর কোনও পার্থক্য নেই।

❑ পারস্যের আদিমসমাজ হবারে-কে আকাশদেবতা আহুরা মাজদার চক্ষু বলে মনে করে। হিন্দুধর্মের সূর্যদেবতার মত হবারেও শ্বেত ঘোড়া চালিত রথে আকাশ ভ্রমণ করে বলে ওদের মধ্যে বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে।

❑ জেন্দা বেস্তায় নির্দেশ রয়েছে যে, আট বছরের উর্ধ্বের প্রত্যেক নারী ও পুরুষকে সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা অন্তত এই তিন সময়ে অবশ্য কর্তব্য হিসাবে সূর্যের উদ্দেশে প্রার্থনা করতে হবে। এই প্রার্থনার মধ্যে সূর্যের প্রশংসা করতে হবে এবং নিজেদের কামনা ব্যক্ত করতে হবে।[২]

❑ আরগোলিস উপকূলীয় অঞ্চলের হার মিয়ন, ট্রোয়েজেন, উলফিস, আর্টেমিস, সাইকিয়ন প্রভৃতি স্থানে সূর্য মন্দির (Temple of the Sun) সূর্য

---

১. G. A. Dorsey : the chheyenne. The Sun dance in field Columbia Meseum, publication, 103, Anthropological series vol. 9, No. 2 (1905) P. 32.

২. A. A. Macdonnal; vedic Mythology p. 3।

www.pathagar.com

পূজারই নিদর্শন বহন করছে। এই সব অঞ্চলের মানুষেরা অনাবৃষ্টি, মহামারী বা দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে ধর্মযাজকের নির্দেশে ছাগল উৎসর্গ করে সূর্যদেবতার নিকটে বিপদ মুক্তির জন্য প্রার্থনা করে।

০ এথেন্সের উপজাতীয়রা বিশেষ ধূমধামের সাথে সূর্যপূজার অনুষ্ঠান করে থাকে। তাদের এই সূর্যপূজাকে স্কীরা উৎসব (Scira Festival) বলা হয়। এথেন্সের নিকটবর্তী স্কীরাম নামক স্থানে এই পূজার স্থান নির্বাচন করে ধর্মযাজক একটি শ্বেত ছাতা নিয়ে মিছিলসহকারে সেখানে গমন করেন। মিছিলের ছেলেরা ফলসহ গাছের শাখা ঘরের দরজায় ঝুলিয়ে রাখে, কেননা তারা বিশ্বাস করে যে এতে তাদের মঙ্গল হবে এবং মৃত্যু নিকটে আসবে না।[১]

০ সূর্যের নামানুসারেই রোমের প্রাচীন অরেলী (Auralli) গোত্রীয় লোকদের পদবী হয়েছে অসেলী (Auselli), কেননা তাদের ভাষায় সূর্যের নাম অসেল (Ausel)। রোমান সরকার তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে সূর্য-উপাসনার জন্য একটি স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সেখানে একটি সূর্যমন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

তাছাড়া সূর্যভক্তির অন্যান্য নিদর্শনও রয়েছে। Mr. J G Frazer-এর ভাষায় ঃ the coins of the Aurelians also attest hisd evotion for the solar deity. On one of them the sun is seen of Fering to the emperor a globe as a symbol of the empire of the world, with a captive Lying at their feet; some of the insrciptions on the coins Proclaim the sun-god to be the preserver or restorer of the world or even lord of the Raman Empire. Such legends seem to announce the intention of the Emperor to set the sun-god at the head of the pantheon.[২]

❑ প্রাচীন রোমান সংস্কৃতিতে সম্রাট জুলিয়ান সূর্য পূজার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গিয়েছেন। তিনি নিজকে সূর্যরাজার (King-sun) দাস বলে ঘোষণা করেছিলেন, এবং এ-ও ঘোষণা করেছিলেন যে– সূর্য সকল মানুষের পিতা। কেননা তিনিই আমাদের ভরণপোষণের মালিক এবং সকল মঙ্গল তাঁর হাতেই নিহিত। আমাদের জীবনধারণের লক্ষ্যে যা কিছু প্রয়োজন তা সবই তাঁর নিকট থেকে আসে।[৩]

বেবিলনের সূর্যদেবতা 'শামস' নামে পরিচিত। সুমেরু অঞ্চলে সূর্যকে বলা হয় 'উঁতু' (utu) অথবা 'বাব্‌বার' (Babbar)। বেবিলনের দক্ষিণে লাসরা এবং

---

১. L. R. Farnell : The cult of the Greek states (Oxford 1907) vol. iv. P. 136
২. J. G. Frazer : The worship of nature P. 502
৩. Do. P. 528

www.pathagar.com

উত্তরে সিপ্‌পর নামক স্থানদ্বয়ে সূর্যমন্দির রয়েছে। প্রাচীন বেবিলনীয়রা বিশ্বাস করতো যে সূর্যদেবতা প্রতি সন্ধ্যায় তাঁর স্ত্রী আই (Ai) দেবীর দর্শন লাভের জন্য রাতের স্বর্গে আশ্রয় লাভ করেন। এবং সারারাত সেখানে অবস্থানের পরে সকালবেলা পৃথিবীর পূর্ব দরজা দিয়ে আবার আবির্ভূত হন।[১]

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় খুমী এবং সিন্দুজদের বিশ্বাসের সাথে বেবিলনীয় এই বিশ্বাসের বেশ মিল রয়েছে। তাদের মতে সূর্যদেবতা ভগবানের রাতের স্বর্গে অবস্থান করেন এবং ভগবানের আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে নব বিক্রমে সকালবেলা উদ্ভাসিত হন।

❑ বেবিলনীয়রা বিশ্বাস করতেন যে, সূর্যদেবতা শামস এর অসংখ্য সন্তান-সন্ততি রয়েছে। তাঁর পুত্রদের মধ্যে কেত্তু ন্যায়ের দেবতা, মেশারু সত্যের দেবতা, শামুকান মাঠের দেবতা এবং কন্যা স্বপ্নের দেবী। তাছাড়া সূর্যদেবতার অন্যান্য সন্তানরা পাহাড়, পর্বত, নদীনালা, গাছ-বৃক্ষ, শস্য ইত্যাদির ওপর কর্তৃত্ব করেন বলেও তাদের ধারণা।

উল্লেখ্য, বেদে বর্ণিত সূর্যদেবতা শবর, জেন্দাবেস্তায় বর্ণিত সূর্যদেবতা হবারে এবং গ্রীকদের হেলিওস যেমন শ্বেত ঘোড়ায় চালিত রথে আকাশ পথে ভ্রমণ করেন তেমনি মিশরীয় সূর্যদেবতা 'রা' অথবা 'রি'ও আকাশ-পথে ভ্রমণ করেন; তবে শ্বেত ঘোড়া চালিত রথে নয়, জাহাজ বা নৌকায় চড়ে।

❑ প্রাচীন মিশরীয়দের কাছে সূর্যদেবতা 'রা' (Ra) বা 'রি' (Re) নামে খ্যাত। বেদে বর্ণিত 'সূর্য' গ্রিকদের 'হেলিওস' ল্যাটিন ভাষায় 'সোল' (Sol), বেবিলনীয়দের 'শামস্' এবং আসিরীয়দের 'রা' বা 'রি'র মর্যাদারই অনুরূপ।

প্রাচীন মিশরীয় পৌরাণিক গ্রন্থ 'দি বুক অব আম দুআট্ (The book of Am Duat) এবং 'দি বুক অব দি গেট্স' (The book of gates) ইত্যাদিতে উল্লেখিত রয়েছে যে সূর্য-দেবতা রা বা রি রাত্রে দু'আত (Duat) নামক অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। এই অঞ্চল মৃত মানুষের দেশ বলে কথিত। এই মৃত মানুষদের দেশের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে এক বিরাট নদী প্রবাহিত হয় এবং এই নদীপথেই রা বা রি এর জাহাজ বা নৌকা চলাফেরা করে।[২]

❑ প্রাচীন মিশরীয়দের ধারণায় সূর্য ছিলেন পুরুষ দেবতা, পরবর্তী সময়ে তারা তাকে দেবী হিসেবে ধারণা করতে থাকে এবং রা বা রি-এর পরিবর্তে তার নাম রাখে রাত বা রাততই বলে'।

প্রাচীন মিশরীয়রা কোনও কোনও রাজবংশকে সূর্য থেকে উদ্ভুত বলে বিশ্বাস পোষণ করত। উদাহরণ স্বরূপ অসিরিস ('Osiris') রাজবংশের কথা বলা যেতে

---

১. L. W King : Babylonian religian and Mythology (London 1908) vol ii P. 21

২. A. Wiedemann : Religion of the Ancient Egyptian (1808) P. 14,

www.pathagar.com

পারে। অবতার হিসাবে তিনি মানব কুলের ওপর প্রভুত্ব করেন বলে' তাদের মধ্যে বিশ্বাস প্রচলিত ছিল।

❑ প্রাচীন মিশরীয়দের অনেকের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে নান (Nun) নামক সমুদ্র থেকে সূর্য দেবতা উঠে আসেন। আবার অনেকে বিশ্বাস করতেন যে সূর্যদেবতা প্রাথমিক অবস্থায় শিশুরূপে পদ্মপাতায় অবস্থান করেন এবং সেখান থেকেই তার এই আবির্ভাব।

পাহাড় শীর্ষের কোনও ডিমের মধ্য থেকে সূর্য দেবতার আবির্ভাব ঘটে বলেও বিশ্বাস প্রচলিত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়।[১] তারা বিশ্বাস করতো যে প্রথম অবস্থায় এই ডিম ছিল সমুদ্রগর্ভে। সেখান থেকে উক্ত ডিম পাহাড় শীর্ষের এক বাসায় আশ্রয় লাভ করে। সেখানে উক্ত ডিমে তা' দেয়ার জন্য আটজন দৈত্যদানব, সাপ, ব্যাঙ এবং গাভীর আকার নিয়ে উপস্থিত ছিল।

সূর্যদেবতা ডিম ফেটে বের হওয়ার সাথে সাথে উক্ত গাভীর পৃষ্ঠে আরোহণ করেন এবং সেই গাভীই তাকে আকাশ পৃষ্ঠে স্থাপন করে।[২]

❑ সাঁওতালদের বিশ্বাস– সূর্য খুবই শক্তিশালী দেবতা। তবে তিনি কারো ক্ষতি করেন না। বরং অন্যান্য অপদেবতারা যাতে মানব-সমাজের ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য সূর্যদেবতা সর্বদা সতর্ক থাকেন। অবশ্য এই উদ্দেশ্যে সূর্য দেবতাকে উৎসর্গ ও প্রার্থনার মাধ্যমে পূজা করতে হয় বলে তারা দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করে।

❑ ওরাওঁ সমাজ সূর্যদেবতার পূজারী; সাঁওতালদের মতো ওরাওঁসমাজও উৎসর্গ ও প্রার্থনার মাধ্যমে সূর্যদেবতার পূজা করে। ওরাওঁদের প্রধান দেবতার নাম 'ধরমেশ' বা 'ধরমী'। ভয়, ব্যর্থতা, গ্লানি, পাপ ইত্যাদি থেকে নিস্কৃতি লাভের আশায় শ্বেতমোরগ উৎসর্গ করে তারা ধরমেশের পূজা করে এবং প্রার্থনা জানায়– হে ধরমেশ! তুমি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, তুমি আমাদের প্রতিপালক, আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হও।

'সহ্রুল উৎসব' উপলক্ষ্যে ওরাওঁরা সূর্যদেবতার বিবাহ দেয়। ওরাওঁ ভাষায় সহরুলকে বলা হয়– 'খাদদি বা খেকেল বেঞ্জা', বাংলায় যার অর্থ– 'পৃথিবীর বিবাহ'। সন্তান লাভ বা জমিকে উর্বরাশক্তির অধিকারী করার আশায় ওরাওঁ সম্প্রদায় এই উৎসব পালন করে। সাঁওতালদের 'করম উৎসব' এবং ওরাওঁদের 'সহরুল উৎসব'-এর উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।[৩]

---

১. A. Erman; Die Agyptische Religion. P. 32 Quotted in J. G. Frezer. The worship of nature 1 P 590

২. E. A walis Budge. The gods of the Egyptian p. 522

৩. H H Risely : Tribes and casts of Bengal ii. P. 232

www.pathagar.com

❑ ভারতের বৈগা, গড়, বৈনা, ভূমিজ, করব, কোল, হো, মুরিয়া, কোরকু, শবর, ভূঁইঞা, জোয়াং, খাড়িয়া, করওয়া, মালে, বিরহোর, মাল পাহাড়িয়া, আওনাগা, রেংগমানাগা, রেমানাগা, আবর, মিশমী, গাদাবা, মিরি, দিমাসা, প্রভৃতি আদিম সমাজ সূর্যকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে।

❑ গড় ও বেগাদের দেবতা-নারায়ণ; গাদাবা ও করবদের ভগবান; কোল, মুণ্ডাদের– সিংবোংগা; ভূঁইঞাদের দেবতা – বোরাম অথবা ধরম; খাড়িয়াদের– বেরো বা গিরিং দেবো; মালেদের– ধরমের গোঁসাই। এরা সকলেই সূর্যের প্রতীক। বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন পদ্ধতিতে সূর্য এই প্রতীকের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের লোকদের পূজা, উৎসর্গ ও উপচারাদি পেয়ে থাকে।

❑ সাঁওতালদের প্রধান দেবতা বা সৃষ্টিকর্তা ঠাকুরজিওকেও কেউ কেউ সূর্যদেবতা বলে মনে করে এবং অন্ততঃপক্ষে পাঁচ কিংবা দশ বছর পর ছাগল উৎসর্গের মাধ্যমে তার পূজা করতে হয়; অন্যথায় তিনি ভীষণ রাগান্বিত হন বলে দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করে।[১]

❑ পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের সেন্দুজ, খুমী, খাসিয়া প্রভৃতি আদিম সমাজের মানুষেরা সরাসরি চন্দ্রসূর্যের পূজা না করলেও চন্দ্র-সূর্যকে তারা অতীব শ্রদ্ধার চোখে দেখে। খাসিয়া সমাজ অন্যায়ের বিরুদ্ধে শপথগ্রহণের সময় চন্দ্র-সূর্যকে সাক্ষী মানে এবং সেন্দুজ ও খুমীরা মনে করে যে সূর্যদেব রাত্রে পত্যেন (শ্রেষ্ঠ দেবতা) এর বাড়িতে আশ্রয় নেয় এবং তাঁর সাহায্যপুষ্ঠ হয়ে পূর্ণশক্তিতে পূর্বদিকে উদিত হয়, তাদের বিশ্বাস পত্যেন পশ্চিম দিকে বাস করেন।

প্রিয় পাঠকগণ! এবারে আসুন সূর্যপূজার এই মহাসমারোহ থেকে আমাদের দৃষ্টি প্যাগানিজমের অপরিহার্য অন্যতম অঙ্গ 'মৃত মানুষের পূজা'র প্রতি নিবদ্ধ করি।

মৃত মানুষের পূজা

প্যাগানিজম বা ধর্মীয় চিন্তাধারায় মৃত মানুষ বলতে বিশেষভাবে নিজেদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন, প্রখ্যাত ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা এবং বিশেষ বিশেষ কাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন এবং মৃত্যুবরণ করেছেন এমন মানুষদের বুঝাচ্ছে।

বলাবাহুল্য, মৃত ব্যক্তির পারলৌকিক মঙ্গল, শ্রদ্ধা-ভালবাসা প্রদর্শন এবং ভয়-ভীতি নিরসনের চিন্তাধারা থেকেই এই পূজার উদ্ভব ঘটেছে। উদ্দেশ্য প্রায় অভিন্ন হলেও সমাজ, গোত্র এবং দেশভেদে এই পূজার নিয়ম পদ্ধতির মধ্যে

---

১. প্রসিদ্ধ লেখক ও সংগ্রাহক জনাব আবদুস সত্তারের আরণ্য সংস্কৃতির ৩৩ পৃঃ (উল্লেখ্য যে এই তথ্যের অধিকাংশই উক্ত গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে– লেখক)

www.pathagar.com

কিছু না কিছু তারতম্য লক্ষ্যিত হয়। অতঃপর ভিন্ন ভিন্ন সমাজ ও গোত্রের মধ্যে প্রচলিত এ সম্পর্কীয় বিশ্বাস এবং আচারানুষ্ঠানাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে পৃথক পৃথকভাবে তুলে ধরা যাচ্ছে—

❑ বাংলাদেশের লুসাই, কুকি, সেন্দুজ, পাঙ্কো, বনজোগী, খুমী প্রভৃতিরা মৃত ব্যক্তিকে কবর দিয়ে থাকে। কবরস্থ করার সময় মৃত ব্যক্তি জীবিত থাকাকালীন যেসব জিনিস সচরাচর ব্যবহার করতো সেগুলো, তার পরিধেয় বস্ত্র এবং কিছু খাদ্যদ্রব্য কবরে তার মৃত দেহের পার্শ্বে রাখা হয়। কারণ তারা বিশ্বাস করে যে, মৃত ব্যক্তির আত্মা পূর্বের মতই থাকবে এবং স্বর্গরাজ্যে তার বিচরণ হবে ঠিক এই পৃথিবীর মানুষেরই মত।

ওপরোক্ত সম্প্রদায়ের মানুষেরা মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে জন্তু-জানোয়ার উৎসর্গ করে। কারণ তাদের বিশ্বাস যে এই উৎসর্গকৃত জন্তু-জানোয়ারদের আত্মাবস্তু পরকালে মৃতব্যক্তিদের আত্মাবস্তুকে সাহায্য করবে।

❑ মুরং ও খুমী সম্প্রদায়ের কোনও ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হলে তার সন্তান-সন্ততিরা সঙ্গে সঙ্গে একটি কুকুর হত্যা করে। কারণ তাদের বিশ্বাস জীবিত অবস্থার মত মৃত অবস্থায়ও কুকুরটি মৃত ব্যক্তিকে সাহায্য করবে।

❑ খাসিয়া সম্প্রদায়ের মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে যেসব বস্তু উৎসর্গ করা হয় তন্মধ্যে পান সুপারী প্রধান। খাসিয়া লাংদুহ অর্থাৎ ধর্মযাজকেরা এই উপলক্ষ্যে যেসব মন্ত্র পাঠ করেন তার মধ্যে একটি মন্ত্র হল– কুবলাই খী লীত বাম করাই স ই ইং উব্রি হো, অর্থাৎ– "বিদায়, বিদায়, চলে যাও এবং ভগবানের স্বর্গরাজ্যে গিয়ে পান সুপারী খাও।"

❑ খাসিয়াদের এই রীতির সাথে আফ্রিকার বানতু সম্প্রদায়ের বেশ মিল রয়েছে। বানতু সম্প্রদায়ের মানুষেরা মৃত ব্যক্তির দেহে চামড়া এবং কম্বল পেঁচিয়ে তাকে কবরস্থ করে এবং তার কবরে অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে দুধ, তামাক প্রভৃতি রেখে দেয়। তৎপর ধর্মযাজক যে মন্ত্র পাঠ করেন তার অংশ বিশেষের ইংরেজি অনুবাদ হলো–

"Good-bye, good-bye! do not forgot us. See, we have given you tobacco to smoke and food to eat! A good journey to you! Tell old friends who died before you that you left us living well."[১]

❑ মেলানেশীয় 'মানুষ' সম্প্রদায় কোনও ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলে তার মাথার খুলি ঘরে ঝুলিয়ে রাখে। এমন অবস্থায় যদি কারো অপমৃত্যু ঘটে তবে ধরে'

১. E. W. Smith : The religion of lower race as illustrated by the African Bantu. (1923) P. 29.

www.pathagar.com

নেয়া হয় যে পূর্ববর্তী মৃত ব্যক্তির আত্মাবস্তু কোনও ক্রিয়া করছেনা। তখন নতুন মৃত ব্যক্তির মাথা সেখানে ঝুলিয়ে রাখা হয় এবং পূর্ববর্তী মাথার খুলিটি ফেলে দেয়া হয়।[১]

❑ উত্তর আমেরিকার নাভাহোস (Navahos) এবং এস্কিমো (Eskimo) আদিম সমাজের মানুষেরা বিশ্বাস করে যে, মৃত ব্যক্তিরা মৃত্যুর পর 'ভূত' হয় এবং নানারূপ উপদ্রব করতে থাকে। এই উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোনও ব্যক্তি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্বেই তাকে দ্রুততার সাথে ঘর থেকে বের করে আনে— যাতে ঘরের মধ্যে তার মৃত্যু না ঘটে। কেননা ঘরের মধ্যে মৃত্যু ঘটলে তার আত্মাবস্তু সেখানে আবদ্ধ হয়ে পড়বে এবং উৎপাত করতে থাকবে। কোনও ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার আত্মাবস্তু যাতে বাড়ি চিনে আসতে না পারে সেজন্য সেই বাড়ির চেহারা পালটিয়ে দেয়ার রীতিও প্রচলিত রয়েছে।

❑ এতদ্দেশীয় হিন্দুসম্প্রদায়ও মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা পোষণ করেন। সেই কারণে মুমূর্ষু ব্যক্তিকে ক্ষীপ্রতার সাথে তাঁরা তুলসিতলায় বা পূজামন্দিরের অঙ্গনে নিয়ে যান, তাঁর কানের কাছে 'ইষ্টমন্ত্র' উচ্চারণ করেন। পরে যদি সেই ব্যক্তির মৃত্যু সংঘটিত না হয় তবে তাকে আর সমাজে স্থান দেয়া হয় না; মনে করা হয় যে, সে ব্যক্তি আসলে মৃত্যুবরণ করে ভূতগ্রস্থ হয়েছে অথবা প্রেতত্ব লাভ করেছে।

❑ পাপগ্রস্থ ব্যক্তি মৃত্যুর পরে কোনও পাপের কারণে পশু, পাখি, কীট, পতঙ্গ, ভূত, প্রেত ইত্যাদির কোনটা হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং তার পক্ষ থেকে কোন ধরনের শ্রাদ্ধ বা প্রায়শ্চিত্ত্ব করলে সে মুক্তি পেতে পারে তার সবিস্তার বর্ণনা ধর্মগ্রন্থাদিতে রয়েছে। মনুসংহিতা ও অগ্নিপূরাণ থেকে নমুনা স্বরূপ বঙ্গানুবাদসহ দুটি করে শ্লোক উদ্ধৃত করা যাচ্ছে।

বৃকো মৃগেভং ব্যাঘ্রোহশ্বং ফল মুলন্ত মর্কট ঃ
শ্রীমৃক্ষ স্তোককো বারি যানানুৎ ষ্ট্রঃ পশূনজ ঃ

অর্থাৎ : মৃত অথবা হস্তী অপহরণে মৃত্যুর পর বৃক (নেকড়ে বাঘ) নামক হিংস্র পশু হয়, ঘোটক চুরিতে ব্যাঘ্র হয়, ফলমূল হরণে মর্কট হয়; স্ত্রী চুরিতে ভল্লুক হয়, পানার্থ উদক হরণে চাতক হয়, শকট প্রভৃতি যান হরণে উষ্ট্র হয়, এতদ্ব্যাতিরিক্ত পশুহরণে ছাগ হয়। – মনুসংহিতা ১২ অঃ ৬৭ শ্লোক

বান্তাশ্যুল্কা মুখঃ প্রেতো বিপ্রো ধর্ম্মাৎ স্বকাচ্চ্যুতঃ
অমেধ্য কুণ-পাশী চ ক্ষত্রিয়ঃ কটপুতনঃ ॥

---

১. Margaret Mead : The Manus of the Admiralty Islands in co-operation and competition among primitive peoples p. 210-239.

www.pathagar.com

অর্থাৎ : স্বকর্ম্ম ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ ছর্দ্দিত ভক্ষক জ্বালামুখ প্রেত অর্থাৎ আলেয়া হয়, ক্ষত্রিয় ঐরূপ হলে শব ও বিষ্ঠাভক্ষক কটপুতন নামক প্রেতবিশেষ হয়। ঐ ৭১ শ্লোক

যে চ প্রব্রজিতাঃ পত্ন্যাং যা চৈষাৎ বীজ সন্তুতিঃ
বিদুরা নাম চণ্ডালা জায়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ।
পূর্বে বর্ষ সহস্রে তু জায়তে ব্রহ্ম রাক্ষসঃ।
প্লবেন লগতে মোক্ষং কুলস্যোৎ সাদনেনবা ॥

অর্থাৎ : যারা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে পত্নীতে বীর্য্য নিষিক্ত করে তারা ও তাদের সন্তানসন্ততিরা বিদুর নামক চণ্ডাল হয়ে জন্মে তাতে সংশয় নেই। এবং জন্মের পর তাকে গৃধ্র হতে হয়। গৃধ্র হবার পর দ্বাদশ বছর কুক্কুর, তারপরে বিংশতি বর্ষ ভাস, পরে দশ বর্ষ শূকর, অনন্তর ফলপুষ্টহীন কণ্টকাবৃত বৃক্ষ হয়ে দাবানলে দগ্ধ হবার পর স্থানুরূপে বহুবর্ষ অবস্থানক্রমে সহস্র বর্ষ পূর্ণ হলে ব্রহ্মরাক্ষস হয়ে জন্ম হয়। তারপর অতি মোক্ষ লাভ।

— অগ্নিপুরাল ১৬৫ অঃ ২৩-২৮ শ্লোক ৩৩৪ পৃঃ

মৃতাহনি চ কর্তব্যং প্রতি মাসন্তু বৎসরম্।

....

তথা বর্ষ ত্রয়োদশ্যাৎ মঘাসু চ ন সংশয়ঃ ॥

অর্থাৎ : যে বছর মৃত্যু হবে সেই বছর মৃতাহে মাসে শ্রাদ্ধ করবে। পরে মাসিকান্নের ন্যায় বৎসরান্তে মৃত তিথিতে শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য। হবিষ্যান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ করলে একমাস কাল, পায়স দ্বারা এক বছর, মৎস্য দ্বারা দুই মাস, হরিণ মাংস দ্বারা তিন মাস, উরভ্র মাংস দ্বারা চারমাস, শকুন মাংস দ্বারা পাঁচ মাস, মৃগ মাংস দ্বারা ছয় মাস, এণ মাংস দ্বারা সাতমাস, রৌরব মাংস দ্বারা আট মাস, বরাহ মাংস দ্বারা নয় মাস, এবং শশক মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করলে দশ মাস পিতৃলোক তৃপ্তিলাভ করে থাকেন।

যে ব্যক্তি গয়াস্থ হয়ে গণ্ডার মাংস, মহাশল্ক, মধুযুক্ত অন্ন, লোহামিষ, কালশাক এবং বাধ্রীনস মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করে সে অনন্ত ফল লাভ করে থাকে। বর্ষ ত্রয়োদশীতে এবং মঘাতে শ্রাদ্ধ করলে কন্যা, প্রজা, বন্দী, দ্বিশফ এবং একশফ পশু, ব্রহ্মবর্চ্চস্বী পুত্র, মুখ্য পুত্র, ঘৃত, কৃষি, বাণিজ্য, স্বর্ণ, রৌপ্য, রত্ন, জ্ঞাতি শ্রেষ্ঠতাদি সকল কামনাই লাভ হয়।[১]

❑ ময়মনসিংহ জিলার বাটাজোর অঞ্চলের গারোদের বিশ্বাস— নিজ পরিবারভুক্ত এমনকি নিজ গ্রামবাসীর কেউ যদি অন্য গ্রামে দুপুর রাতে সেই ভিন্ন

---

১. অগ্নিপুরাণ ১৬৩ অঃ ৩০-৩৪ শ্লোক

www.pathagar.com

গ্রামের মৃত ব্যক্তির আত্মাবস্তুর অপদেবতা কর্তৃক আক্রান্ত হয় তবে নিজ পরিবারভুক্ত কিংবা নিজ গ্রামের কোনও মৃতব্যক্তির আত্মাবস্তু অপদেবতা থেকে সাহায্য করে নিজের বাড়িতে পৌঁছে দেয়।

❑ মেলানেশীয় মানুষ (Manus) সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই একইরূপ বিশ্বাস বিদ্যমান থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাদের বিশ্বাস মৃত ব্যক্তির আত্মাবস্তু অপদেবতায় রূপ লাভ করলেও নিজ পরিবারভুক্ত লোকদের কোনও ক্ষতি করে না, বরঞ্চ তারা অন্য পরিবারের মৃত ব্যক্তির আত্মার অপদেবতা যদি কোনও ক্ষতি করতে আসে তবে তাদের মোকাবিলা করে।[১]

❑ আফ্রিকার ডাহোমী (Dahomy), শোশোন (Shoshone) এবং কমানচে (Comanche) সম্প্রদায় মৃত স্বামীর সঙ্গে তাদের সহধর্মিনীদেরও জীবন্ত কবরস্থ করতো। বর্তমানে এই রীতি বন্ধ করা হয়েছে। তবে মৃতস্বামীর মৃত্যুর পর যদি তার স্ত্রী জীবিত থাকে তবে তার শরীরের কিছু অংশ কেটে স্বামীর আত্মার উদ্দেশে উৎসর্গ করতে হয়।[২]

❑ ভারতবর্ষে প্রচলিত সতীদাহপ্রথার কথা প্রায় সকলেরই জানা রয়েছে। যা লর্ড বেন্টিঙ্কের প্রচেষ্টায় রহিত হয়ে যায়।

❑ এক সময়ে ব্রহ্মদেশের শান আদিম সমাজে কোনও রাজার মৃত্যু ঘটলে তাঁর আত্মার কল্যাণ কামনায় দশটি হাতি, একশত ঘোড়া, একশত জন পুরুষ, একশত জন নারী এবং অজস্র মোরগ মুরগি হত্যা করে তার সঙ্গে দেয়া হতো। ব্রহ্ম সম্রাট বায়িনৌং (১৫৫১—১০৮১ পৃঃ) এই প্রথা রহিত করেন।

খাসিয়াদের মত লুসাই, কুকি, মুরং, সেন্দুজ, পাঙ্খো, বনজোগী, গারো, খুমী প্রভৃতিরা বিশ্বাস করে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা 'পাখিয়ান' ছাড়াও 'হোয়াই' নামে এমন এক অপদেবতার অস্তিত্ব বর্তমান যে তাদের সমাজে রোগ, জরা, দুঃখ-দারিদ্র্য এবং সকলপ্রকারের অমঙ্গলের সূচনা করে।

হোয়াই দুই প্রকারের। তুই হোয়াই এবং রাম হোয়াই! তুই হোয়াই-এর বিচরণ-ক্ষেত্র জলজ অঞ্চল; যেমন নদী, সমুদ্র, ঝর্ণা, ঝিল ইত্যাদি। আর রাম হোয়াই-এর আবাসভূমি স্থল-কেন্দ্রিক। পাহাড় পর্বত, গাছ-বৃক্ষ, মাঠ ক্ষেত-খামার প্রভৃতি।

প্রার্থনা ও উৎসর্গের মাধ্যমে হোয়াইকে সন্তুষ্ট রাখতে না পারলে নানা বিপদ অবশ্যম্ভাবী। তারা এ বিশ্বাসও পোষণ করে যে, রাম হোয়াই-এর জোর-জবরদস্তিমূলক সঙ্গমের ফলেই মেয়েদের ঋতুস্রাব হয়ে থাকে।

---

১. জনাব আবদুস সাত্তার লিখিত আরণ্য সংস্কৃতি ২৪-২৭ পৃঃ

২. E. A. Hoebal; Man in the Primitive world, (New york 1958) 549

www.pathagar.com

❑ বাংলাদেশের অন্যান্য আদিম সমাজের মতো লুসাই কুকিরাও বিশ্বাস পোষণ করে যে, মৃত্যুর পর তাদের আত্মাবস্তু আশেপাশেই ঘোরাফেরা করে এবং একমাত্র 'থাংছু আ' পূজার মাধ্যমেই তাদের সন্তুষ্ট রাখা যেতে পারে। তারা এ বিশ্বাসও পোষণ করে যে, মৃত্যুর পরে সব আত্মা 'মিখি খু আ' নামক স্থানে মিলিত হয়।

'মিখি খু আ' মৃত ব্যক্তিদের গ্রাম। এখানে মিলিত হওয়ার পরে পাপ পুণ্যানুযায়ী আত্মারা আবার মনুষ্য সমাজে ফিরে যায়। অসৎ ব্যক্তিদের আত্মা তুই হোয়াই এবং সৎ ব্যক্তিদের আত্মা রাম হোয়াইরূপে বিচরণ করে। এবং সৎ লোকদের আত্মা 'পিয়ালরাল' নামক শান্তিময় স্বর্গরাজ্যে অবস্থান করে। অর্থাৎ লোকদের আত্মা যাতে হোয়াই-এর রূপ লাভ করতে না পারে এজন্যই 'থাংছুআ' পূজার আয়োজন করা হয়।

❑ ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জিলার গারোদের বিশ্বাস— মৃত্যুর পর সব আত্মা 'মংগ্রো সংগ্রাম' নামক স্থানে আশ্রয় লাভ করে। আত্মা একস্থানে অবস্থান করে না এবং 'নোপাক' নামক স্থান প্রদক্ষিণ করে এবং অবশেষে 'মিসাং মিসাল চারাম' নামক স্থানে এসে বিশ্রাম নেয় ইত্যাদি।

❑ সাঁওতালদের মৃতদেহ দাহ করার পর তার হাড় (সাঁওতালী ভাষায় 'জানবহা') কুড়িয়ে এনে যখন নদীতে নিক্ষেপ করা হয় তখন আত্মাবস্তু দিসমে চলে যায়। মৃত ব্যক্তি পুণ্যের অধিকারী হলে সে যায় 'সেরমা দিসমে' এবং পাপী হলে নিক্ষিপ্ত হয়— নরকে। নরকবাসী আত্মারাই পরবর্তী সময়ে জন্তু-জানোয়ার এবং পশু-পাখিরূপে জন্মগ্রহণ করে বলে তাদের গভীর বিশ্বাস রয়েছে।

❑ পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ভাদ্যা পূজার অন্ত-রালেও রয়েছে আত্মাবস্তুর রূপান্তর সম্পর্কীয় বিশ্বাস। 'ভাদ্যাপূজা' অর্থে বোঝায় 'ভাত দিয়ে যে পূজা করা হয়' বা ভাতদেয়ার পূজা।

থালায় ভাত, তরকারি, মিষ্টি প্রভৃতি সাজিয়ে জঙ্গলের মধ্যে প্রস্তুত-কৃত্রিম শ্মশানে তা স্থাপন করা হয়। রড়ি বা ভিক্ষু মন্ত্র পাঠ করে মৃত ব্যক্তির আত্মাকে তা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাতে থাকেন। সে সময়ে সেই থালায় কোনও পোকা মাকড় এসে বসলে তারা মনে করেন যে তা মৃত ব্যক্তিরই আত্মা— পোকা মাকড় হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে।

❑ সাঁওতালদের মতো এতদ্দেশীয় হিন্দুসম্প্রদায়ও মৃতদেহকে পোড়ানোর সময়ে এক পর্যায়ে তার কপালের অস্থিটি মস্তক থেকে পৃথক করে সযত্নে রেখে দেয়। পরে তা বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গঙ্গায় নিক্ষেপ করা হয়। মনে করা হয় যে, এরদ্বারা মৃতব্যক্তি স্বর্গে গমণ করবে।

www.pathagar.com

অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা গয়ায় গিয়ে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে পিণ্ড (দলা পাকানো ভাত) উৎসর্গ করেন এবং কপালের অস্থিটি তত্রত্য নদীতে নিক্ষেপ করেন।

কপালের অস্থিটির কিছু অংশ চূর্ণ করে মধুপর্কের সাথে মিশ্রিত করা এবং গুরুদেব ও গুরু-পত্নি কর্তৃক ভক্ষিত হওয়াকে জীবিতদের জন্য মহা পুণ্যজনক এবং মৃতব্যক্তির জন্য বিশেষভাবে তৃপ্তিদায়ক হয়ে থাকে বলে বিশ্বাস করা হয়। অস্থিচূর্ণ করা এবং মধুপর্কের সাথে মিশ্রিত করার নিয়মপদ্ধতি স্কন্দপুরাণ ও অন্যান্য কতিপয় ধর্মগ্রন্থে বিস্তারিতভাবে লিখিত রয়েছে।

❑ এই তো গেল প্যাগানিজমের কথা। এসম্পর্কে বিরাট এক গ্রন্থ লিখেও সবকথা তুলে ধরা সম্ভব হবে না। এরপরে প্যাগানিজম এবং তার আধুনিককালের ধারক এবং বাহকদের কথা ছেড়ে আমরা যদি আধুনিক সভ্য জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তা হলেও আমাদের নিদারুণভাবে হতাশই হতে হবে।

কেননা যাঁরা নিজদের প্যাগানিজমের ঘোরবিরোধী এবং আধুনিক কালের সভ্য সংস্কৃত বলে জোর গলায় দাবি করেন– দেখা যাবে যে তাঁদের মধ্যেও নরপূজা শুধু বহাল তবিয়তেই নয় বরং ক্রমবর্ধনশীল ও প্রচণ্ড শক্তিশালী অবস্থায় বিদ্যমান।

উদাহরণস্বরূপ মৃত ব্যক্তির কবর, সমাধি-স্থান, ছবি, স্মৃতিস্তম্ভ, প্রতিকৃতি প্রভৃতিতে মাল্য ও পুষ্পার্ঘ্য প্রদানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। একে নরপূজা বা মৃত মানুষের পূজা বলে আখ্যায়িত করতে দেখে কেউ কেউ বা অনেকেই বিশেষভাবে রুষ্ট হতে পারেন এবং তা যে মৃত ব্যক্তির প্রতি নিছক শ্রদ্ধা ও সম্মানপ্রদর্শনের জন্যই করা হয়ে থাকে তেমন দাবিও দৃঢ়তার সাথে উত্থাপন করতে পারেন। কিন্তু একটু ধীরস্থিরভাবে চিন্তা করলে ওটা যে মৃত মানুষের পূজা ছাড়া অন্য কিছু নয় সেকথা তাঁরা নিজেরাও বুঝতে পারবেন বলে আশা করি।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসা প্রদর্শন বা তার পারলৌকিক কল্যাণের জন্য দান-খয়রাত ও স্রষ্টা বা আল্লাহর উদ্দেশে পুজা-প্রার্থনা করা এক কথা আর ধুমধামসহকারে তার কবর বা শ্মশানে মাল্য ও পুষ্পার্ঘ্য প্রদান অন্য কথা।

ভাল করে খোঁজখবর নিলে দেখা যাবে যে, পৃথিবীতে নর পূজার উদ্ভব ঘটার মূলেও এই একই মানসিকতা বিদ্যমান ছিল। মৃত ব্যক্তিকে শ্রদ্ধাসম্মান প্রদর্শনের প্রকৃষ্ট উপায় যে যথাযোগ্য নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে তার আরব্ধ কাজকে সুসম্পন্ন করা বা তাঁর আদর্শকে সমুন্নত রাখা কোনও জ্ঞানী ব্যক্তিই সেকথা অস্বীকার করতে পারবেন না। আর একথাও অস্বীকার করতে পারবেন না যে

www.pathagar.com

আনুষ্ঠানিকভাবে মালা এবং পুষ্পার্ঘ্য প্রদান দ্বারা না মৃত ব্যক্তির কোনও কল্যাণ সাধিত হয় আর না তা সমাজের কোনও উপকারে লাগে। দুঃখের বিষয় তবু এটা চলছে এবং হয়তো চলতে থাকবেও। কেননা এর মূলেও রয়েছে অজ্ঞতার অন্ধকার এবং অন্ধবিশ্বাসের হাতছানি।

এখানেই এই প্রসঙ্গের ইতি টানতে পারলে ভাল হতো। সুধী পাঠকবৃন্দও এই নিরস ও একঘেঁয়ে আলোচনা থেকে হাঁফছেড়ে বাঁচতেন। কিন্তু আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে বলে একান্ত অনিচ্ছাস্বত্ত্বেও বাধ্য হয়ে এ সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য তুলে ধরতে হচ্ছে।

যে কথার শেষ নেই

পৃথিবীতে কবে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে সেকথা আমরা জানি না। এ-নিয়েও নানা মুনির নানা মত। তবে এটা যে বহু হাজার বছর পূর্বের ঘটনা তা নিয়ে দ্বিমতের কোনও অবকাশ নেই।

আজও যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্যাগানিজম স্বরূপে বা আধুনিকতার পোশাক-পরিচ্ছদে বহাল রয়েছে শুধু ওপরের আলোচনা থেকেই নয় আমাদের চোখের সম্মুখেই তার অসংখ্য বাস্তব প্রমাণ বিদ্যমান। এই হাজার হাজার বছর ধরে প্রায় গোটা পৃথিবীর অসংখ্য অগণিত মানবগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান প্যাগানিজম যে কতভাবে, কতপ্রকারে এবং কত ভাষা, কত অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বন, রীতিনীতি, আচার-আচরণ, কবিতা-ছন্দ, কথা-কাহিনী, রূপকথা-উপকথা, মহাজন-বাক্য, আপ্তবাক্য প্রভৃতির মাধ্যমে বিকাশ লাভ করেছে তার কোনও সীমা নেই— শেষ নেই।

ওপরে যে নমুনা তুলে ধরা হয়েছে তা সমুদ্রে বারিবিন্দু তুল্য। লাভ-ক্ষতি যা-ই হোক একান্তরূপে সীমাবদ্ধ কল্পনাশক্তি এবং সুযোগ সুবিধার নিতান্ত অভাব সত্ত্বেও এইসব উদ্ভাবনের জন্য মানুষের যে সংগ্রাম ও সাধনা তাকে খাটো করে দেখার কোনও অবকাশ নেই। মানবীয় কল্পনাশক্তি এবং চিন্তাধারার সুস্পষ্ট পরিচয় এসবের মধ্যে বিধৃত হয়ে রয়েছে। আত্মপরিচয় লাভের জন্য অতীতের এই ইতিহাসকে জানা যে কত বেশি প্রয়োজন জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছে সেকথা খুলে বলার প্রয়োজন হয় না। তাই এ সম্পর্কীয় আরও কিছু তথ্য নিম্নে পৃথক পৃথকভাবে তুলে ধরা হলো।

❑ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সেই আদিম সমাজের মানুষেরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জন্ম, মৃত্যু, জরা, রোগ, শোক, দুঃখ, যাতনা প্রভৃতির পশ্চাতে এক একটি অশরীরি শক্তির বিদ্যমানতায় এবং উক্ত শক্তিসমূহের ক্রোধ বা সন্তুষ্টির উপরেই মানুষের ভাল বা মন্দ নির্ভরশীল বলে বিশ্বাস পোষণ করতো।

www.pathagar.com

তাছাড়া বৃক্ষ, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, পশু-পাখি প্রভৃতি এক কথায় সৃষ্টির যা কিছুকে তারা নিজেদের জন্য উপকারী, অপকারী, ভীতিজনক, সুন্দর, বা বিস্ময়কর বলে অনুভব করেছে তাকেই উপাস্যের আসনে বসিয়েছে।

সুদূর অতীতে এই উপাস্যদের মোটসংখ্যা কত ছিল তা জানার উপায় নেই। কিন্তু অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগ থেকে অদ্যাপি হিন্দুসমাজ এদের সর্বমোট সংখ্যা তেত্রিশ কোটি বলে বিশ্বাস পোষণ করে আসছে।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের এফুগাউস (yfugaos) আদিম সমাজের দেবদেবীর সংখ্যা ১২৪০ জন বলে জানা গিয়েছে।[১] বলাবাহুল্য, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন আদিম সমাজও এই রূপ বহুসংখ্যক উপাস্যের অস্তিত্বে বিশ্বাসী।

❑ পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি আদিম সমাজের মানুষই সূর্যের মতো চন্দ্রকেও এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দেবতা হিসেবে মেনে আসছে।

চন্দ্র কোথাও দেব এবং কোথাও দেবী বলে বিবেচিত। কিন্তু হিন্দুসমাজ সূর্য এবং চন্দ্র উভয়কেই পুরুষ বলে বিশ্বাস পোষণ করেন। ঋকবেদ এবং মৎস্যপুরাণের বর্ণনানুযায়ী চন্দ্র অত্রি ঋষির পুত্র। চন্দ্রের মাতার নাম অনুসূয়া।

❑ এতদ্দেশের টিপরা, হাজং, রাজবংশী, হদি, দালুই, মুরিয়া, হো, মুণ্ডা প্রভৃতি উপজাতীয় মানুষেরা সকলেই চন্দ্রকে এক বিশিষ্ট দেবতা বলে বিশ্বাস পোষণ এবং তদনুযায়ী তার পূজা অর্চনাও করে থাকে।

❑ আসামের খাসিয়া, দফলা, লাখের, আওনাগা, রেংগমানাগা, আংগামীনাগা, সেমা নাগা প্রভৃতি উপজাতীয়দিগের কাছেও চন্দ্র দেবতা বলে স্বীকৃত। অপরপক্ষে এই একই অঞ্চলের আবরমিরি ও মিশমীদের বিশ্বাসানুযায়ী চন্দ্র দেবতা নয়— দেবী।

❑ —সাঁওতাল এবং ওরাওঁদের মতে চন্দ্র দেবী এবং তার স্বামী হলো সূর্য।

❑ ভারতের বিরহোর নামক আদিম সমাজের মানুষেরা চন্দ্রকে দেবী মনে করে এবং তাদের বিবেচনায় চন্দ্র সূর্যদেবতার ভগ্নি।

❑ অনুরূপভাবে পৃথিবীর অন্যান্য আদিম সমাজের কাছেও কোথাও তিনি দেবতা আবার কোথাও তিনি দেবী বলে স্বীকৃত।

❑ ব্রিটিশ কলাম্বিয়া, নিউগিনি, মেক্সিকো, ব্রাজিল, জাপান, চীন প্রভৃতি স্থানে বসবাসকারী আদিম সমাজে চন্দ্র 'জলদেবী' বলে পরিচিত; কেননা, তিনি পৃথিবীর জলরাশি এবং বৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করেন।

---

১. R. F. Barton : The religion of the Ifugaos (American Anthropological Association Memoir 65, 1946) p. 39

www.pathagar.com

❑ মেক্সিকোর আদিম সমাজে সর্পদেবী ও জলদেবীরূপিনী চন্দ্রের মধ্যে কোনও তফাৎ নেই। তারা মনে করে যে সর্প, চন্দ্র এবং নারী পরস্পর ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

❑ আদিম সমাজের মানুষদের দৃষ্টিতে বৃষ্টির সাথে চন্দ্র, সর্প এবং ব্যাঙ-এর সম্পর্ক যে কত বেশি তার কিছুটা বর্ণনা ব্রিফল্টের (Briftault) মন্তব্য থেকে জানতে পারা যায়। তিনি The Mothers (1959) P. 303 এ তাঁর এ সম্পর্কীয় অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন–

Frogs who croak to the moon never fail to obtain rain from him. In the Ganges valiaye, the women, when there is a draught, slowly crush a frog to death, and its croaking is belived to be an infalliable raincharm. The frog, often interchangable in myth with the toad and with the dragon, is a universal emblem of water and the moon. Among the pueblos, the frog clans are the rain making clans, and the great goddess of Mexico, who is the moon and the rullers of the waters, was represented by a huge emerald frog.

The North American Indians see the moon the 'Primeval toad' which contained all the waters of the world and caused the flood by discharging them. Many races e. g; the Chines, see a frog in the moon. The toad is also regarded as an emblem of the womb, and in Germany women suffering from uterine troubles present imagse to toads to the Virgin Mary.[১]

❑ স্বাভাবিকরূপেই চাঁদের মোহিনী ছটায় সেদিনের আদি মানুষেরা মুগ্ধ বিমোহিত হয়ে উঠেছিল। তাই চাঁদকে কেন্দ্র করে জল্পনা-কল্পনা আর কথা-কাহিনী রচনার কোনও ত্রুটি তারা করেনি। বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে তাদের এই জল্পনা-কল্পনার ফল অর্থাৎ নানাধরনের অদ্ভুত ও অলৌকিক কথা-কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে। এবং ওসব সত্য, অভ্রান্ত এবং স্বর্গীয় আপ্তবাক্য বলে গভীরভাবে বিশ্বাস পোষণ করেন আজও পৃথিবীতে এমন বহু মানুষই রয়েছেন। অতএব এ নিয়ে আর কথা বাড়াতে চাই না। শুধু নমুনাস্বরূপ বলতে চাই :

আজ নানারূপ গবেষণা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে চাঁদ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য বহু তত্ত্ব এবং বহু তথ্যও আমরা জানতে সক্ষম হয়েছি। অথচ

১. Robbert Brifcault : the Mothers (1959) P 303.

www.pathagar.com

অতীতে এসব কোনওটাই সম্ভব ছিল না। এবং ছিল না বলেই শুধুমাত্র আন্দাজ অনুমানের ওপরে নির্ভর করে সে দিনের আদি-মানবেরা যে চাঁদের বুকে বিদ্যমান কালো রেখাকে চাঁদের যক্ষ্মাব্যাধি থাকা এবং চন্দ্রগ্রহণকে রাহু নামক দৈত্যের গ্রাসে নিপতিত হওয়া বলে সাব্যস্থ করে নিয়েছিল সেকথা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই জানা রয়েছে।

❑ এ সম্পর্কে লিখতে বসে হঠাৎ বাল্যকালের একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। সহৃদয় পাঠকবর্গের কাছে তা বর্ণনা করার লোভ সম্বরণ করতে পারছিনা। ঘটনাটি হল ঃ

বাল্যকালে ভোরে শয্যা ত্যাগের পূর্বে বাড়ির বড়দের মতো আমাদেরও প্রত্যহ প্রাতঃ-শ্লোক আবৃত্তি করতে হতো। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ মাত্রকেই এটা করতে হয়। আজ প্রায় সুদীর্ঘ ৫৫ বছর পর স্মৃতি থেকে চয়ন করে উক্ত শ্লোকটির কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করছি–

ব্রহ্মা মুরারী ত্রিপুরান্তকারী
ভানু শশী ভূমি সৃতঃ
বুধশ্চ গুরুশ্চ শুক্র শনি রাহু কেতু
কুর্বন্তি সর্বে মম সু প্রভাত ॥

অর্থাৎ ঃ ব্রহ্মা (সৃষ্টিকর্তা-ঈশ্বর), মুরারী (বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণু— পালনকর্তা ঈশ্বর) ত্রিপুরাণ্ডকারী (ধ্বংসের ঈশ্বর- – মহাদেব), সূর্য, চন্দ্র, মাটি (পৃথিবী), দেবতাদের সারথি, বুধ, গুরুদেব (আচার্য), শুক্র,. শন্তি, রাহু, কেতু সকলে আমার প্রভাতকে সুপ্রভাতে পরিণত করুক।

এই শ্লোকটির মাধ্যমে সুপ্রভাতের আশায় সূর্য, চন্দ্র, মাটি প্রভৃতি প্রাণহীন পদার্থের উদ্দেশে প্রার্থনা জানানোকে অনেকেই হাস্যকর এবং নির্বোধের কাজ বলে অভিমত প্রকাশ করতে পারেন। সে সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাইনা।

আমি যা বলতে চাই তাহলো, এই শ্লোক যাঁরা রচনা করেছিলেন কোনও প্রকারের যান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা ছাড়াই সেই অন্ধকার যুগে তাঁরা যে সেদিন বুধ, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহ আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছিলেন এই শ্লোকটি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করছে।

মানবসভ্যতার ক্ষেত্রে এটা যে কত বড় অবদান সেকথা গুরুত্ব সহকারে ভেবে দেখা উচিত বলে আমি মনে করি। শুধু বুধ শুক্রাদিই নয়— খোঁজ খবর নিলে দেখা যাবে যে, জ্যোতির্বিদ্যাসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহুক্ষেত্রেই সেদিন তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

একথাটিও বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি যে, সেই অন্ধকার যুগের আদি মানুষেরা চন্দ্রসূর্যকে উপাস্য দেবতা এবং যথাক্রমে অনুসূয়া

www.pathagar.com

ও অদিতির গর্ভজাত সন্তান বলে মনে করুক আর যা-ই করুক বিশ্ব-প্রকৃতি সম্পর্কে চিন্তাগবেষণার সূত্রপাত যে তাঁরাই করেছিলেন সেকথা কোনওক্রমেই অস্বীকার করা যেতে পারে না। এবং সেই সূত্রকে অবলম্বন করেই যে আজ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আবিষ্কার-উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এমন অভূত-পূর্ব উন্নতিঅগ্রগতি সম্ভব হয়েছে সেকথাও আমরা অস্বীকার করতে পারি না। এদিক দিয়ে অনায়াসে তাদের পথিকৃৎ বলা যেতে পারে।

দুঃখের বিষয়, তাদের সেদিনের সেই করুণ ও অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা না করেই তাদের বর্বর, অসভ্য বলে ঘৃণা-ভ্রূকুটি করা হয়, তাদের বর্বরতা ও অসভ্যতার ইতিহাস লিখা হয়। আর যারা তা করেন তাদের অনেকের অবস্থাই আজ আর করুণ এবং অসহায় নয়; অথচ আজও তাঁরা অতীব নিষ্ঠার সাথে সেই তথাকথিত বর্বর ও অসভ্যদের ধারণা-বিশ্বাস এবং গাছ-পাথর, নদী-নালা, চন্দ্র-সূর্য, ইতর জীব-জন্তু প্রভৃতির পূজাকে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা সভ্যতায় চরম উন্নত বলেও দাবি করে চলেছেন।

এ প্রসঙ্গে সুলেখক জনাব আবদুস সাত্তারের লিখিত আরণ্য সংস্কৃতি থেকে সুধীর কুমার করণের মন্তব্যটি হুবহু উদ্বৃত করেই নিবন্ধের ইতি টানছি।

"বৈদিক এবং পৌরাণিক যুগের পুরোহিতপুষ্ট দেব-দেবীর প্রভাব আমাদের সমাজে আজও অপ্রতিহত। এর পার্শ্বে আর একদল দেব-দেবীও সেই আদিমকাল থেকেই প্রভাব বিস্তার করে আসছে। এরা ব্রাহ্মণ পুরোহিতের করুণা লাভের জন্য অপেক্ষা করেনি। ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজের পুজাপ্রাপ্তির জন্য এদের মাথাব্যথা নেই। তবু এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, এদের প্রভাবও সমাজ-স্বীকৃত। এদের প্রচলিত নাম– 'গ্রামদেবতা'।

'বাংলাদেশে সংস্কৃতি সমন্বয়ের আদি পর্বেই এই অকুলীন দেবতারদল মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। অন-আর্য সংস্কৃতির অন্তঃশীলা প্রবাহের স্রোতরেখা ধরেই এদের আবির্ভাব। বেদ-পূর্ব যুগের সবকথা আমাদের জানবার কথা নয়। কিন্তু ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, মিত্র প্রভৃতি বৈদিক দেবতাদের পুরাকাহিনীর অঙ্গাবরণ নেই বলে এই সব দেবতার স্বরূপ বুঝতে অসুবিধা হয় না।'

'বলাবাহুল্য আদিম মানুষের যে ভয় এবং বিশ্বাস ভূত-প্রেত আত্মার জন্ম দিয়েছিল, সেই ভয় এবং বিশ্বাসই পরিমার্জিত সংস্করণে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যকে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করেছে। বৈদিক দেবতাতো আসলে 'প্রকৃতি দেবতা' ছাড়া আর কিছু নয়। বৈদিক দেবতাদের ক্রম বিকাশের পর্যায়টি মানবসমাজের অভিব্যক্তির সূত্রের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য । ঋগ্বেদের দেব-তত্ত্বের মধ্যে আদিম মানুষের বিশ্বাসই নিহিত। জীবপূজা, অচেতন পদার্থ পূজা এবং সর্বপ্রাণপূজার

www.pathagar.com

সংমিশ্রণে বৈদিক দেবতার আবির্ভাব এবং এই দেবতাদের ক্রমবিকাশের আদি পর্বটি গ্রামদেবতাদের আবির্ভাবের সঙ্গেও বিজড়িত।[1]

একটি বিশেষ ঘটনা

ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে বহু সংখ্যক মানুষ রয়েছেন যারা বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী। প্যাগানিজম তাদের মন-মানসের ওপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং আজও করে রেখেছে সে সম্পর্কে এখানে কিছু আলোকপাত করা প্রয়োজন। কিন্তু স্থানাভাববশত তা করা সম্ভব হচ্ছে না। অগত্যা 'ভগবান বুদ্ধ' নামক গ্রন্থ থেকে গৌতম বুদ্ধের জন্ম-সংক্রান্ত ঘটনার কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে।

মানবসমাজের আদি রাজা মহাসম্মতের বংশধরেরাই ক্ষত্রিয়রূপে রাজ্যশাসন করে আসছেন। মহাসম্মতের বহু বহু যুগ পরে মহেশ্বর সেন নামক জনৈক রাজার বংশধরেরা কুশীনগর ও পোতল রাজ্যে রাজত্ব করতেন। এই বংশের রাজা কনিকের দুই পুত্র— গৌতম ও ভরদ্বাজ।

গৌতম পরম ধার্মিক ছিলেন বিধায় রাজ্যশাসন না করে ধর্মসাধনার উদ্দেশে কৃষ্ণবর্ণ এক ঋষির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং গুরুর নির্দেশে পোতলের রাজ্যসীমায় এক পর্ণকুটিরে ধ্যান-মগ্ন হন। এই পর্ণকুটিরের নিকটে ভদ্রানাম্নী এক নগরনন্দিকা তার জনৈক প্রণয়ী কর্তৃক নিহত হয়।

আততায়ী রক্তাক্ত ছুরিকা উক্ত কুটির মধ্যে নিক্ষেপ করে। সন্দেহবশত পোতলবাসীরা ধ্যান-মগ্ন গৌতমকে বন্দী করে ভীষণ অত্যাচার নির্যাতন চালায় এবং শেষপর্যন্ত শূলে চড়ায়। গুরু কৃষ্ণবর্ণ তাকে দেখতে আসেন। গুরুর প্রশ্নের উত্তরে গৌতম বলেন, 'আমি যদি নির্দোষী হই তবে এখনই আপনার দেহের কৃষ্ণবর্ণ কর্ণক বর্ণে পরিণত হোক।' সঙ্গে সঙ্গে ঋষি কর্ণকবর্ণ প্রাপ্ত হন।

মৃত্যুর পূর্বে গৌতম এই বলে দুঃখ প্রকাশ করেন যে, তদীয় অপুত্রক ভ্রাতার পরে উত্তরাধীকারীর অভাবে পোতলের সিংহাসন শূন্য থাকবে।

গৌতমের ইচ্ছা বুঝতে পেরে ঋষি তপোবলে ঝড়বৃষ্টির সূচনা করেন। ফলে গৌতমের শূল-জনিত বেদনা প্রশমিত হয় ও ইন্দ্রিয় সতেজ হয়ে ওঠে। ফলে উক্ত স্থান থেকে দুবিন্দু রক্ত মিশ্রিত বীর্য পতিত হয়। কিছুক্ষণ পরে উক্ত দুবিন্দু বীর্য দুটি ডিম্বে পরিণত হয় এবং সূর্যের তাপে যথাসময়ে ফেটে গিয়ে দুটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

---

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, বাংলার লোক সাহিত্য (কলকাতা ১৯৫৪) পৃং ৫৩।

www.pathagar.com

আত্মরক্ষার্থ শিশুদ্বয় নিকটবর্তী ইক্ষুক্ষেতে প্রবেশ করে এবং সূর্যের কিরণ দ্বারা বর্ধিত হতে থাকে। এবং ঋষি গৌতম শূল-বিদ্ধ অবস্থায় সূর্য তাপে শুকিয়ে দেহ ত্যাগ করেন।

ঋষি কর্ণকবর্ণ শিশুদ্বয়কে নিজের আশ্রমে নিয়ে গিয়ে প্রতিপালন করতে থাকেন। সূর্যোদয়ের সাথে জন্ম এবং সূর্যকিরণে বর্ধিত হওয়ায় ওদের সূর্যবংশীয়' এবং গৌতমের পুত্র বিধায় বলা হয়– 'গৌতম'। গৌতমের কটিদেশ নিসৃত অঙ্গরস থেকে জাত বিধায়– 'অঙ্গিরস' এবং ইক্ষুক্ষেতে বর্ধিত ও প্রাপ্ত বলে ওদের অপর নাম হয়– 'ইক্ষাকু'।

রাজার মৃত্যুর পরে এই দুই ভ্রাতার মধ্যে যিনি বড় তিনি ইক্ষাকু নাম ধারণ করে সিংহাসনে আরোহন করেন। তার মৃত্যুর পরে কণিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। এই বংশের একশত জন রাজা ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন। তন্মধ্যে সর্বশেষ নৃপতি ইক্ষাকু বিরুধকের পুত্রগণই 'শাক্যবংশের' প্রতিষ্ঠাতা— আর এই শাক্যবংশেই ভগবান গৌতমের জন্ম হয়।[১]

এই পুস্তকের লেখক অধ্যাপক শ্রী রণধীর বড়ুয়া যে একজন উচ্চ শিক্ষিত এবং জ্ঞানী ব্যক্তি সে সম্পর্কে সন্দেহের কণামাত্র অবকাশও নেই এবং থাকতে পারে না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধধর্ম বিশ্বাসী লক্ষ লক্ষ মানুষ রয়েছেন। তাঁদের মধ্যেও যথেষ্ট সংখ্যক উচ্চশিক্ষিত এবং জ্ঞানী ব্যক্তি রয়েছেন।

অধ্যাপক রণধীর বাবু যে ওপরোক্ত ঘটনার বিবরণ সত্য এবং অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস পোষণ করেন সেটা নিশ্চিত রূপেই ধরে নেয়া যেতে পারে। কেননা বিশ্বাস না করলে তিনি তাঁর পুস্তকে এই ঘটনাকে তুলে ধরতেন না।

বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের মধ্যে যেসব উচ্চশিক্ষিত এবং জ্ঞানী রয়েছেন তাঁরাও যে নিশ্চিতরূপেই অধ্যাপক রণধীর বাবুর মত এই ঘটনার প্রতি বিশ্বাস পোষণ করেন সেকথা আমরা অনায়াসে ধরে নিতে পারি।

শুধু এই পুস্তকই নয়— বৌদ্ধধর্মের যেসব পুস্তক-পুস্তিকা পাঠ করার সুযোগ আমার হয়েছে সেসবের মধ্যেও এই ধরনের বহু ঘটনার বিবরণ আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। সেসব ঘটনার কথা বাদ দিয়ে শুধু ওপরোদ্ধৃত ঘটনাটিকে নিয়ে যিনিই যথাযথভাবে পর্যালোচনা এবং বাস্তবতার নিরিখে যাঁচাই করবেন তিনিই এক অদ্ভুত, অবাস্তব, অবিশ্বাস্য এবং প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত না বলে পারবেন না।

সুদূর অতীতের মানুষ যারা এসব ঘটনা রচনা ও বিশ্বাস করেছেন তাদের কথা স্বতন্ত্র। কেননা তখন যে পরিবেশ বিদ্যমান ছিল তা থেকে এর চেয়ে উন্নত

---

১. অধ্যাপক রণধীর বড়ুয়া এম, এ, বি, টি লিখিত 'ভগবান বুদ্ধ' দ্রষ্টব্য—

www.pathagar.com

ধরনের কিছু করা সম্ভবই ছিল না। সুতরাং তাদের এ কাজের জন্য বিস্মিত হওয়া বা তাদের প্রতি কটাক্ষ করার কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না।

কিন্তু শ্রদ্ধেয় রণধীর বাবু এবং বৌদ্ধদের মধ্যে তাঁর মত আরও যেসব উচ্চশিক্ষিত এবং জ্ঞানী রয়েছেন তাঁদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাপরায়ণ হয়েও অত্যন্ত দুঃখের সাথে আমাকে বলতে হচ্ছে যে, আজ বিংশ শতাব্দীর এই উজ্জ্বল উন্নত পরিবেশে বসবাস স্বত্ত্বেও যাঁরা বাস্তবতার সাথে সম্পর্কহীন, অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য এবং প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত এসব বিবরণ সত্য ও অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস পোষণ করছেন তাঁদের এ কাজ সহজভাবে গ্রহণ করা যায় না।

তবে সহজভাবে গ্রহণ করা না গেলেও এটা ঘটে চলেছে এবং চলতে থাকবে। কেননা, এটা একান্তরূপেই অন্ধ-বিশ্বাস। আর অন্ধ বিশ্বাস যে ন্যায়-নীতি, যুক্তি-প্রমাণ, জ্ঞান-বিবেক প্রভৃতি কোনওটার ধারই ধারেনা সে প্রমাণ ইতোপূর্বে তুলে ধরা হয়েছে।

পরিশেষে বহু বিষয়ের মধ্য থেকে একটি মাত্র বিষয় উক্ত সুধীব্যক্তিদের উদ্দেশে তুলে ধরছি এবং গভীরভাবে ভেবে দেখার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।

আমরা জানি, ধর্মের যাঁরা প্রবর্তক ধর্মীয় কোনও বিধানকে কিভাবে বাস্তবায়িত করতে হয় সম্যক ও যথাযথরূপে একমাত্র তাঁদেরই সে কথা জানা সম্ভব। এবং সেই কারণেই তাদের নিজ নিজ জীবনে তা বাস্তবায়িত করে সাধারণ মানুষদের কাছে আদর্শ বা নমুনা স্বরূপ হতে হয়। আর সেই নমুনা বা আদর্শের অনুকরণ ও অনুসরণ করে সাধারণ মানুষেরা নিজ নিজ ধর্মীয় জীবন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

এই হিসাবে মহাত্মা গৌতম বুদ্ধ যে বৌদ্ধধর্মের জীবন্ত আদর্শ বা বাস্তব নমুনা-স্বরূপ ছিলেন সেকথা সহজেই অনুমেয়। এবং তাঁর আদর্শের অনুকরণ ও অনুসরণ যে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জন্য একান্তরূপে অপরিহার্য অন্যথায় যে তাদের ধর্মীয় জীবন গড়ে তোলা সম্ভবই হতে পারেনা সেকথা অনুমান করাও মোটেই কঠিন নয়।

নির্বাণ তথা কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনার মাধ্যমে মৃত্যুবরণ বৌদ্ধধর্মের মূল লক্ষ্য বলে মহাত্মা গৌতম বুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন এবং স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, ঘর-সংসার, রাজ্য-রাজত্ব, উপায়-উপার্জন প্রভৃতি সবকিছু ছেড়ে ভিক্ষু অর্থাৎ অনাসক্ত জীবন অবলম্বন করেছিলেন। সুতরাং এছাড়া যে মুক্তি সম্ভব নয় এবং এই পথ অবলম্বন ছাড়া কেউ যে খাঁটি বৌদ্ধ হতে পারে না সেকথা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট।

www.pathagar.com

এখন খাঁটি বৌদ্ধ হওয়ার অভিলাষে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীদের সকলেই যদি ঘর-সংসার, উপায়-উপার্জন, সন্তানোৎপাদন প্রভৃতি ছেড়ে দিয়ে ভিক্ষুতে পরিণত হয় এবং একে একে নির্বাণ লাভ করতে থাকে তবে বংশধরের অভাবে বৌদ্ধধর্মকেও যে সঙ্গে সঙ্গে নির্বাণ লাভ করতে হবে সেকথা বুঝতে পারা মোটেই কঠিন নয়। অতএব এ শিক্ষা বাস্তবভিত্তিক এবং যুক্তিসম্মত কিনা সেকথা গভীরভাবে ভেবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমরা মনে করি।

মূলে যদি ভুল থাকে

বিশ্বস্রষ্টা অসীম এবং অনন্ত, পক্ষান্তরে মানুষের দৃষ্টিশক্তি, জ্ঞান-প্রজ্ঞা, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি একান্তরূপেই সীমাবদ্ধ। এমতাবস্থায় চর্মচক্ষে তাঁর দর্শন লাভ বা মানবীয় জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও ধ্যান-ধারণার সাহায্যে তাঁর প্রকৃত নাম জানা এবং স্বরূপ উপলব্ধি করা কোনওক্রমেই সম্ভব হতে পারে না।

বিশ্বস্রষ্টা শুধু অসীম এবং অনন্তই নন তিনি অবিনশ্বরও। যিনি অবিনশ্বর তিনি যে স্থূল-দেহী হতে পারেন না সেকথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখেনা। কেননা, বস্তু ছাড়া স্থূল-দেহ গঠিত হতে পারে না, আর বস্তুমাত্রই সৃষ্ট— অতএব ধ্বংসশীল। ধ্বংসশীল বস্তু দ্বারা অবিনশ্বর বা অবিধ্বংসী দেহ গঠিত হওয়া যে সম্ভব নয় সে সম্পর্কেও দ্বিমতের কোনও অবকাশ থাকতে পারে না।

এখানে প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক যে, তা হলে বিশ্বস্রষ্টার প্রকৃত নাম এবং পরিচয় জানার উপায় কি? এই প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তরই হতে পারে। আর তা হলো— যদি না তিনি নিজেই তাঁর নাম এবং পরিচয় (মানুষের পক্ষে যতটুকু পরিচয় জানা সম্ভব) জানিয়ে দেন তবে তা জানার দ্বিতীয় আর কোনও উপায়ই নেই।

মানুষ এই বিশ্বের সৃষ্টি, বিন্যাস, প্রতিপালন, পরিপোষণ প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য করে তাঁর বিভিন্ন গুণের পরিচয় পেতে পারে এবং তদনুযায়ী তাঁকে সুমহান স্রষ্টা, অসীম দয়ালু, সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী, ইচ্ছাময়, বিশ্বপ্রভু প্রভৃতি গুণ-বাচক নামে অভিহিত করতে পারে।

কিন্তু মানুষ এখানে এসেই থেমে যায়নি। নিজেদের সীমাবদ্ধতা নিয়েই এগিয়ে গিয়েছে এবং কল্পনার সাহায্যে অসীম অনন্ত স্রষ্টার এক একটি নাম এবং পরিচয় সাব্যস্থ করে সেটাকেই আসল-অকাট্য বলে চালিয়ে দিয়েছে। অবশ্য তাদের এই কল্পনা নিছক কল্পনাই ছিল না; এই কল্পনার পেছনে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার দৃঢ় সমর্থনও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সমর্থন যতই থাক আসলে মূলে যদি ভুল থাকে তবে কোনও সমর্থনই কাজে লাগে না, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে বিপরীত ফলও ফলতে দেখা যায়।

www.pathagar.com

এ সম্পর্কে একটি মাত্র উদাহরণই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি। উদাহরণটি হলো— বেদের মধ্যে কৃষি, পশুপালন, সমাজগঠন, গৃহনির্মাণ, বস্ত্রবয়ন, রাষ্ট্রপরিচালনা, সমরাস্ত্র নির্মাণ, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সম্পর্কে বহু মন্ত্র বা ঋক দেখতে পাওয়া যায়। তদানীন্তন সমাজ বেদরচনার পূর্বেই যে উন্নতি অগ্রগতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন এ থেকে সুস্পষ্টরূপেই সেকথা বুঝতে পারা যাচ্ছে।

যাঁরা এমন প্রাঞ্জল, পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং প্রাণস্পর্শী বেদ-মন্ত্রের রচনা এবং কৃষি, পশুপালন, বস্ত্রবয়ন, সমাজগঠন প্রভৃতি যুগান্তকারী কাজসমূহের উদ্ভাবন ও উন্নয়নে সক্ষম হয়েছিলেন— তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতা যে মোটেই কম ছিল না সেকথা খুলে বলার প্রয়োজন হয় না।

বলাবাহুল্য, বিশ্বস্রষ্টার আসল নাম এবং পরিচয় নির্ধারণের সময়ও তাঁরা তাঁদের এই বাস্তব অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে কাজে লাগিয়ে ছিলেন। এখানে আলোচনার সুবিধার জন্য তাদের কতিপয় বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং তা তাঁরা কিভাবে কাজে লাগিয়ে ছিলেন তার কিছুটা পরিচয় নিম্নে পৃথক পৃথকভাবে তুলে ধরা যাচ্ছে।

নিজেদের চরিত্র, শক্তিমত্তা, আচার-ব্যবহার, আবেগ-অনুরাগ প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁরা যে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন সৃষ্টিকর্তা এবং কল্পিত দেবদেবীদের সম্পর্কেও তারা সেই ধারণাই করে নিয়েছিলেন।

এই উদ্যোগ গ্রহণ করতে গিয়ে সৃষ্টিকর্তাসহ উপাস্যদের প্রত্যেকের কল্পিত চরিত্রানুযায়ী এক একটি প্রতিমা নির্মাণ করা হয়। উক্ত প্রতিমাসমূহকে এমন নিপুণতার সাথে নির্মাণ করা হয় যে, প্রতিমা দৃষ্টিগোচর হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট দেব বা দেবী কি প্রকৃতির সেকথা অতি সহজেই বুঝতে পারা যায়। এখানে বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রতিমা শব্দের অর্থ হলো, 'প্রতিম' বা 'অনুরূপ'। অর্থাৎ— দেবতা যেমন তার প্রতিমাটিকেও হুবহু ঠিক তেমনটিই হতে হবে।

আজও কোনও কোনও সমাজে প্রতিমা-পূজা প্রচলিত রয়েছে। উপাস্যদের কে ক্রোধপরায়ণ, কে কোপন-স্বভাব, কে লোভী, কে হিংসুক, কে দয়াশীল, কার ত্রিনেত্র, কার চতুর্মুখ, কার হস্তীমুণ্ড, কার দশবাহু, কে সশস্ত্র, কে নিরস্ত্র, কে বংশীবাদক এবং কে অন্য চরিত্রের অধিকারী সংশ্লিষ্ট প্রতিমাটির প্রতি একটু অভিনিবেশসহকারে লক্ষ্য করলেই তা অনায়াসে বুঝতে পারা যায়। উৎসাহী পাঠক ইচ্ছা করলে যেকোনও সময় এ কথার সত্যতা যাঁচাই করতে পারেন।

❑ মানুষের চরিত্র সম্পর্কে বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তারা সাব্যস্ত করে নিয়েছিলেন যে, কোনও কোনও দেবতা এমনকি জনৈক ভগবানও

www.pathagar.com

গাঁজা ভাং সেবন করে উন্মত্ত হয়ে ভূত প্রেতাদির সাথে উলঙ্গ নৃত্য শুরু করেন; স্ত্রীর অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুতে অধীর ও ক্রোধান্ধ হয়ে প্রশ্রাব করে শ্বশুরের যজ্ঞ ভাসিয়ে দেন; ভীত-সন্ত্রস্থ শ্বশুর ছাগলের রূপ ধরে পলায়নরত হলে তিনি পাঁঠার রূপ ধারণ করে সেই পরিচিত শব্দটি উচ্চারণ করতে করতে ছাগল-রূপী শ্বশুরের পশ্চাদ্ধাবন করেন ইত্যাদি।

❑ বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সাব্যস্ত করে নেয়া হয় যে, চরিত্রহীন মানুষদের মতো স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাসহ কোনও কোনও দেবতাও পর-নারী দর্শনে কামাতুর হন এবং ছলে হোক বলে হোক উক্ত নারীর সাথে ব্যভিচার না করা পর্যন্ত শান্ত হতে পারেন না।

❑ মানুষের মতো দেবতাদেরও লোভাতুর বলে সাব্যস্ত করতে গিয়ে কোনও দেবতা ননী-মাখন চুরি করেন, কোনও দেবতা দুধকলা ভাল বাসেন, কোনও দেবতা পাঁঠার মাংস খেতে অভিলাষী, কোনও দেবতা মণ্ডা-পায়েসপিয়াসী তাও তারা স্থির করে নিয়েছিলেন।

❑ মানুষের জীবনে বিবাহ, সন্তানোৎপাদন, পরিবার, বাসস্থান, আত্মরক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি প্রয়োজন যে কত বেশি সে সম্পর্কে তাঁরা বাস্তবভাবে মর্মে মর্মে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন।

সেই অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা সাব্যস্ত করে নিয়েছিলেন যে প্রতিটি দেব-দেবী এমনকি স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাও বিবাহ এবং সন্তানোৎপাদন করেন, তাঁর এবং প্রসিদ্ধ দেবদেবীদের সকলেরই বসবাসের জন্যে মূল্যবান আসবাবপত্র সম্বলিত সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা রয়েছে এবং উক্ত অট্টালিকায় সৃষ্টিকর্তা বা সংশ্লিষ্ট দেবতা এবং তার দাস-দাসি, স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি বিদ্যমান।

❑ আত্মরক্ষার জন্য তাদের বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে, যান-বাহন স্বরূপ রয়েছে গাধা, খচ্চর, বলদ, হস্তী, সিংহ, ব্যঘ্র, ইঁদুর, বিড়াল, কুকুর, হাঁস, ময়ুর প্রভৃতি জন্তু-জানোয়ার; রোগব্যাধি হলে 'স্বর্গ-বৈদ্য' তাঁদের চিকিৎসা করেন আর চিত্তবিনোদন করেন মেনকা, রম্ভা, উর্বসী প্রভৃতি স্বর্গ-বেশ্যারা।

ধর্মীয় গ্রন্থসমূহে এসবের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। ইচ্ছা করলে উৎসাহী পাঠকগণ যেকোনও সময়ে তা পাঠ করতে পারেন। অতএব এ নিয়ে আর সময় ক্ষেপণ করতে চাই না। পরিশেষে শুধু এটুকু বলেই প্রসঙ্গান্তরে গমন করছি যে, এ সবই হলো বাস্তব অভিজ্ঞতার ফল। এ থেকে বুঝতে পারা সহজ যে, মূলে যদি ভুল থাকে তা হলে যত বাস্তব অভিজ্ঞতাই থাক মূলের ভুলকে কেন্দ্র করেই তা আবর্তিত হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

আমার কথার পুনরুক্তি করে এখানেও আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই যে, যারা এই সব অদ্ভুত ও উদ্ভট কল্প-কাহিনী রচনা করে ধর্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন একাজের জন্য তাঁদের দায়ী করা কোনক্রমেই সঙ্গত হবে না।

কেন সঙ্গত হবে না সে প্রশ্ন যদি করেন তবে তাঁকে আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করবো যে, আশেপাশে একটু চোখ ফেরালেই দেখতে পাবেন যে, সেরা শিক্ষিত ও বিশেষভাবে জ্ঞানীগুণী বলে সুপরিচিত মানুষদের মধ্যে এমন অনেকেই রয়েছে যাঁরা বিশ্বস্রষ্টাকে স্বয়ম্ভু, নিরাকার, স্বয়ংসম্পূর্ণ, অন্য-নিরপেক্ষ ও সর্বশক্তিমান বলে বিশ্বাস পোষণের দাবি করেন, বিশ্বস্রষ্টা যে অসীম ও অতুলনীয় অর্থাৎ বিশ্বের কোনও কিছুই যে তার সমান, সমকক্ষ, বা তাঁর সাথে তুলনীয় হতে পারেনা এ বিশ্বাস থাকার দাবিতেও তারা অন্য অনেকের তুলনায় অনেক বেশি সোচ্চার, অসীম অনন্ত এবং চৈতন্য-স্বরূপ বিধায় বিশ্বস্রষ্টা যে স্থুলদেহী, রীপু ইন্দ্রিয়ের বশ এবং পুত্র-কন্যার জনক হতে পারেন না সেকথাও তারা বেশ দৃঢ়তার সাথেই বলে থাকেন; আবার সাথে সাথে ধর্মীয় গ্রন্থে বর্ণিত উদ্ভুত-উদ্ভট এবং প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত কল্প-কাহিনীসমূহকেও তাঁরা সত্য এবং অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করেন।

বিশ্বস্রষ্টা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য দেহের অধিকারী নন; সুতরাং তিনি যে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর বা লোভী-কামাতুর হতে পারেন না সেকথা জেনেও তাঁরা তাঁর প্রতিমা গড়েন এবং সেই প্রতিমার সম্মুখে লোভনীয় ভোগ-ভেট সাজিয়ে পাদ্য অর্ঘাদি দিয়ে সাড়ম্বরে এবং শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে পূজা এবং বলিদানেও ভীষণভাবে তৎপর হয়ে ওঠেন।

এখন প্রশ্ন হলো এই বিংশ শতাব্দীর মানুষ এবং এত জ্ঞানী-গুণী হয়েও তাঁরা যদি এরূপ স্ববিরোধী কাজে মেতে উঠতে পারেন তবে এখন থেকে হাজার হাজার বছর পূর্বের সেই অন্ধকার যুগের মানুষদের অনুরূপ কাজ করার জন্য কিভাবে দায়ী করা যেতে পারে?

বরং এই একটিমাত্র দিক ছাড়া সেই অন্ধকার যুগের মানুষ হয়েও তাঁরা যে সংস্কৃত ভাষার উদ্ভাবন, এমন সুললিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধর্মীয় গ্রন্থ বেদের রচনা, কৃষি, পশু-পালন, বয়ন-শিল্প, সমাজ গঠন প্রভৃতি যুগান্তকারী পদক্ষেপগ্রহণ করতে পেরেছিলেন সেজন্য তারা অপরিসীম শ্রদ্ধা-সম্মান লাভেরই যোগ্য অধিকারী বলে আমি মনে করি। আর দৃঢ়রূপে এ বিশ্বাসও পোষণ করি যে মূলে ভুল থাকার কারণেই সেই অতীতকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত ধর্মীয় ক্ষেত্রে এই হ-য-ব-র-ল অবস্থা সৃষ্টি হয়ে তা এখনও বিদ্যমান।

www.pathagar.com

একটি পর্যালোচনা

প্রিয় পাঠকবর্গ! পৃথিবীতে কিভাবে ধর্মের উদ্ভব ঘটেছে তার বিবরণ সংক্ষিপ্ত আকারে প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ধর্মের ইতিহাস হাজার হাজার বছরের। সুদূর অতীতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছাড়িয়ে পড়া ভিন্ন ভিন্ন মানব সমাজ তাদের ভিন্ন ভিন্ন ধ্যান-ধারণা এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের উদ্ভব ঘটিয়েছিল।

আজ সেসব ধর্মের অনেকগুলো বাস্তবতার কষাঘাতে ধরা-পৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। নানা ধরনের জোড়াতালি এবং গোঁজামিলের সাহায্যে তার যেগুলো আজও কোনও মতে টিকে রয়েছে তাদের সংখ্যাও মোটেই কম নয়। এমতাবস্থায় তাদের সংখ্যা নিরূপণ এবং সার্বিক পরিচয় খুঁজে বের করা এবং তুলে ধরা কোনওক্রমেই সম্ভব হতে পারে না।

অতএব সেদিকে না গিয়ে মোটামুটিভাবে একটা ধারণায় উপনীত হওয়া যেতে পারে এমনভাবে সংক্ষেপে বিষয়টিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। অতঃপর আসুন সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার সাহায্যে এর লাভক্ষতির দিকটা একটু যাঁচাই করে দেখার চেষ্টা করি ঃ

ক) ভিন্ন ভিন্ন এতগুলো ধর্ম অখণ্ড মানব-জাতিকে চিরদিনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন অসংখ্য দল-উপদলে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করে পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ, ভেদ-বৈষম্য ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টির এক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেছে।

খ) কতিপয় সুবিধা-বাদী শ্রেণী সৃষ্টি করে তাদের দ্বারা সর্বসাধারণের ওপর চিরস্থায়ীভাবে প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং শোষণ-নির্যাতন চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে।

গ) লীলা-কাহিনীর নামে বিভিন্ন কল্পিত দেবদেবী, ভূতপ্রেত, মুণি-মহাপুরুষ এমনকি স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার চরিত্র সম্পর্কে নানা ধরনের অশ্লীল ও যৌন ব্যাভিচারমূলক কেচ্ছাকাহিনীর রচনা ও রটনা করে মানুষকে চরিত্রহীন ও দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে গড়ে ওঠার প্রেরণা ও উৎসাহ সৃষ্টি করা হয়েছে।

ঘ) ধর্ম ও নিষ্ঠাপরায়ণতার নামে মানুষকে অন্ধ-বিশ্বাস, কুসংস্কার এবং কুপমণ্ডুকতার করুণ শিকারে পরিণত করে মানুষের স্বাভাবিক প্রগতিশীলতাকে ভীষণভাবে স্তব্ধ ও ব্যহত করা হয়েছে।

ঙ) 'পূর্ব জন্মার্জিত পাপের ফল' ও 'অদৃষ্টের লিখন' এই দুই কল্পিত অজুহাত সৃষ্টি করে কোটি কোটি মানুষকে বংশানুক্রমিকভাবে চিরকালের জন্য দাস, ছোটজাত ও অচ্ছ্যুত পরিণত করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়— নানা অজুহাতে তাদের মনে হীনমন্যতার সৃষ্টি করে চিরদিনের জন্য তাদের উন্নতি-অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

চ) গাছ-পালা, নদী-নালা, ইতর জীব-জন্তু, হাতে গড়া পুতুল প্রভৃতিকে উপাস্য সাব্যস্ত করে সৃষ্টির সেরা মানুষকে পশুরও নিম্নস্তরে টেনে নামানো হয়েছে— তার উন্নত শিরকে চিরদিনের জন্য অবনত করে দেয়া হয়েছে।

ছ) রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ধর্ম আবহমান কাল যাবত ঐসব স্বৈরাচারী শক্তির ক্রীড়নক হিসাবে এবং তাদেরই স্বার্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

আবার সেই ধর্মের নামেই বিশ্বের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ শোষিত বঞ্চিত হয়েছে— লাঞ্ছিত অপমানিত হয়েছে— পশু অপেক্ষাও হীনতর জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছে। তাদের এই মর্ম-বিদারী অবস্থা, কঙ্কালসার দেহ, বুক ফাঁটা আর্তনাদ প্রভৃতির কোনও কিছুই ঐসব স্বৈরাচারী সম্প্রদায়, ধর্ম ও ধার্মিক এদের কারো করুণা উদ্রেগ করতে পারেনি। ফলে আবহমান কাল যাবৎ শোষণ-বঞ্চনা আর অত্যাচার-নির্যাতনই তাদের বিধিলিপি হয়ে রয়েছে।

জ) ধর্মের এই চেহারা পৃথিবীর উন্নত-অগ্রসর দেশগুলোর অধিকাংশকেই ভীত সন্ত্রস্থ করে তুলেছে। তাই তারা ধর্মকে 'বুর্জোয়াদের শোষণের হাতিয়ার', 'বর্বর যুগীয় চিন্তাধারা', 'প্রগতির পরিপন্থী', 'আফিমসদৃশ', 'মানবতার শত্রু' প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করে নিজ নিজ দেশ থেকে অতি নিদারুণভাবে বিতাড়িত করেছে।

ঝ) অন্যান্য দেশ বহু চেষ্টা করেও যখন জীবনের কোনও ক্ষেত্রে ধর্মকে খাপখাওয়াতে পারেনি তখন অগত্যা জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে তা বিদায় দিয়ে উপাসনালয়ের মধ্যে বন্দী করেছে আর নিজেরা 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র রক্ষা-কবচ ধারণ করে ধর্মের অত্যাচার থেকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচার উদ্যোগ নিয়েছে।

ঞ) রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, যুদ্ধনীতি, সমাজনীতি, প্রভৃতি অর্থাৎ জীবনের কোনও ক্ষেত্রে ধর্মকে খাপখাওয়াতে না পারার বহু কারণই রয়েছে। তার মাত্র একটির কথা এখানে তুলে ধরা যাচ্ছে। আর এই আলোচনাটুকুর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দানের জন্য প্রিয় পাঠকবর্গের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

সুদূরের সেই অতীতে যারা ধর্মের উদ্ভব ঘটিয়েছিল কাল-পরিক্রমায় তারা ছিল প্রকৃতির কোলে 'শিশুমানব'। শিশু-সুলভ জল্পনা-কল্পনার সাহায্যে তারা যার উদ্ভব ঘটিয়ে ছিল তা ছিল তদানীন্তন সময়ের উপযোগী এবং তাদনীন্তন মানুষের সঙ্গে শোভন ও সঙ্গতিপূর্ণ।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভূতপ্রেতে বিশ্বাস, পুতুলখেলা, অদ্ভুত অলৌকিক কেচ্ছাকাহিনীর রচনা ও বিশ্বাস, হালকা ধরনের আমোদ-প্রমোদ, আশ্চর্যজনক

www.pathagar.com

কিছু দেখলেই অভিভূত হওয়া প্রভৃতি সবই হলো শৈশবের কাজ— শৈশবেই এগুলো শোভা পায়।

কাল-পরিক্রমায় মানবজাতি এখন প্রৌঢ়ত্বের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। সুতরাং সুদূর অতীতের সেই শিশু-সুলভ ধারণা বিশ্বাস এবং কাজ কারবারকে তাঁদের জীবনের সাথে খাপখাওয়ানো কোনওক্রমেই সম্ভব হতে পারে না।

তবু যদি কেউ খাপখাওয়াতে চায় তবে তাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কোনও বালকের দ্বারা যুব-সুলভ আচরণ অনুষ্ঠিত হতে দেখলে মানুষ কৌতুক বোধ করে এবং উক্ত বালককে 'ইঁচড়েপাকা' বলে আখ্যা দিয়ে থাকে।

অনুরূপভাবে কোনও বৃদ্ধকে যুবজনোচিত আচার-আচরণে উৎসাহী দেখলেও মানুষ কৌতুক বোধ করে এবং মনে করে যে বৃদ্ধের 'ভীম রতি' ধরেছে।

সত্য সমাগত

সত্য-যা তা যে সনাতন, চিরন্তন এবং সর্বজনীন সে সম্পর্কে আজ আর দ্বিমতের কোনও অবকাশই নেই। অতএব আমাদের আলোচ্য সময়েও যে সত্য বিরাজমান ছিল সেকথা অনায়াসেই বলা যেতে পারে।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করি। আর সেকথাটি হলো— যিনি যাই বলুন, এই বিশাল বিশ্বের সৃষ্টি, বিন্যাস, পরিচালন প্রভৃতির পশ্চাতে যে কোনও সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেই, সৃষ্টির এই বিশাল কারখানাটি যে পরিকল্পনা-বিহীন ও যথেচ্ছভাবে আপনাপনি পরিচালিত হচ্ছে কোনও সুস্থ বিবেক সেকথা বিশ্বাস করতে পারে না।

মানুষ যে জীবশ্রেষ্ঠ বা সৃষ্টির সেরাজীব এটা আজ একটি সুপরীক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য। আর মানুষকে কেন্দ্র করেই যে সৃষ্টির এই বিশাল কারখানাটি চালু রয়েছে সৃষ্টিজগতের প্রতি একটু অভিনিবেশসহকারে দৃষ্টি দিলেই সেকথা আমরা বুঝতে পারি।

সৃষ্টির সেরাজীব হিসেবে মানুষের মধ্যে যে সেরা গুণ রয়েছে সেকথা খুলে বলার প্রয়োজন হয় না, অথবা বলা যেতে পারে যে, সেরা গুণ রয়েছে বলেই মানুষ সেরাজীব বা জীবশ্রেষ্ঠ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

এই সেরা গুণের সাথে সাথে মানুষের মধ্যে যে সেরা দোষও রয়েছে আর সেসব দোষ যে ভীষণভাবে মারাত্মক এবং তা দ্বারা যে গোটা সৃষ্টিই ভীষণ অশান্তির আগারে এমনকি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে পারে সেকথাও আজ একটি সুপরীক্ষিত সত্য।

অবশ্য মানুষের মধ্যে এই দোষ-গুণের সমাবেশই তাকে শ্রেষ্ঠ জীবের মর্যাদায় উন্নীত করেছে। আপাতত সেকথা থাক। এখানে যেকথার প্রতি সবিশেষ

www.pathagar.com

গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন বলে মনে করি তা হলো— যিনি মানুষের স্রষ্টা নিশ্চিতরূপেই তিনি মানুষের মধ্যে এই ভয়ংকর শক্তিটির বিদ্যমানতা সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন।

আর এ কথাও অবহিত রয়েছে যে, কোনও মানুষই ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। অথচ মানুষ কর্তৃক নির্ভুল পদক্ষেপ গৃহীত হওয়া একান্তরূপেই প্রয়োজন। কেননা অন্যথায় গোটা পৃথিবী একটা নিদারুণ অশান্তির আগারে এমনকি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে পারে।

এখন প্রশ্ন হলো— যেখানে মানুষের দ্বারা নির্ভুল পদক্ষেপ গৃহীত হওয়া প্রয়োজন অথচ তা গ্রহণের যোগ্যতা মানুষের নেই অর্থাৎ তিনিই তাকে সে যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেননি, অন্য কথায় বলা যেতে পারে যে, তিনিই মানুষকে স্বল্প-জ্ঞানী ও ভুল-প্রবণ করে সৃষ্টি করেছেন। এমতাবস্থায় মানুষ যাতে নির্ভুল পদক্ষেপগ্রহণ করতে পারে তেমন কোনও ব্যবস্থা না করে তিনি মানুষকে যথেচ্ছভাবে চলতে দিয়ে এমন সুন্দর পৃথিবীটাকে নিদারুণ অশান্তির আগারে অথবা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে দেবেন এটা কি করে সম্ভব হতে পারে?

অন্যভাবেও বিষয়টিকে ভেবে দেখা যেতে পারে। আর তা হলো— সৃষ্টির সেরা হলেও পৃথিবীতে মানুষই সর্বাধিক অসহায়। অর্থাৎ তিনিই মানুষকে সর্বাধিক অসহায় করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের এই অসহায়তার মুখে তার বিরুদ্ধ-শক্তি এবং প্রতিকুল অবস্থাসমূহ যে কত প্রবল এবং প্রচণ্ড নিশ্চিতরূপেই সেকথাও তাঁর জানা রয়েছে।

এমতাবস্থায় যিনি মানুষকে সৃষ্টির সেরা অথচ সেরা অসহায় করে সৃষ্টি করলেন— শুধু তা-ই নয়, তার বিরুদ্ধ-শক্তি ও প্রতিকূল অবস্থাসমূহকেও যিনি প্রবলতম করে সৃষ্টি করলেন— সেই মানুষকে এই সব বিরুদ্ধ-শক্তি ও প্রতিকূল অবস্থাসমূহের মোকাবিলা করা এবং সৃষ্টির সেরা হয়ে-গড়ে ওঠার প্রেরণা ও পথ-নির্দেশ দানের দায়িত্ব যে এককভাবে এবং একান্তরূপে তাঁর-ই সেকথা খুলে বলার কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

এখন প্রশ্ন হলো— তিনি কি সেই দায়িত্ব উপেক্ষা— অবহেলা করে সৃষ্টির সেরা মানুষকে প্রবলতম বিরুদ্ধ-শক্তির দ্বারা পর্য্যুদস্ত ও ধ্বংস হতে দিতে পারেন? আর মানুষ যদি ধ্বংসই হয়ে গেল তবে তাকে সৃষ্টির সেরা করে সৃষ্টি করারই বা কি তাৎপর্য থাকতে পারে?

পরবর্তী অধ্যায়ে এই প্রশ্নসমূহের তথ্যপূর্ণ উত্তর দেয়া হবে। তবে এখানে শুধু এটুকু বলেই ক্ষান্ত হচ্ছি যে, নিশ্চিতরূপেই মানুষকে পথ-নির্দেশ তিনি দিয়েছেন আর তা দিয়েছেন পৃথিবীতে যখন মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে তখন থেকেই। অন্যথায় মানুষ প্রবলতম বিরুদ্ধ-শক্তিসমূহের মোকাবিলা করে টিকে

www.pathagar.com

থাকতে পারত না— সৃষ্টির সেরা হয়ে গড়ে ওঠাও তার পক্ষে সম্ভব হতো না। যেহেতু এই পথ-নির্দেশ একটি সত্য ব্যতীত কিছু নয়, অতএব এ সত্যও অন্যান্য সত্যের মতই সনাতন, চিরন্তন এবং সর্বজনীন। তবে তা মানুষের কাছে সমাগত হয়েছে ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তে। অর্থাৎ যেদিন সে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে এবং পথনির্দেশের প্রয়োজন অনুভব করেছে।

সুধী পাঠকবর্গ! আমি জানি পুনঃ পুনঃ একই কথা এবং একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে শুধু আপনাদের অনেকের ধৈর্যের ওপরেই প্রচণ্ড আঘাত দেইনি অনেকের বিরাগভাজনও হয়েছি। সেজন্য আমি বিশেষভাবে লজ্জিত ও দুঃখিত।

আসলে অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ কাজ আমাকে করতে হয়েছে। অবশ্য আমার অযোগ্যতা এবং সেই অযোগ্যতা সম্পর্কে সচেতনতাও এজন্য কম দায়ী নয়। কেননা, এই সচেতনতার জন্যই আলোচ্য বিষয়টি আমি যথাযথ গুরুত্বসহকারে এবং গ্রহণযোগ্যভাবে তুলে ধরতে পেরেছি কি না তা নিয়ে সন্দেহ জেগেছে; ফলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই বিষয় কিছুটা ভিন্নরূপ দিয়ে আবার তুলে ধরতে হয়েছে।

বিষয়ের প্রতি আমি কেন এত বেশি গুরুত্ব দিতে চেয়েছি সে সম্পর্কে বলা প্রয়োজন যে, ধর্ম বা প্যাগানিজমের সৃষ্টি এবং কেন ও কীভাবে পৃথিবীর কোন কোন দেশের কোন কোন সমাজে আজও তা টিকে রয়েছে ভালোভাবে সেকথা জানা না থাকলে পরবর্তী আলোচনায় ভালোভাবে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হবে না। ফলে আমার সকল পরিশ্রমই পণ্ড হবে। বলাবাহুল্য, এটাই হলো বিষয়ের প্রতি এত বেশি গুরুত্ব দেয়ার কারণ।

প্রকৃতির কোলে শিশু-মানবেরাই যে ধর্ম বা প্যাগানিজমের উদ্ভব ঘটিয়েছে এবং সেই কারণেই যে ধর্মীয় বিধানের মধ্যে এসব উদ্ভট-অবিশ্বাস্য ঘটনার বিবরণ তথা বাল-সুলভ চিন্তা ধারার সমাবেশ ঘটেছে সেকথা ইতোপূর্বে সবিস্তারে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

বিষয়টিকে আরো সহজভাবে বোঝানোর জন্য অতঃপর শেষ প্রচেষ্টা হিসাবে আমার বাল্য ও যৌবনের স্মৃতিচারণ করে তিনটি মাত্র ঘটনার বিবরণ নিম্নে তুলে ধরছি :

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের সন্তান হিসাবে বাল্যকাল থেকেই রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী, ভাগবত প্রভৃতি ধর্মীয় গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাবলীর সাথে পরিচিত হওয়ার বিশেষ আগ্রহ অনুভব করেছি। গুরুজনদের পক্ষ থেকে এ কাজে আমাদের ওপর বিশেষ একটা চাপও ছিল। তাছাড়া দেব-দেবী, দৈত্য-দানব, রাজা-মহারাজা প্রভৃতির জীবন-কাহিনী অতি অবশ্যই রোমাঞ্চকর হয়ে থাকে। আর রোমাঞ্চকর ঘটনার প্রতি শিশুমনের স্বাভাবিক যে আকর্ষণ থাকে সে আকর্ষণ তো ছিলই।

www.pathagar.com

সে সময়ে এসব রোমাঞ্চকর ঘটনা জানার জন্য মন সর্বদা উদগ্রীব হয়ে রয়েছে। সুতরাং সুযোগ পাওয়া মাত্রই তার সদ্ব্যবহার করেছি। শুধু তাই নয় প্রতিটি ঘটনার বিবরণকে সত্য ও অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করে অতীব যত্নের সাথে মনের মণি-কোঠায় ধরে রেখেছি— তেমনি ধরনের বীর এবং মহাপুরুষ হয়ে গড়ে ওঠার জন্য মনে মনে শপথও গ্রহণ করেছি।

আমাদের বাড়ির বিভিন্ন ঘরে বিভিন্ন দেব-দেবী, মহাপুরুষ প্রভৃতির ছবি খুব সুন্দরভাবে লটকিয়ে রাখা হতো। বলাবাহুল্য, পৌরাণিক কাহিনী জানার জন্য এগুলো খুবই সহায়ক হয়েছিল।

ঠাকুরমা (পিতামহী) আমায় সমবয়সী ছেলেদের মধ্যে আমাকেই বেশি আদর করতেন। তিনি খুবই ধার্মিকা ছিলেন। পৌরাণিক বহু ঘটনাও তিনি জানতেন। তাঁর কাছে শুয়ে ঘরে লটকানো ছবিগুলোর প্রতি নজর পড়তেই প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতাম। প্রশ্ন শুনে ঠাকুর মা খুব সুন্দরভাবে তার উত্তর দিতেন।

ছবিগুলোর মধ্যে একটি ছিল হনুমানের। রাম-রাবণের যুদ্ধে 'শক্তিশেল' বানে লক্ষ্মণের পতন হওয়ার পর তাঁকে বাঁচানোর শেষ প্রচেষ্টা হিসাবে প্রভাতের পূর্বে বিষল্যাকরণী আনয়নের বীর হনুমান গন্ধমাদন পর্বতে গমন করে বিষল্যাকরণী খুঁজে না পেয়ে গোটা পর্বতটাকে মাথায় তুলে আকাশ-পথে ছুটে আসছে; এমন সময়ে সূর্য চলেছে উদয় হতে। সূর্যের উদয় হলে লক্ষ্মণকে আর বাঁচানো যাবে না। তাই কৌশলে সূর্যকে বগলদাবা করে নিয়ে সমুদ্রের ওপর দিয়ে আকাশ-পথে হনুমান মরি কি বাঁচি ছুটে চলেছে— দূরে লঙ্কাপুরী দেখা যাচ্ছে, ছবিটি ঠিক এই সময়ের।

হনুমানের মাথায় বিরাট পর্বত আর পা-এর নিচে বিশাল সমুদ্র, ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়তাম। কত দিনে বড় হয়ে আসল পাহাড় এবং আসল সমুদ্র দেখার সুযোগ পাবো সেকথা মনে হতো। আরো কত কথাই যে মনে হতো সেকথা আজ প্রায় ভুলেই গিয়েছি।

এই ছবিটি থেকে কিছুটা দূরে আকারে ছোট আরো একটি পাহাড়ের ছবি ছিল। ছবিটি আসলে 'গোবর্ধণধারী' গোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণের। হামাগুড়িরত গোপালের তর্জনীর মাথায় পাহাড়টি অবস্থিত। বলাবাহুল্য, এ ছবিটিও বিস্ময়কর। কিন্তু বিস্মিত হতাম না। কারণ, গোপাল হলেন স্বয়ং ভগবান ও ভগবানের অবতার; সুতরাং তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব।

তাঁর এই পাহাড় উত্তোলন সম্পর্কে শ্রদ্ধেয়া ঠাকুর মা'র কাছে শুনেছিলাম :

কোনও কারণে স্বর্গের রাজা ইন্দ্র ব্রজবাসীদের ওপর ক্রুদ্ধ হন এবং তাদের ধ্বংস করার জন্য শিলাবৃষ্টি শুরু করেন। গোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণ তখন শিশু-মাত্র। হামাগুড়ি দেয়া অবস্থায় বিষয়টি বুঝতে পেরে তিনি গোবর্ধন পর্বতকে স্বীয়

www.pathagar.com

তর্জনীর ওপর তুলে ধরেন আর ব্রজবাসীরা সেই উত্তোলিত পর্বতের তলায় আশ্রয় নিয়ে উক্ত শিলাবৃষ্টির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষায় সমর্থন হয়।

বলাবাহুল্য, কৌতুহলবশে এই ছবিটির দিকেও অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকতাম এবং বড় হয়ে ভগবানের এসব লীলাকাহিনীকে আরো ভাল করে এবং আরো বেশি করে জানার জন্য মনে মনে একটা সংকল্পও গ্রহণ করে ফেলতাম।

উল্লেখ্য, আরো কিছুটা বড় হয়ে যখন রামায়ণ-ভাগবতাদি শাস্ত্র পাঠ করেছি তখন ঠাকুর মা'র কাছে শোনা এসব বিবরণ যে নির্ভুল সেকথা জানতে পেরেছি।

তৃতীয় ঘটনাটি হলো

বড়কাকা (আশুতোষ ভট্টাচার্য) তখন কোলকাতায় থেকে কলেজে পড়েন। বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে তিনি বেশ কিছুটা যুক্তিবাদী হয়ে গড়ে উঠে ছিলেন।

কোনও এক ছুটিতে তিনি বাড়ি এসেছেন। সে সময় আমাদের দূরসম্পর্কীয় জনৈক সন্ন্যাসী আত্মীয় হঠাৎ আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। বড়কাকার সাথে আলাপ-প্রসঙ্গে 'মন্ত্রশক্তি'র অমোঘতার কথা বোঝাতে গিয়ে প্রমাণ স্বরূপ তিনি 'মান্ধাতা'র জন্মের উল্লেখ করেন।

বড়কাকা উক্ত বিবরণকে অলীক ও অযৌক্তিক বলে মন্তব্য করতেই সন্ন্যাসী ঠাকুর ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং ধর্মগ্রন্থের বিবরণকে অলীক অযৌক্তিক বলাকে "ইংরেজি শিক্ষার কুফল এবং এই শ্রেণীর মানুষেরাই সনাতন হিন্দুধর্মকে রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে"— বলে খেদোক্তি করতে করতে ক্রোধের সাথে স্থান ত্যাগ করেন।

তখন এসব তত্ত্ব-কথা ভাল করে বোঝাতে না পারলেও এই ঘটনা থেকে মন্ত্রশক্তি দ্বারা কিভাবে মান্ধাতার জন্ম হয়েছিল সেকথা জানার একটা আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু পরে এই ঘটনার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

বেশকিছুদিন পরে একদিন রামায়ণ পাঠকালে মান্ধাতা সংক্রান্ত বিবরণটি আমার চোখে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যাওয়া উক্ত ঘটনাটি মনে পড়ে যায়। বিশেষ মনোযোগ দিয়ে মান্ধাতার জন্মবৃত্তান্তটি পাঠ করি এবং তার সত্যতা যাচাই-এর চেষ্টা করি। শেষপর্যন্ত বড়কাকার মন্তব্যকেই ঠিক বলে আমার মনে হয়।

পাঠকবর্গের অবগতির জন্য রামায়ণে বর্ণিত মান্ধাতার জন্ম বৃত্তান্তটি নিম্নে সংক্ষেপে তুলে ধরা যাচ্ছে।

"যুবনাশ্ব রাজা পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করাকালে পিপাসার্ত হন এবং হঠাৎ মহর্ষিগণের মন্ত্রঃপূত জল পান করে ফেলেন। ফলে তাঁর গর্ভ-সঞ্চায় হয় এবং যথাসময়ে তাঁর কুক্ষী ভেদ করে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

www.pathagar.com

ক্ষুধার্ত শিশু ক্রন্দন শুরু করলে ইন্দ্র স্বীয় তর্জনী (বৃদ্ধাঙ্গুলের পার্শ্ববর্তী অঙ্গুলিটি–) উক্ত শিশুর মুখে প্রবিষ্ট করান এবং বলেন— 'মাংধাণ্যতি' বা— 'মাংধাতা' অর্থাৎ— "আমাকে ধারণ করে (আমার তর্জনীর-রস পান করে) শিশুটি বেঁচে থাকবে।" বলাবাহুল্য এই "মাংধাতা" বাক্যটিকে কেন্দ্র করে শিশুটির নাম রাখা হয়েছিল— 'মান্ধাতা'।

মান্ধাতা সম্পর্কীয় এমন ধরনের বহু অদ্ভুদ ঘটনার বিবরণ ধর্মীয় বিধানসমূহে রয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো— আজও এই ঘটনাকে অনেকেই সত্য ও অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করেন। এবং বিশ্বাস করেন বলেই কথায় কথায় মান্ধাতার আমলের উল্লেখও তাঁরা করে থাকেন।

এমনি ধরনের বহু ঘটনার বিবরণ আজও মনের পাতায় গাঁথা রয়েছে। পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কায় সেগুলোকে তুলে ধরা হলো না। যৌবন লাভের পূর্বে অর্থাৎ যত দিন জ্ঞান বুদ্ধি তেমন পরিপক্ক হয়ে ওঠেনি ততদিন এসব ঘটনাকে সম্পূর্ণরূপে সত্য এবং অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করেছি।

কিন্তু পরে যখন এসব নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা ও আসল ঘটনা জানা সম্ভব হয়েছে তখন বাল্য কৈশোরের সে বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখা আর সম্ভব হয়নি; সব কিছুকেই অসার অযৌক্তিক এবং বালসুলভ চিন্তার পরিণতি বলে মনে হয়েছে।

এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যেতে চাই না। কেননা, এসব ঘটনা যে সত্য, অভ্রান্ত এবং যুক্তি-গ্রাহ্য হতে পারে না– হওয়া যে সম্ভবই নয় প্রতিটি জাগ্রত-বিবেক সে সাক্ষ্যই প্রদান করবে। তবে যাদের বিবেক নানা কারনে নিস্পন্দ ও অসার হয়ে পড়েছে তাদের কথা স্বতন্ত্র।

তবু আলোচনা প্রসঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, রামায়ণের পাঠকমাত্রই একথা অবশ্যই পরিজ্ঞাত রয়েছেন যে, যিনি এই রামায়ণ রচনা করেছেন তার নাম ছিল 'রত্নাকর দস্যু'। সারাজীবন দস্যু-বৃত্তিতে কাটিয়ে ঘটনাচক্রে শেষজীবনে তিনি তপস্যায় রত হন এবং 'বাল্মীকি' নাম ধারণ করেন। রামায়ণ নামক গ্রন্থখানার রচনাকারী হলেন এই রত্নাকর দস্যু বা বাল্মীকি মুণি আর তাও না কি না রামজন্মের ষাট হাজার বছর পূর্বে!

রামায়ণ রচনার এই ঘটনা এবং রামায়ণে বর্ণিত কপি, কবন্ধ, বানর, হনুমান, বলী, সুগ্রীব প্রভৃতিরা যে মানুষ ছিল এবং বিপদের দিনে রামের সাহায্যার্থে সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে এসেছিল একথা যেদিন জানতে পেরেছি এবং যেদিন বুঝতে পেরেছি যে রামের মাহাত্ম্য বাড়ানোর জন্য এইসব উপকারী মানুষদের ধর্মীয় বিধানের মাধ্যমে বানর, হনুমান প্রভৃতি অর্থাৎ হীন পশুরূপে

www.pathagar.com

চিত্রিত করা হয়েছে তখন বাল্য-কৈশোরের সে বিশ্বাসকে বহু চেষ্টা করেও আমি আর ধরে রাখতে পারিনি।

তারপরে 'গোবর্ধন' পর্বতের কথা : প্রকৃত ঘটনা হলো— ব্রজের গোপাল শৈশবে হামাগুড়ি দিয়ে চলায় সময়ে শুষ্ক গোবরের (গরুর বিষ্ঠা) একটি টুকরা হাতের কাছে পেয়ে হাতের সাহায্যে তা গ্রহণ করে এবং শিশু সুলভ চপলতার কারণে উক্ত টুকরাটিসহ হাতখানাকে উর্ধ্বে উত্তোলিত করে।

শিশুমাত্রই যে হাতের কাছে যা পায় তা গোবর পুরীষ যাই হোক সাগ্রহে কুড়িয়ে নেয়— এমনকি অনেক সময়ে মুখেও দেয় এ অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ। সুতরাং এতে কোনও অলৌকিকত্বই থাকতে পারে না। কিন্তু ভক্ত-ভাবুকদের বিবেচনায় তিনি হলেন স্বয়ং ভগবান বা ভগবানের অবতার! অতএব তাঁর কাজে অলৌকিকত্ব থাকতেই হবে। আর তা থাকতে হবে বলে গোপাল তথা শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুরও বহুকাল পরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেবরাজ ইন্দ্র ও ব্রজবাসী সম্পর্কীয় ওপরোক্ত উপাখ্যানটি রচিত হয়। অর্থাৎ— ভক্তি ও ভাবের আতিশয্যে শুষ্ক গোবরের টুকরাটিকে পরিণত করা হয় বিশাল গোবর্ধন পর্বতে আর তার তলায় ব্রজবাসীদের আশ্রয় প্রদান করে দেবরাজ ইন্দ্রের পরিকল্পনাটাকেই করে দেয়া হয় সম্পূর্ণরূপে নস্যাৎ এবং অকেজো!

শুধু তাই নয়— এই গোবর্ধনধারী গোপালের পূজাকে মহাপুণ্যজনক আখ্যা প্রদান করে তা সমাজে প্রচলিতও করেন। আজও তা সাড়ম্বরে প্রচলিত রয়েছে।

উল্লেখ্য, 'গোবরের টুকরাকে' 'গোবর্ধন পর্বতে' পরিণত করার বিশেষ একটা সুযোগও এই ভক্তবৃন্দ পেয়েছিলেন। সে সুযোগটি হলো— উক্ত সমাজের দৃষ্টিতে গোবর একটি মহাপবিত্র বস্তু, তা ছাড়া এর ব্যবহারিক মূল্যও যথেষ্ট। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তারা গোবরকে বিশেষ 'ধন' বা বিশেষ সম্পদ বলে মনে করতেন। সেই কারণেই তারা এই বস্তুটিকে 'গোবর ধন' বলে আখ্যায়িত করতেন। কালক্রমে ভক্ত অনুরক্ত এবং বিজ্ঞ ভাষাবিদদের কল্যাণে উক্ত 'গোবর-ধন' 'গোবর্ধনে' পরিণত হয়। পরিশেষে ভক্তদের কল্যাণে তা পরিণত হয়— প্রকান্ড 'গোবর্ধন পর্বতে'!

এখন কথা হলো— হনুমান কর্তৃক গন্ধমাদন পর্বতকে সমূলে উৎপাটিত করে মস্তকে ধারণ, সূর্যকে বগলদাবাকরণ, শিশু গোপাল কর্তৃক স্বীয় তর্জনীয় ওপর গোবর্ধন পর্বতকে স্থান দান, পুরুষের উদরে মান্ধাতার জন্ম, মৃত ব্যক্তির ক্ষুধা নিবৃত্তি ও নেশা মিটানোর জন্য যথাক্রমে 'ভাদ্যা পূজা' ও হুক্কা-কল্কী ও পানসুপারীসহ মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করা, অনাত্মীয় মৃত ব্যক্তির ভূত বা

www.pathagar.com

প্রেতযোনী-প্রাপ্ত আত্মাবস্তুর অনিষ্টকারিতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আত্মীয় মৃত ব্যক্তির মস্তক ঘরে লটকিয়ে রাখা প্রভৃতি কাজগুলো আজও বিভিন্ন সমাজ কর্তৃক সাড়ম্বরে এবং পরম শ্রদ্ধার সাথে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে।

বলাবাহুল্য, যারা এসবের অনুষ্ঠাতা তারা নিশ্চিতরূপেই এ সবকে সত্য, অভ্রান্ত এবং ধর্মীয় কাজ বলে গভীরভাবে বিশ্বাস পোষণ করেন। এদের মধ্যে যে বহুসংখ্যক প্রখ্যাত, বিশেষভাবে জ্ঞানীগুণী এবং শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিও রয়েছেন সেকথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনকি তাঁদের অনেকের সাথে আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয় এবং যথেষ্ট পরিমাণে হৃদ্যতাও রয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো— এত প্রখ্যাত এবং জ্ঞানীগুণী হয়ে তাঁরা কেন এসব মিথ্যা, অযৌক্তিক এবং প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত কল্প-কাহিনীকে সত্য, অভ্রান্ত এবং অমোঘ ধর্মীয় বিধান বলে বিশ্বাস পোষণ করেন?

এই প্রশ্নের উত্তর হলো— তাঁদের এই বিশ্বাসের নাম— অন্ধবিশ্বাস আর অন্ধবিশ্বাস যে কোনও যুক্তি প্রমাণের ধার ধারে না ইতোপূর্বে সেকথা বলা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে শেষকথা হলো— অন্ধবিশ্বাসই ধর্মের জন্ম দিয়েছে এবং অন্ধবিশ্বাসের ডানায় ভর করেই ধর্ম টিকে রয়েছে। অতএব ধর্মকে টিকিয়ে রাখতে হলে অন্ধ-বিশ্বাসী মনমানসিকতাকেও টিকিয়ে রাখতে হবে। আশা করি সুধী পাঠকবর্গ এই কথাটিকে স্মৃতির পাতায় জাগরুক রেখে পরবর্তী আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়
পৃথিবীতে দীনের আবির্ভাব বা নুজুলে দীন

পটভূমিকা

প্রকৃতির কোলের একান্তরূপে অসহায় শিশু-মানবেরা একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রোগ-ব্যাধি, জরা-মৃত্যু, হিংস্র-শ্বাপদ, অমাবশ্যার অন্ধকার প্রভৃতির আক্রমণে প্রচণ্ডভাবে ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে উঠেছে; অন্যদিকে প্রভাত-সূর্য, পূর্ণিমার চাঁদ, অগ্নির দাহিকা, শান্ত প্রকৃতি, সুমিষ্ট ফল, শীতল পানি তাদের মনকে বিস্ময়ে আপ্লুত ও আশান্বিত করে তুলেছে।

তাদের এই প্রচণ্ড ভয় এবং বুকভরা আশার সাথে ছিল অজানাকে জানার স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা। সেদিনের সেই শিশুসুলভ মনের অনুসন্ধিৎসা থেকেই তারা এসব কিছুর পশ্চাতে ভূত-প্রেতাদি বহুসংখ্যক অশরীরি শক্তি ও প্রাকৃতিক পদার্থের অস্তিত্ব থাকার কথা এবং কাকুতি-মিনতিকরণ, স্তব-স্তুতি গঠন, শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন এবং ভোগ-ভেট নিবেদন প্রভৃতির মাধ্যমে তাদের ক্রোধপ্রশমন ও সন্তুষ্টিবিধান সম্ভব বলে কল্পনা করে নিয়েছিল। বলাবাহুল্য, এটাই ছিল ধর্মের উদ্ভব ঘটার মূল কারণ।

মানুষ ধর্মকে কেন্দ্র করে বহুকাল ধরে জল্পনা-কল্পনা ও চিন্তা-গবেষণা চালিয়ে এসেছে এবং হাজার হাজার বছরের অক্লান্ত ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় বিরাট বিরাট ধর্মীয় বিধান রচনা করেছে।

কিন্তু সেই ধর্মীয় বিধানে বিশ্বস্রষ্টার প্রকৃত পরিচয়, সৃষ্টির উদ্দেশ্য, এই বিশ্বের সৃষ্টি, বিন্যাস, পরিচালনা, পরিণতি প্রভৃতি সম্পর্কে কোনও পরিকল্পনা আছে কি না, মানব-সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি এবং সেই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার সুনির্দিষ্ট পথ-পদ্ধতিইবা কি প্রভৃতি সম্পর্কে কোনও সুষ্ঠু বিশ্বাসযোগ্য, সর্বসম্মত, সর্বজনীন এবং পূর্ণাঙ্গ সমাধান আমরা খুঁজে পাইনা। অদ্ভূত-অলৌকিক নানা ঘটনার অবিশ্বাস্য কল্প-কাহিনী, জাতিভেদে প্রথার মাধ্যমে মানুষে মানুষে চিরন্তন কালের জন্য সুবিধাবাদী শ্রেণী কর্তৃক অন্যদের অধিকার হরণ, ঘৃণাবিদ্বেষ পোষণ এবং শোষণ-নির্যাতন চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি : আর নানাবিধ কুসংস্কার ও

www.pathagar.com

অন্ধ-বিশ্বাসকে মুক্তি ও মোক্ষলাভের উপায় হিসাবে নির্ধারিতকরণ প্রভৃতিই খুঁজে পাওয়া যায়।

অবশ্য মানব-সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে মনুসংহিতার অভিমত ইতোপূর্বে আমরা জানতে পেরেছি। সেখানে যে "গর্ভধারণ জন্য স্ত্রী এবং সন্তানোৎপাদনের জন্য পুরুষ"কে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে আশাকরি সুধী পাঠকবর্গ সেকথা মনে রেখেছেন।

এ প্রসঙ্গে আমাদের সুদৃঢ় অভিমতকে এখানে পুনর্ব্যক্ত না করে পারছি না যে ধর্মের এই অবস্থার জন্য যারা ধর্মের উদ্ভব ঘটিয়েছিল তাদের দায়ী করা হলে প্রচণ্ড ধরনের ভুল করা হবে। কারণ সেদিনের মন-মানসিকতা দিয়ে এর চেয়ে উন্নত ধরনের কিছু করা তাদের পক্ষে সম্ভবই ছিল না।

হাজার হাজার বছর পরে যাঁরা ধর্মীয় বিধান রচনা করেছিলেন কেউ কেউ তাঁদের এই অবস্থার জন্য দায়ী করতে পারেন। কিন্তু সেটাও ঠিক হবে না বলে আমরা দৃঢ় অভিমত ব্যক্তি করেছি। কারণ একদিকে বংশানুক্রমিকভাবে অতীতের ধারণা-বিশ্বাসগুলো তাদের মন-মানসকে ভীষণভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল আর অন্যদিকে সত্য নির্ধারণের কোনও মাপকাঠি যে তাদের আয়ত্ত্বের মধ্যে ছিল না আর থেকে থাকলেও কুসংস্কার এবং অন্ধ-বিশ্বাসের প্রচণ্ডতায় সেটাকে গ্রহণ করা থেকে তারা যে বিরত ছিলেন ইতোপূর্বে দৃঢ়তার সাথে আমরা সেকথাও বলেছি। সর্বোপরি উক্ত ব্যক্তিদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা, পাণ্ডিত্য, নিষ্ঠা, ধার্মিকতা প্রভৃতির জন্য তাঁদের প্রতি আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকা স্বত্ত্বেও বলতে বাধ্য হয়েছি যে, ওসব দিকে যত যোগ্যতাই থাক– তাঁরাও মানুষই ছিলেন। সুতরাং অন্য মানুষের মতো তাঁদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, চিন্তাশক্তি প্রভৃতিও ছিল সীমাবদ্ধ এবং অন্য মানুষের মতো তাঁরাও ভুল ত্রুটির উর্ধ্বে ছিলেন না। অতএব সীমাবদ্ধ জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং ভুল ও ত্রুটিপ্রবণতা দিয়ে যে ধরণের এবং যত উচ্চমানের ধর্মীয় বিধান রচনা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল ঠিক তেমনি ধরনের ধর্মীয় বিধানই তাঁরা রচনা করেছিলেন। তাই বলছিলাম যে, তাঁদের রচিত ধর্মীয় বিধানের ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রভৃতির জন্য তাঁদের দায়ী করা ঠিক হবে না।

ইতোপূর্বে এ বলে আমরা দুঃখ এবং ক্ষোভ প্রকাশ করেছি যে, আজ বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে পৃথিবীর বহু দেশ থেকেই অতীতের ওসব কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাস অপসৃত হয়েছে অথবা হয়ে চলেছে তখনও জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শিক্ষা-সভ্যতায় বিশেষভাবে উন্নত-অগ্রসর বলে পরিচিত কোনও কোনও সমাজ সেই কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস ভীষণভাবে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন— আজও গাছ-বৃক্ষ, ভূত-প্রেত, পশু-পাখি, নদ-নদী, চন্দ্র-সূর্য

www.pathagar.com

প্রভৃতিকে উপাস্য জ্ঞানে তাদের উদ্দেশে পূজার্চনা ও ভোগ-ভেট নিবেদন করে চলেছেন।

সুধী পাঠকবর্গ! আশা করি প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে এটাও আপনাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে পরবর্তী মুহূর্তে নিজের জীবনে কি ঘটতে যাচ্ছে সেকথা যে মানুষ জানে না তার পক্ষে বিশ্ব-স্রষ্টার অস্তিত্ব এবং সত্যিকারের পরিচয়, বিশ্ব-সৃষ্টির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং পরিণতি, মানবজীবনের দায়িত্ব-কর্তব্য এবং পারলৌকিক জীবন প্রভৃতি সম্পর্কীয় কোনও গ্রন্থ রচনা কোনওক্রমেই সম্ভব হতে পারে না।

অতঃপর বক্ষমাণ অধ্যায়ে আমরা এমন একটি বিধানের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাব যা স্বয়ং বিশ্ব-বিধাতার নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং যার মাঝে আমাদের উদ্দিষ্ট তত্ত্ব ও তথ্যসমূহের সার্বিক, সুন্দর এবং সর্বতোভাবে বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনা ও বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। আলোচনার সুবিধার জন্য বক্ষমাণ নিবন্ধের প্রথমেই আমরা অতি সংক্ষেপে এই নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা সম্পর্কে দু'কথা তুলে ধরবো। কেননা, সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে সুস্পষ্ট একটা ধারণা না থাকলে তাঁর কার্যক্রম সম্পর্কেও যেকোনও সুস্পষ্ট ধারণায় উপনীত হওয়া সম্ভব হতে পারে না ধর্মীয় গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে তার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা ইতোপূর্বে পেয়েছি।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরে 'বিশ্ব নিখিলের সৃষ্টি ও নামকরণ', 'মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য', 'পরিকল্পনা', 'প্রস্তাবনা', 'প্রস্তুতি পর্ব', 'ধরার বুকে মাটির মানুষ' প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উপ-শিরোনাম দিয়ে বক্ষ্যমাণ নিবন্ধকে প্রিয় পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হবে।

বিশ্ব স্রষ্টার পরিচয়

যেহেতু এই বিশ্বের যিনি স্রষ্টা তিনি অজড়, অমর, স্বয়ম্ভু, অসীম, অনন্ত এবং চিন্ময় সুতরাং তিনি স্থূল দেহের অধিকারী হতে পারেন না। এ নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে বিধায় একটু বিস্তারিতভাবে বলা প্রয়োজন যে, স্থূল বা দৃষ্টি-গ্রাহ্য দেহ-গঠনে স্থূল বস্তু ব্যবহৃত হয়ে থাকে, আর বস্তুমাত্রই সৃষ্ট, সুতরাং ধ্বংসশীল! পক্ষান্তরে তিনি হলেন অজড় এবং অবিধ্বংসী। এমতাবস্থায় কোনওক্রমেই যে তিনি স্থূল বা দৃষ্টি-গ্রাহ্য দেহের অধিকারী হতে পারেন না সে সম্পর্কে কোনও দ্বিমত থাকতে পারে না।

বিশ্ব নিখিলের সৃষ্টি, বিন্যাস, পরিচালনা প্রভৃতি সম্পর্কে অনুধাবন এবং সীমাবদ্ধ জ্ঞানবুদ্ধি ও প্রজ্ঞা-প্রতিভার সাহায্যে মানুষ অসীম অনন্ত সৃষ্টিকর্তার

www.pathagar.com

কিছুটা পরিচয় পেতে পারে, কিন্তু মানবীয় ভাবাবেগ, অন্ধভক্তি, পরিবেশের প্রভাব এবং প্রভৃতির জন্য সেই কিছুটা পরিচয় বা সামান্য জানাটুকুর মধ্যেও ভুলত্রুটি প্রভৃতি আবিলতার সংমিশ্রণ ঘটা মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়।

এমতাবস্থায় অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে একথা বলা যেতে পারে যে, যতক্ষণ স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা যেকোনও ভাবেই হোক তাঁর প্রকৃত নাম এবং পরিচয়টি মানুষকে না জানান ততক্ষণ সত্যিকারভাবে তাঁকে জানার কোনও উপায়ই মানুষের নেই।

উপায় যে নেই পূর্বে আলোচিত ধর্মীয় বিধানসমূহ থেকে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা পেয়েছি। আলোচনায় কিছুটা সহায়ক হবে বিবেচনায় নতুন করে আবার এখানে বলতে হচ্ছে যে, প্রায় প্রতিটি ধর্মীয় বিধানই সৃষ্টিকর্তাকে 'ইচ্ছাময়' এবং 'সর্বশক্তিমান' বলেছে; বলাবাহুল্য কোনও প্রকার উপকরণ-উপাদান এবং চেষ্টা-সাধনা ছাড়াই শুধু যাঁর ইচ্ছামাত্রই সবকিছু হয়ে যায় এবং যিনি সকল শক্তির উৎস ও আধার তাকেই ইচ্ছাময় ও সর্বশক্তিমান বলা হয়ে থাকে।

অথচ তাঁকে ইচ্ছাময় এবং সর্বশক্তিমান বলার পরও কাজের বেলায় ঐসব ধর্মীয় বিধান তাঁর এই গুণদ্বয়কে অতি নিদারুণভাবে উপেক্ষা-অবহেলা করে মানুষের ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতিকে শুধু ভূত প্রেতাদি কল্পিত শক্তির ক্রোধ ও সন্তোষ তথা ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল বলেই সাব্যস্ত করেনি বরং তাদের একেবারে উপাস্যের আসনে বসিয়েছে।

পৃথিবী সৃষ্টির বিবরণও ঐসব ধর্মগ্রন্থ থেকে আমরা ইতোপূর্বে জানতে পেরেছি। সেখানে পৃথিবীর নাম কেন 'পৃথিবী' 'ব্রহ্মাণ্ড' এবং 'মেদিনী' প্রভৃতি রাখা হয়েছে সে সম্পর্কীয় হাস্যকর এবং অবিশ্বাস্য বর্ণনাসমূহ অবশ্যই পাঠকবর্গের স্মৃতি হতে এত শীঘ্রই মুছে যায়নি।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা নিজে যতক্ষণ তাঁর পবিত্র নাম এবং প্রকৃত পরিচয় যেকোনও ভাবেই হোক মানুষকে না জানান ততক্ষণ তা জানার আর কোনও উপায়ই নেই।

এখানে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, যেহেতু মানুষের জ্ঞান-প্রজ্ঞা ধ্যান-ধারণা, চিন্তাশক্তি প্রভৃতি সীমাবদ্ধ আর সৃষ্টিকর্তা হলেন অসীম এবং অনন্ত; এমতাবস্থায় অসীম অনন্তকে সম্যকরূপে জানা মানুষের পক্ষে কি করে সম্ভব হতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তর হল— মানুষের যতটুকু যোগ্যতা ততটুকু জানাই তার জন্য যথেষ্ট। আর এ জানার মধ্যে সামান্যতম ভুলত্রুটি বা অন্য কোনও রকমের আবিলতা থাকে না বলে তা হয়ে দাঁড়ায় তার জীবনের জন্য সর্বোত্তম সম্পদ।

মানুষের দুর্বলতার কথা মানুষের যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি অবশ্যই পরিজ্ঞাত রয়েছেন এবং পরিজ্ঞাত রয়েছেন বলেই আবহমান কাল ধরে তাঁর নির্বাচিত

www.pathagar.com

বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি এবং ধর্মীয় বিধানের মাধ্যমে তিনি যে যুগে যুগে তাঁর পরিচয় মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি এবং গ্রহণযোগ্যতানুযায়ী জানিয়ে দিয়ে এসেছেন তার প্রকৃষ্ট কতিপয় প্রমাণ এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হবে।

তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান আল-কুরআন থেকে অতঃপর তাঁর পরিচয়-সূচক কতিপয় বাণী উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ঃ

"(হে রাসূল! আপনি বিশ্ববাসীর উদ্দেশে ঘোষণা করুন) তিনিই আল্লাহ যিনি ছাড়া আর কোনও উপাস্য নেই; তিনি চিরজীবন্ত ও নিত্যবিরাজমান। তন্দ্রা অথবা নিদ্রা তাঁকে আকর্ষণ করে না। নভোমণ্ডল এবং ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে তা একমাত্র তারই। এমন কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর সকাশে অনুরোধ করতে পারে? তাদের সম্মুখে যা আছে ও তাদের পশ্চাতে যা আছে তিনি তা জানেন। তিনি যা ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁর অনন্ত জ্ঞানের কোনও বিষয়ই কেউ ধারণা করতে পারে না। তাঁর আসন নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হয়ে বিরাজ করছে এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁকে সামান্যতম বিব্রতও হতে হয় না এবং তিনি সমুন্নত— মহীয়ান।" — আল কুরআন, আয়তুল কুরসী।

"(হে রাসূল) আপনি বলুন— আল্লাহ একক (অদ্বৈত)। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ (অন্য নিরপেক্ষ) তিনি জনক বা জাত নন এবং তার কোনও সমকক্ষ নেই— (থাকতে পারে না)।" — আল কুরআন, ইখলাস।

"তিনিই আল্লাহ যিনি ছাড়া আর কোনও উপাস্য নেই, তিনি চিরজীবন্ত ও নিত্য বিরাজমান। (হে রাসুল!) তিনি আপনার প্রতি সত্যসহ গ্রন্থ (আল কুরআন) নাযিল করেছেন— যা পূর্ববর্তী বিষয়ের সত্যতা-প্রতিপাদনকারী। এবং তিনি এর পূর্বে মানবমণ্ডলীর জন্য পথ-প্রদর্শক তওরাত ও ইঞ্জিল নাযিল করেছিলেন এবং তিনিই কুরআন নাযিল করেছেন। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর নির্দেশনাবলীর প্রতি অবিশ্বাস করে তাদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে, নিশ্চয়ই ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের কোনও বিষয়ই আল্লাহ অজ্ঞাত নয়। তিনি স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী জরায়ুর মধ্যে তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন; সেই মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় ছাড়া আর কোনও উপাস্য নেই।" — আর কুরআন, আল ইমরান।

"তিনিই আল্লাহ যিনি ব্যতীত আর কোনও উপাস্য নেই। তিনি গুপ্ত এবং ব্যক্ত সবকিছু পরিজ্ঞাত রয়েছেন। তিনি পরম দাতা এবং করুণাময়। তিনিই আল্লাহ — যিনি ব্যতীত আর কোনও উপাস্য নেই (অর্থাৎ উপাস্য হওয়ার পরিপূর্ণ যোগ্যতা একমাত্র তাঁরই রয়েছে)। তিনি মালিক অর্থাৎ যাবতীয় রাজ্য-রাজত্বের একমাত্র ও সার্বভৌম অধিকারী। (তিনি) পরম পবিত্র, শান্তিদাতা, রক্ষাকর্তা, নিরাপত্তা বিধায়ক, সকলের অভিভাবক, পরম তত্ত্বাবধায়ক, চরম শক্তি-মত্তার অধিকারী, সর্বোত্তম, সকল মহত্বের অধিকারী এবং তারা

www.pathagar.com

(অংশীবাদীগণ) যাদের তাঁর সমকক্ষ বিবেচনা করছে তা থেকে তিনি পবিত্র, প্রশংসিত ও গৌরবান্বিত।"

"তিনিই আল্লাহ (যিনি) সর্বস্রষ্টা, সংগঠক এবং বিন্যাসক— সুন্দরতম নামসমূহ তাঁরই। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তারা সকলে তাঁরই প্রশংসাকীর্তন করছে এবং তিনি সুমহান ও বিজ্ঞানময়।"— আল কুরআন, হাসর।

আশাকরি আর অধিক উদ্ধৃতি দেয়ার প্রয়োজন হবে না। এইসব বাণীর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর পবিত্র নাম, সত্তা এবং গুণাবলীর পরিচয়কে কেমন প্রাঞ্জল, সুস্পষ্ট এবং সুদৃঢ়ভাবে ব্যক্তি করেছেন তা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি ও নামকরণ

যেহেতু বিশ্ব-নিখিলের যিনি স্রষ্টা তিনি সৃষ্ট হতে পারেন না— অতএব সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র তিনিই বিদ্যমান ছিলেন। হাদিস কুদসিতে বর্ণিত রয়েছে— "আল্লাহ গুপ্তধন (সদৃশ) ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করলেন নিজেকে প্রকাশিত করবেন তাই এই বিশ্ব-নিখিলের সৃষ্টি করলেন।"

বলাবাহুল্য দ্বিতীয় পক্ষ ছাড়া কোনও কিছুকে প্রকাশিত করা সম্ভব হতে পারে না। প্রকাশিত হওয়ার তাৎপর্য যে নিজের অস্তিত্বের কথা অন্যকে জানানো সে সম্পর্কে দ্বিমতের কোনও অবকাশ নেই। অতএব এমনকিছু করা প্রয়োজন ছিল যদ্বারা-যে কারো পক্ষে স্রষ্টাকে জানা সহজ ও সম্ভব হয়।

যেহেতু বিশ্ব-স্রষ্ট স্বয়ং-সম্পূর্ণ অতএব লাভ-ক্ষতি, অভাব, দৈন্য, অপূর্ণতা, অক্ষমতা, প্রয়োজন, পরমুখাপেক্ষিতা প্রভৃতি সবকিছু থেকে তিনি সর্বতোভাবে মুক্ত ও স্বাধীন।

অতএব নিজের অস্তিত্বের প্রকাশ ঘটানো ছাড়া বিশ্বসৃষ্টির মূলে তাঁর লাভ, ক্ষতি, প্রয়োজন-পূরণ প্রভৃতির কোনও প্রশ্নই যে উঠতে পারেনা সেকথা খুলে বলার প্রয়োজন হয় না।

কথাটিকে এভাবেও বলা যেতে পারে যে, নিজের অস্তিত্বের কথা জানানো ছাড়া বিশ্ব সৃষ্টির মূলে আল্লাহর আর কোনও উদ্দেশ্যই ছিল না। অর্থাৎ এমনকিছু সৃষ্টি করা যা থেকে তাঁর অস্তিত্বের কথা জানা যেতে পারে। পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে এ সম্পর্কীয় ঘোষণা থেকে জানা যায়, "আমি যখনই কিছু সৃষ্টি বা সংঘটনের ইচ্ছা করি তখন বলি 'হও' অমনি হয়ে যায়।

— আল কুরআন– ১৬ ঃ ৪০

যেহেতু তিনি 'ইচ্ছাময়' এবং 'সর্বশক্তিমান' অতএব কোনও সৃষ্টি বা কিছু সংঘটনের ব্যাপারে তাঁর যে কোনওরূপ চেষ্টা-সাধনা, উদ্যোগ-আয়োজন বা

www.pathagar.com

উপকরণ উপাদানাদির প্রয়োজন হয় না তাঁর ইচ্ছা এবং 'হও' বলাই যথেষ্ট। বলাবাহুল্য, এখানে সে কথাই বোঝানো হয়েছে।

স্মর্তব্য যে, মানবরচিত ধর্মীয় বিধানসমূহের প্রায় সবগুলোই তাঁকে 'ইচ্ছাময়' এবং 'সর্বশক্তিমান' বলেছে, আবার কাজের বেলায় তাঁর এই গুণদ্বয়কে অতি নির্মমভাবে উপেক্ষা অবহেলা করে মানুষের জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ প্রভৃতিকে শুধু ভূত-প্রেতাদির ক্রোধ-সন্তোষ বা ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল বলেই ক্ষান্ত হয়নি— ঐ সব কল্পিত শক্তিকে উপাস্যের মর্যাদা প্রদান এবং তাদের পূজার্চনাকে অপরিহার্য বলেও ঘোষণা করেছে। ওসব ধর্মীয় বিধানের কথাই বা বলি কেন? আমাদের চোখের সম্মুখেই তো গাছ-বৃক্ষ, ভূত-প্রেত এবং জন্তু-জানোয়ারাদি পূজার অসংখ্য অগণিত বাস্তব উদাহরণ বিদ্যমান।

ঐসব ধর্মীয় বিধানে পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তার 'পৃথিবী', 'ব্রহ্মাণ্ড', 'মেদিনী' প্রভৃতি নামকরণের পশ্চাতে যে সব অদ্ভুত, হাস্যকর এবং অবিশ্বাস্য-ঘটনার বিবরণসমূহ রয়েছে ইতোপূর্বে তা আমরা জানতে পেরেছি।

পবিত্র কুরআনের ওপরোদ্ধৃত বাণী থেকে আমরা জানতে পারলাম যেহেতু সৃষ্টিকর্তা ইচ্ছাময় এবং সর্বশক্তিমান অতএব তাঁর ইচ্ছা এবং 'হও' এই নির্দেশের পরিণতি হিসাবেই এই বিশ্ব নিখিল সৃষ্টি হয়েছে এবং সৃষ্টি হয়ে চলেছে, যতদিন তৎকর্তৃক 'হও' নির্দেশ প্রত্যাহৃত হয়নি ততদিন এই সৃষ্টির কাজ চলতে থাকবে।

এবারে আসুন, পৃথিবীর নামকরণ সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করি। ইসলামী পরিভাষায় পৃথিবীকে বলা হয়— 'আলম'। বহুবচনে অর্থাৎ অসংখ্য গ্রহ উপগ্রহাদি সমন্বিত গোটা বিশ্বনিখিলকে বলা হয় 'আলামীন'। আলম শব্দের ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্য হল, 'যদ্দারা এর সৃষ্টিকর্তাকে জানতে পারা যায়।"

বলাবাহুল্য, এই বিশ্বনিখিল (বিশ্বনিখিলের সৃষ্টি-নৈপুণ্য, বিন্যাস, পরিচালন, পরিপোষণ, সৌন্দর্য, বিশালত্ব, এর নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি) ছাড়া স্রষ্টাকে জানার আর কোনও উপায়ই নেই। আর সেই কারণেই এর নাম রাখা হয়েছে— 'আলম' বা 'আলামীন'। লক্ষণীয় যে, বিশ্বস্রষ্টা যে উদ্দেশ্যে বিশ্বনিখিলের সৃষ্টি করেছেন বলে (অর্থাৎ তাঁর অস্তিত্বের কথা জানানো) ইতোপূর্বে আমরা জানতে পেরেছি 'আলম' নামটি সেই উদ্দেশ্যের সঙ্গে কত সুন্দরভাবে সুসামঞ্জস্য এবং সঙ্গতিপূর্ণ সেকথা ভাবতেই মন এক অনির্বচনীয়ভাবে বিভোর হয়ে ওঠে।

আল্লাহ কিভাবে এই বিশ্বনিখিলের সৃষ্টি করেছেন পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে সেকথা পুনঃ পুনঃ নানা ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উক্ত বর্ণনাসমূহের একটি মাত্রের সার-সংক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে!

www.pathagar.com

এখন থেকে প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রমুখাৎ ঘোষিত হয়েছিল, যিনি আকাশ ও পৃথিবীকে (আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থকে) 'প্রাকৃতিক নিয়মে' সৃষ্টি করেছেন আমি নিশ্চিতরূপে আমার মুখ (সমগ্রমনোযোগ)-কে একনিষ্ঠভাবে সেই মহান সত্তার দিকে প্রত্যাবর্তিত করলাম। — আল কুরআন।

এখানে 'প্রাকৃতিক নিয়ম' বলার তাৎপর্য হলো 'সৃষ্টি করেছেন' বোঝাতে আরবি ভাষায় সাধারণত 'খালাক' শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এখানে 'ফাতারা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এই ব্যবহারের একটি কারণ হলো, ফাতারা শব্দে বোঝায় প্রথম বা নতুন সৃষ্টি, অর্থাৎ অনস্তিত্ব থেকে বিনা উপকরণ-উপাদানে কোনও কিছুকে অস্তিত্ব দান করা। আর 'ফেতরাৎ' শব্দের অর্থ হল 'প্রকৃতি'। ফাতারা শব্দের দ্বারা সেই ফেতরাৎ বা প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

এ থেকে বুঝতে পারা সহজ যে, প্রাকৃতিক নিয়মের বিদ্যমানতা তথা বিশ্ব-সৃষ্টি এবং পরিচালনার মূলে প্রাকৃতিক নিয়ম যে কার্যকরী রয়েছে আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রমুখাৎ বিশ্ববাসীকে সেকথা জানিয়ে দেয়া হয়েছিল।

আশাকরি ধর্মীয় বিধানোক্ত আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি কল্প-কাহিনীসমূহ এবং পবিত্র কুরআনের এই ঘোষণা এ উভয়ের মধ্যে কোনটা সত্য, বিশ্বাসযোগ্য এবং বাস্তবসম্মত সেকথা গভীরভাবে ভেবে দেখা হবে।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলা প্রয়োজন যে, আদি প্যাগানিজম (Primitive Paganism)-ই যে পরবর্তী সময়ে উন্নত প্যাগানিজম (advanced paganism)-এ পরিণত হয় এবং 'ধর্ম' নামে আখ্যায়িত হতে থাকে এবং আজও আখ্যায়িত হয়ে চলেছে। এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংক্ষেপে সেকথা আলোচনা করা হয়েছে।

প্রকৃতির কোলের শিশু মানবদের জড়তা-গ্রস্থ মন-মানসই যে ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব, গাছ-বৃক্ষ, চন্দ্র-সূর্য প্রভৃতিকে মানুষের ইষ্টানিষ্ট, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতির নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রক তথা সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী বলে সাব্যস্থ করে আদি প্যাগানিজমের জন্ম দিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে তারই উন্নত পর্যায় (advanced paganism) এ উপনীত হওয়ার পরে এমনকি অদ্যাপিও যে কোনও কোনও সমাজ কর্তৃক সূর্যকে সর্বপাপ হরনকারী, মুক্তিদাতা, সেরা উপাস্য, কশ্যপ মুনির ঔরস এবং অদিতির গর্ভজাত বলে বিশ্বাস পোষণ ও পূজার্চনা চালিয়ে যাওয়ার কাজ অব্যাহত রাখা হয়েছে এবং তার বাস্তব নিদর্শন

www.pathagar.com

যে আমাদের চোখের সম্মুখেই রয়েছে ইতোপূর্বের 'সূর্যপূজা দেশে দেশে' শীর্ষক নিবন্ধে সেকথা আমরা তুলে ধরেছি।

'সূর্যপূজা দেশে দেশে' সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর সুধী পাঠকবর্গের মনে আল্লাহর বিধান সূর্য সম্পর্কে কি বলেছে সেকথা জানার জন্য একটা আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। অগত্যা পবিত্র কুরআনোর সে সম্পর্কীয় বাণীসমূহের মধ্য থেকে দু'টি মাত্রের হুবহু বঙ্গানুবাদ নিম্নে তুলে ধরা হলো :

"দিবা রাত্রি, চন্দ্র-সূর্য আল্লাহর (অস্তিত্ব, সৃষ্টি-নৈপুণ্য প্রভৃতির) নিদর্শনসমূহের অন্যতম। তোমরা চন্দ্র-সূর্যকে সেজদা (প্রণিপাত) করিওনা— যিনি এ উভয়কে সৃষ্টি করেছেন সেই আল্লাহকে সেজদা কর— যদি তোমরা প্রকৃতই তাঁর দাস (এবাদাতকারী) হতে চাও।" — আল কুরআন

"... (ভেবে দেখ) চন্দ্র-সূর্যকেও (আল্লাহ্) তোমাদের স্বার্থে বিশেষ এক রীতিতে আবর্তিত করেছেন। রাত্রি ও দিন তোমাদেরই স্বার্থে সৃষ্টি হচ্ছে। মোটকথা তোমাদের যা কিছু চাহিদা তিনি তার সব কিছুই মিটিয়েছেন। যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামত রাজি গণনা করতে চাও— কিছুতেই সক্ষম হবে না। তা অসংখ্য।" — আল কুরআন

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, শুধু এই দু'টি বাণী-ই নয় এবং শুধু সূর্য সম্পর্কেই নয়— ইতোপূর্বে পবিত্র কুরআনের যেসব বাণীর উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়েছে এবং পরবর্তী আলোচনায় তুলে ধরা হবে সেগুলোর প্রতি একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে এটা সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারা যাবে যে প্যাগানিজমের উদ্ভট-অযৌক্তিক ধারণা-বিশ্বাস থেকে মানুষের মন-মানসকে মুক্ত করে সেখানে আল্লাহর একত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব এবং সার্বভৌমত্বের ধারণা-বিশ্বাসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন ও ওসবের বাস্তবায়নের কাজে উদ্বুদ্ধ-অনুপ্রাণিত করে তোলার উদ্দেশ্যেই সেগুলোকে অবতীর্ণ করা হয়েছে।

এ সম্পর্কে যথাস্থানে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। সুতরাং আল্লাহর বিধান অবতারণের এই উদ্দেশ্যটির কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে পরবর্তী নিবন্ধের শুরু করা যাচ্ছে।

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য

নর এবং নারী সৃষ্টিই যে যথাক্রমে 'গর্ভধারণ' এবং 'সন্তানোৎপাদনের' উদ্দেশ্য ধর্মীয় বিধান থেকে ইতোপূর্বে সেকথা আমরা জানতে পেরেছি। অতঃপর

www.pathagar.com

আসুন এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের অভিমত কি সেকথা জানতে চেষ্টা করি ঃ পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে মানব-সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, নিশ্চয়ই আমি জ্বিন ও ইনসান জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।' — আল কুরআন

জ্বিন জাতি আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয় বলে এখানে শুধু 'ইনসান' জাতির কথাই বলা হবে। প্রথমে ইনসান শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বলে প্রথমে 'ইনসান' এবং পরে 'ইবাদত' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্য তুলে ধরা হবে।

'উন্‌স' থেকে ইনসান শব্দটির উদ্ভব। উন্‌স অর্থ— প্রেম, ভালবাসা প্রভৃতি মানুষকে ইনসান পদবী দেয়ার তিনটি অথবা তার যেকোনও একটি কারণ রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা। এক ঃ স্বামী-স্ত্রীর প্রেম বা ভালবাসা থেকে মানুষের সৃষ্টি হয়ে থাকে। দুই ঃ আল্লাহ ভালোবেসে (বা ভালোবাসার জন্য) মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিন ঃ প্রেম ও ভালোবাসার মাধ্যমে এক সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ গড়ার যোগ্যতা এবং সামর্থ মানুষের মধ্যে রয়েছে।

এখানে স্মর্তব্য যে, ধর্মীয় বিধানের অভিমত হলো 'মনু'র সন্তান হিসাবে মানুষকে মানুষ বা 'মানব' বলা হয়ে থাকে। ইনসান এবং মানব এই শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য অনুধাবণ করা হলেই এদের কোনটি সুন্দর, উপযোগী এবং গ্রহণযোগ্য সেকথা অনায়াসে বুঝতে পারা যাবে বলে মনে করি।

অতঃপর 'এবাদত' শব্দটির প্রতি লক্ষ্য করা যাক। এই শব্দটির তাৎপর্য খুবই ব্যাপক, গভীর এবং গুরুত্বপূর্ণ। অতএব এই পুস্তকের ক্ষুদ্র পরিসরে তা তুলে ধরা সম্ভব নয়।

অতি সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, এই শব্দটির মোটামুটি অর্থ হলো— 'একমাত্র আল্লাহর গোলামী বা দাসত্বের কাজে একনিষ্ঠভাবে নিয়োজিত থাকা।' এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন ঃ সৃষ্টির সেরা জীব হলেও পৃথিবীতে মানুষকেই সর্বাধিক দুর্বল এবং সর্বাধিক অসহায় করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

অবশ্য এই দুর্বল এবং অসহায় করে সৃষ্টি করার পশ্চাতে বিরাট কল্যাণ এবং মঙ্গল নিহিত রয়েছে। এখানে তা নিয়ে আলোচনার সুযোগ নেই বিধায় চুপ থাকতে হলো। সৃষ্টিকর্তা জানতেন যে, এই দৌর্বল্য এবং অসহায়তার কারনে সারাটি জীবন মানুষকে পর-নির্ভরশীল এবং পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে কাটাতে হবে।

এই নির্ভরশীলতার কারণে অপকারীকে ভয় করা এবং উপকারীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রশ্নও যে প্রকট হয়ে দেখা দেবে নিশ্চিতরূপেই সেকথা বিশ্ব-স্রষ্টা অপরিজ্ঞাত ছিলেন না।

www.pathagar.com

নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং প্রকৃতপক্ষে শ্রদ্ধা এবং ভীতির পাত্র কে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে মানুষ যে ওপরোক্ত অপকারী এবং উপকারীদের প্রতি ভয় বা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে গিয়ে হীনমন্যতার করুণ শিকারে পরিণত হবে এবং নিজেদের একান্তরূপেই তাদের কৃপার পাত্রে পরিণত করবে, ফলে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যে নিদারুণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যাবে সেকথাও বিশ্বস্রষ্টার অজানা ছিল না।

তাই তিনিই যে একমাত্র প্রভু ও উপাস্য এবং একমাত্র তাঁকেই যে শ্রদ্ধা ও ভয় করতে হবে, আর একমাত্র তাঁরই দাসত্ব বা গোলামি করার মাধ্যমেই যে শ্রেষ্ঠত্ব, সাফল্য, মর্যাদা ও কল্যাণ লাভ সম্ভব এবাদাত শব্দের দ্বারা সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সেকথাই বলে দেয়া হয়েছে। এর পরও আলোচনা প্রসঙ্গে মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য তুলে ধরতে হবে। অতএব আসুন, এই বিশ্ব-নিখিলের সৃষ্টি ও পরিচালনার পশ্চাতে কোনও সুষ্ঠু ও বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা আছে কি না অতঃপর আমরা সেকথা জানতে চেষ্টা করি।

পরিকল্পনা

ছোট হোক আর বড় হোক পরিকল্পনা ছাড়া কোনও কাজই যে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত ও সম্পাদিত হতে পারে না এ অভিজ্ঞতা আমাদের বাস্তব, প্রত্যক্ষ এবং বংশানুক্রমিক। সাধারণত ছোট এবং দৈনন্দিন কাজের জন্য লিখিত কোনও পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয় না এ কথা সত্য, কিন্তু কাজে হাত দেয়ার আগে পূর্ব-প্রস্তুতি ছাড়াই মনে মনে একটা পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়ে যায়।

শুধু পরিকল্পনা অভাবে বহু কাজ ব্যাহত-বিঘ্নিত এমনকি শেষপর্যন্ত পরিত্যক্ত হতেও আমরা অহরহই দেখে আসছি। পক্ষান্তরে পরিকল্পনা নির্ভুল ও নিখুঁত হলে কাজটিও যে যথাসময়ে এবং যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়ে থাকে তার বহু বাস্তব প্রমাণও আমাদের চোখের সম্মুখে রয়েছে।

এমতাবস্থায় জড়-জীব নির্বিশেষে কোটি কোটি সৃষ্টি-সম্ভারে পরিপূর্ণ এ বিশাল বিশ্বের সৃষ্টি, বিন্যাস, পরিপোষণ, পরিচালনা প্রভৃতি কাজগুলো আবহমানকাল যাবত বিনা পরিকল্পনায় আপনাপনি এমন সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে চলে আসছে এটা কি করে সম্ভব হতে পারে?

যারা এর পশ্চাতে কোনও পরিচালক এবং কোনও পরিকল্পনা থাকার কথা স্বীকার করেন না— অনন্তকালব্যাপী সৃষ্টির এ সুবিশাল কারখানাটি আপনাপনি চলছে অথবা একে প্রাণহীন, প্রজ্ঞাহীন অন্ধ-প্রকৃতির এক অদ্ভুত খেয়াল বলে মনে করেন তাদের কথা স্বতন্ত্র। তবে আমরা অর্থাৎ— এই ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানুষেরা

www.pathagar.com

যেদিকে তাকাই সেদিকেই দেখতে পাই যে, প্রতিটি কাজই এক নিখুত ও নির্ভুল পরিকল্পনানুযায়ী সম্পাদিত হয়ে চলেছে।

আমাদের মত ক্ষুদ্র-বুদ্ধি মানুষের কথা ছেড়ে অতঃপর চলুন এই পরিকল্পনা থাকা বা না থাকা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন কি বলছে তা জানার চেষ্টা করি ঃ

"তোমরা কি এটাই ধারণা করে বসেছ যে, আমি তোমাদের উদ্দেশ্যবিহীন ও অর্থহীন করে সৃষ্টি করেছি? তোমরা কি আবার আমার কাছে ফিরে আসবে না? নিখিল সৃষ্টিজগতের প্রকৃত মালিক আল্লাহ অনর্থক ও অহেতুক কিছু করার স্তর থেকে অনেক উর্ধ্বে রয়েছেন, পবিত্র আরশে অধিষ্ঠিত মহান প্রভু ছাড়া আর কোনও উপাস্য নেই।" — আল কুরআন ২৩ ঃ ১১৪-১১৫

"তারা কি আপন মনে এই ব্যাপারটি ভেবে দেখে না যে, এই আকাশ ও পৃথিবী এবং এর ভেতরের সবকিছু আল্লাহ অহেতুক সৃষ্টি করেন নি? অবশ্যই এসব তাঁর অর্থপূর্ণ সৃষ্টি এবং এগুলোর জন্য তিনি সময়ও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আসল কথা হলো, অধিকাংশ মানুষই তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে যে দেখা হবে এ কথাটি অস্বীকার করেছে।" — আল কুরআন ৩০ ঃ ৮

"আমি আকাশ, পৃথিবী ও এর ভেতরের বস্তুরাজি খেল-তামাসার জন্য সৃষ্টি করিনি। আমি বিশেষ বিজ্ঞতার সঙ্গে অশেষ কল্যাণকর করে এসব সৃষ্টি করেছি। কিন্তু অধিকাংশ লোক এই সত্যটির খবর রাখে না।

— আল কুরআন ৪৪ ঃ ৩৮-৩৯

"আর তিনি আকাশ সমুন্নত করেছেন আর নভোমণ্ডলের সব কিছু সুনিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য সঠিক পরিমাপ যন্ত্র (মীযান) বহাল করেছেন।

— আল কুরআন ৫৫ ঃ ৭-৮

তিনি আল্লাহ যিনি আকাশ সমুন্নতভাবে গড়ে খুঁটি ছাড়াই নভোমণ্ডল সুস্থির রেখেছেন এবং তোমরাও এই শিল্প-নৈপুণ্য নিরীক্ষণ করছো।

— আল কুরআন ৩০ ঃ ১০

তুমি আররহমান (আল্লাহ)-এর সৃষ্টির মধ্যে কোথাও কোনও অসামঞ্জস্য দেখতে পাবে না। ঠিক আছে, তুমি চোখ তুলে ভালভাবে তাকিয়ে দেখ, একবার নয়, বারংবার দেখ, কোথাও কোনও ত্রুটিবিচ্যুতি দেখতে পাচ্ছো? তুমি এভাবে একের পর এক করে চোখ ফিরিয়ে দেখতে থাক, দেখতে দেখতে তোমার দৃষ্টি অবস ও আচ্ছন্ন হলেও কোথাও কোনও ত্রুটি খুঁজে পাবে না।

— আল কুরআন ৬৭ ঃ ৩-৪

"সেই প্রতিপালকই প্রত্যেক বস্তু ঠিক ঠিকভাবে সুন্দর ও সুসামঞ্জস্য করে গড়েছেন। আর তিনি প্রত্যেকের জন্য একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তারপর তার জন্য (জীবন ধারনের) পথ খুলে দিয়েছেন।"

— আল কুরআন ৭৮ ঃ ৩-৪

www.pathagar.com

"সেই প্রতিপালকই তোমাকে সৃষ্টি করে সঠিক রূপদান করেছেন। তারপর তোমার ভেতর ও বাইরের সমতা ও সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। ঠিক যেরূপ আকৃতি-প্রকৃতি হওয়া উচিত সেভাবেই সাজিয়ে তুলেছেন।

— আল কুরআন ৭৬ ঃ ৮

আশা করি আর অধিক উদ্ধৃতি দেয়ার প্রয়োজন হবে না। এই বিশ্ব-নিখিলের সবকিছুই যে সুপরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে সেকথা বুঝতে একটু অভিনিবেশ সহকারে চারদিক দৃষ্টিপাত করাই যথেষ্ট। পবিত্র কুরআনের ওপরোদ্ধৃত বাণীসমূহও সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে সেই কথাই ঘোষণা করছে।

অতঃপর আর একটি মাত্র প্রমাণ উপস্থাপিত করে প্রসঙ্গের ইতি টানছি। ইতোপূর্বের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, এ বিশ্ব-সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ শুধু বলেছিলেন 'হও' আর অমনি হয়ে গিয়েছে।

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, সৃষ্টির পূর্বে যেখানে আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই ছিল না তখন এই নির্দেশ তিনি কাকে দিয়েছিলেন? অর্থাৎ— কাকে লক্ষ্য করে তিনি 'হও' বলেছিলেন?

এ প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তরই হতে পারে, আর তা হলো— তাঁর অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডারে অন্য সবকিছুর সঙ্গে বিশ্ব নিখিলের পরিকল্পনাটিও বিদ্যমান ছিল। সেই পরিকল্পনাকেই 'হও' বলে বাস্তবায়িত হওয়ার নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন। আর সেই নির্দেশানুযায়ী পরিকল্পিত কাজগুলোর যখন যেটা হওয়া প্রয়োজন সেভাবেই সেটা হয়ে চলেছে এবং যতদিন তাঁর এ নির্দেশকে তিনি প্রত্যাহার না করেছেন ততদিন হতেই থাকবে।

কোনওরূপ ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ যাতে না থাকে সেজন্যে পরিশেষে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই কথাটুকু বলেই শেষ করছি যে— আল্লাহ অসীম, অনন্ত এবং সর্বজ্ঞ। সুতরাং তিনি স্থান এবং কালের উর্ধ্বে। অর্থাৎ— ভূত এবং ভবিষ্যৎ বলতে তাঁর কাছে কিছুই নেই। অতীতে যা কিছু ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে ঘটতে থাকবে তার সব কিছুই তাঁর কাছে বর্তমান রয়েছে। এমতাবস্থায় এই পরিকল্পনার কোনও প্রয়োজনই যে তাঁর নেই— থাকতে পারে না সেকথা সহজেই অনুমেয়।

মোটকথা, মানুষ যাতে গড্ডলিকাপ্রবাহে গা ছেড়ে না দিয়ে তাদের পার্থিব জীবনের কাজসমূহ সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে সম্পাদন করার শিক্ষা, প্রেরণা এবং পথ-নির্দেশ লাভ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই এ অনবদ্য উদাহরণটি তাদের সম্মুখে দেদীপ্যমান করে তোলা হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রস্তাবনা

আমরা জানি, প্রতিটি কাজ বিশেষ করে যেসব কাজ জটিল, গুরুত্বপূর্ণ এবং স্থায়িত্বশীল সেসব কাজে জ্ঞানী ও যোগ্য ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করা ও তাদের অভিমত জানার প্রয়োজন হয় এবং সে জন্য সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও সংশ্লিষ্ট কাজটির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতিকে প্রস্তাবনার আকারে উক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের কাছে উপস্থাপিত করা হয়।

বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে যে প্রস্তাবনাটির কথা বলা হবে তা হলো পৃথিবীতে মানব-সৃষ্টির প্রস্তাবনা; আর এর প্রস্তাবক হলেন স্বয়ং বিশ্বপতি আল্লাহ। সুতরাং এই প্রস্তাবনার তাৎপর্য, গুরুত্ব এবং মর্যাদা যে কত বেশি সেকথা সহজেই অনুমেয়।

এখানে প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক যে, যেহেতু আল্লাহ সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান, স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রভৃতি গুণের অধিকারী অতএব তাঁর জন্য এ সবের কোনও প্রয়োজন থাকতে পারে না, থাকা সম্ভবই নয়। এমতাবস্থায় তিনি কেন এই প্রস্তাবনার উত্থাপন করতে গেলেন?

আসলে পবিত্র কুরআন এবং তৎপূর্ববর্তী প্রতিটি বিধানকেই তিনি মানুষের উদ্দেশে এবং মানুষের প্রয়োজনে অবতীর্ণ করেছেন। এই সব বিধানের প্রতিটি আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, উপমা-উদাহরণ এমনকি প্রতিটি বাক্যই যে মানুষের মনে প্রেরণা সৃষ্টি এবং শিক্ষা ও পথ-নির্দেশ দানের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ করা হয়েছে ওসব গ্রন্থের পাঠক মাত্রেরই সেকথা জানা রয়েছে।

অতএব মানুষই যে এই প্রস্তাবনার লক্ষ্য-বস্তু অর্থাৎ— মানুষকে শিক্ষা ও পথ-নির্দেশ দান এবং তার মনে প্রেরণা সৃষ্টিই যে এই প্রস্তাবনার উদ্দেশ্য পাঠকবৃন্দের সেকথাও অবশ্যই জানা রয়েছে।

কিন্তু ওসব পাঠকদের জানাই যথেষ্ট নয়। কেননা, আল্লাহর বিধান সর্বজনীন। অতএব বিশ্বের সকল মানুষেরই এতে সমান অংশ ও অধিকার রয়েছে। বিশেষ করে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই প্রস্তাবনাটি হলো পৃথিবীতে মানব সৃষ্টির প্রস্তাবনা। অতএব স্বাভাবিক নিয়মেই যে এই প্রস্তাবনার মধ্যে মানব-সৃষ্টির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার পথ-পদ্ধতি, উপায়-উপকরণ প্রভৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে সেকথা বলাই বাহুল্য।

এমতাবস্থায় বিশ্বের প্রতিটি মানুষেরই এটা জানা এবং তদনুযায়ী পদক্ষেপগ্রহণ করা উচিত। অন্যথায় মানবসৃষ্টির গোটা উদ্দেশ্যটাই যে নিদারুণভাবে ব্যর্থ-ব্যাহত এমনকি দুর্দান্ত ক্ষতির কারণেও পরিণত হতে পারে সেকথা বুঝতে অনেক বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন হয় না।

www.pathagar.com

অতএব যাঁরা পবিত্র কুরআন বা তৎপূর্ববর্তী বিধানসমূহের সাথে পরিচিত নন এবং সেই পরিচয় লাভের সুযোগ যাঁদের নেই তাঁদের অবগতি এবং ইতি-কর্তব্য নির্ধারণের জন্য এই প্রস্তাবনাটি প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে।

তবে প্রস্তাবনাটিকে তুলে ধরার পূর্বে একটি বিষয়ের মীমাংসা হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি। আর তা হলো— আসলে এই প্রস্তাবনা এবং তাকে আল্লাহর বিধানের অন্তর্ভুক্ত করার আদৌ কোনও প্রয়োজন ছিল কি না।

এই প্রশ্নের একটি উত্তর হলো— পবিত্র কুরআনের পাঠকমাত্রেরই একথা বেশ ভালভাবেই জানা রয়েছে যে, তাতে অলীক, অযৌক্তিক, অবিশ্বাস্য বা বিশেষভাবে গুরুত্ববহ নয় এমন একটি বাক্যও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

অতএব এই প্রস্তাবনাটিও যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যবহ না হয়ে পারে না সে বিশ্বাস অবশ্যই তাঁদের রয়েছে।

এই প্রশ্নের অন্য যে উত্তরটি রয়েছে তাকে সকলশ্রেণীর মানুষের কাছে বোধগম্য করে তোলার জন্য তিনটি ভাগে বিভক্ত করে বলা যাচ্ছে যে—

ক) যেহেতু প্রতিটি প্রস্তাবনায়ই সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও সংশ্লিষ্ট পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বিদ্যমান থাকে এবং

খ) যেহেতু কাজটি, যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত বাস্তবায়নকারী বা বাস্তবায়নকারীদের এই প্রস্তাব অর্থাৎ তার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য প্রভৃতিকে সম্মুখে রেখে যথাযোগ্য নিপুণতা ও সতর্কতার সাথে কাজ চালিয়ে যেতে হয় অন্যথায় কাজটির যথাযোগ্য বাস্তবায়ন তো দূরের কথা সবকিছু ভণ্ডুল ও পণ্ডশ্রমে পরিণত হওয়াই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়।

এমতাবস্থায় অন্তত কাজটি সমাধা না হওয়া পর্যন্ত প্রস্তাবনাটির সাথে সংশ্লিষ্ট কাজটির যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে সে কথাকে কোনওক্রমেই অস্বীকার করা যেতে পারে না। বলা বাহুল্য এ থেকে কাজের সাথে প্রস্তাবনার সম্পর্ক যে কত ঘনিষ্ঠ সেকথা বুঝতে পারা যাচ্ছে।

গ) অতঃপর এই প্রস্তাবনাকে আল্লাহর বিধানের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে—

যেহেতু এই প্রস্তাবনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য প্রভৃতির বাস্তবায়নের কাজ মানব-সৃষ্টির সাথে সাথে শুরু হলেও অদ্যাপি তা অব্যাহতভাবে চালু রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও অনির্দিষ্ট কাল ধরে চলতে থাকবে অতএব যতদিন এ কাজ চলতে থাকবে ততদিন এই প্রস্তাবনার গুরুত্বও বিদ্যমান থাকবে এবং এই প্রস্তাবনাকে সম্মুখে রেখেই কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

www.pathagar.com

এ থেকে বুঝতে পারা সহজ যে, যেহেতু এই প্রস্তাবনা সংক্রান্ত ঘটনাটি মানব-সৃষ্টির পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল অতএব এই ঘটনার বিবরণকে আল্লাহর বিধানের অন্তর্ভুক্ত করা না হলে মানবেতিহাসের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় চির অনুদ্‌ঘাটিত ও চিরঅজানা থেকে যেতো।

ফলে এই প্রস্তাবনা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিবরণাদির মধ্যে যেসব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, শিক্ষা এবং পথ-নির্দেশ রয়েছে তা থেকেও মানবজাতিকে চিরবঞ্চিত থাকতে হতো। এই ঘটনা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কতিপয় ঘটনার বিবরণকে কেন আল্লাহর বিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আশাকরি এ থেকে তা বুঝতে কারো অসুবিধা হবে না।

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, যেহেতু এই প্রস্তাবনার বাস্তবায়ন অনির্দিষ্ট কালব্যাপী চলতে থাকবে এবং যেহেতু প্রস্তাবনাটিকে সম্মুখে রেখেই সে কাজ চালিয়ে যেতে হবে অতএব অন্তত যতদিন কাজটি সমাধা না হয়েছে ততদিন প্রস্তাবনাটিকে সংরক্ষিত করার অপরিহার্য প্রয়োজন রয়েছে। বলা বাহুল্য, আল্লাহর বিধানের অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে সেই সংরক্ষণের কাজটিই সমাধা করা হয়েছে। আল্লাহর বিধান ছাড়া এই সংরক্ষণের সুন্দর, বিশ্বাসযোগ্য এবং স্থায়ীত্বশীল মাধ্যম যে আর হতেই পারে না আশাকরি সেকথা খুলে বলার কোনও প্রয়োজন হবে না।

সুধী পাঠকবর্গকে এই পটভূমিকার কথা স্মৃতিতে জাগরূক রাখার অনুরোধ জানিয়ে অতঃপর প্রতিশ্রুত প্রস্তাবনাটিকে নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে। এ জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট বাণীটির হুবহু বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করবো এবং পরে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাও প্রদান করবো।

.... এবং (হে নবী) যখন আপনার প্রতিপালক (আল্লাহ্) ফেরেশতাদের বলেছিলেন— নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে (আমার) খলিফাহ্ (প্রতিনিধি) সৃষ্টি করবো (তখন) তারা বলেছিল— (হে আল্লাহ!) তুমি কি এমন সৃষ্টি করবে যে তারা সেখানে ফাসাদ (ঝগড়া-বিবাদ) এবং শোনিত-পাত করবে?"

"বরং আমরা-ই তো তোমার প্রশংসাকীর্তন এবং পবিত্রতা ঘোষণা করে থাকি (অতএব মানব-সৃষ্টির আর কি প্রয়োজন থাকতে পারে?) তখন (আপনার প্রতিপালক আল্লাহ্ ফেরেশতাদের) বলেছিলেন— নিশ্চয়ই তোমরা যা অবগত নও আমি তা পরিজ্ঞাত রয়েছি।" — আল কুরআন, বাকারা, ৪ রুকু।

মনে রাখা প্রয়োজন যে এটা বাক্যাংশমাত্র। অতএব মানব-সৃষ্টি সংক্রান্ত ঘটনাবলীর অতি সামান্য অংশই এতে প্রতিভাত হয়েছে। পরবর্তী আলোচনায় একে একে সে সব ঘটনার বিবরণ তুলে ধরা হবে। এ বাক্যাংশ থেকে যে বিষয়গুলো সুস্পষ্টরূপে জানতে পারা যাচ্ছে মোটামুটিভাবে সেগুলো হলো ঃ

www.pathagar.com

ক) আল্লাহ্ ফেরেশতাদের (খুব সম্ভব এই ঘটনার সাথে যে কতিপয় ফেরেশতার সংশ্লিষ্ট থাকা স্বাভাবিক তাদের) কাছে তাঁর মানবসৃষ্টির এই প্রস্তাবনাকে উপস্থাপিত করেছিলেন।

খ) প্রস্তাবিত মানবজাতিকে পৃথিবীতে আল্লাহর 'প্রতিনিধি' (খলিফাহ) হিসাবে সৃষ্টি করা হবে।

গ) প্রস্তাবিত মানবজাতি পৃথিবীতে ঝগড়া-ফাসাদ ও রক্তপাত ঘটাবে এ আশঙ্কায় সংশ্লিষ্ট ফেরেশতারা মানব-সৃষ্টিতে তাদের আপত্তি জ্ঞাপন করেছিলেন।

ঘ) এ আপত্তি জ্ঞাপনের বেলায় তাঁরা আল্লাহ্র প্রশংসাকীর্তন ও পবিত্রতা ঘোষণার কাজকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং সে কাজে তাঁরা নিজেরা রত রয়েছে বলেই মানবসৃষ্টির কোনও প্রয়োজনীয়তা থাকার কথা তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন না।

ঙ) ফেরেশতাদের এ আপত্তির উত্তরে আল্লাহ্ বলেছিলেন— "(হে ফেরেশতাগণ!) তোমরা যা অবগত নও আমি তা পরিজ্ঞাত রয়েছি।"

মানুষের প্রয়োজনে এবং মানুষের উদ্দেশ্যেই যে পবিত্র কুরআন এবং তৎপূর্ববর্তী বিধানসমূহ অবতীর্ণ করা হয়েছে ইতোপূর্বে সেকথা আমরা জানতে পেরেছি। মানবসৃষ্টির এ প্রস্তাবনার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যও যে তাই ইতোপূর্বে সেকথাও বলা হয়েছে।

ওপরোদ্ধৃত এ বাক্যাংশটি পাঠ করার পরে কারো কারো মনে এই প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, আল্লাহ্র সকাশে জ্ঞান-বুদ্ধি, প্রজ্ঞাপ্রতিভা শক্তি-সামর্থ প্রভৃতি সর্বদিক দিয়েই ফেরেশতারা নগণ্য ও অকিঞ্চিৎকর। এমতাবস্থায় তিনি কেন তাদের কাছে এ প্রস্তাবনার উত্থাপন ও তাদের মতামত শ্রবণ করতে গেলেন?

এটাও যে মানুষের প্রয়োজনেই করা হয়েছে একটু চিন্তা করলেই সুধী পাঠকবর্গ সেকথা বুঝতে পারবেন বলে আশা করি। তবু ইঙ্গিত স্বরূপ বলা যাচ্ছে—

জন্মগতভাবেই সর্বাধিক দুর্বল এবং সর্বাধিক অসহায় বিধায় মানুষ যে একান্তরূপেই পরনির্ভরশীল এবং পরস্পর নির্ভরশীল সেকথা আজ আমরা জানতে পেরেছি। সামাজিক জীব হিসারে একক এবং বিচ্ছিন্ন জীবন যে মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় এমনকি সে অবস্থায় মানুষের অস্তিত্বই যে টিকে থাকতে পারেনা সেকথাও আজ আর আমাদের অজানা নয়।

এসব নিয়ে চিন্তা করলে মানবজীবন পারস্পরিক ঐক্য-সংহতি ও সৌহার্দ-সম্প্রীতির যে কত বেশি প্রয়োজন সেকথা অনায়াসে বুঝতে পারা যায়। আর পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান, মত বিনিময়, পরামর্শ, পরমত-সহিষ্ণুতা,

www.pathagar.com

পারস্পারিক মর্যাদাবোধ প্রভৃতি ছাড়া যে ঐক্য-সংহতি এবং সৌহার্দ-সম্প্রীতি গড়ে উঠতে পারে না সেকথা বুঝতে পারাও আজ আর কঠিন নয়।

কিন্তু এ পথে বাধাবিঘ্নও প্রচুর। সমাজে যিনি বা যারা জ্ঞান-বুদ্ধি, প্রজ্ঞা-প্রতিভা, অর্থ-বিত্ত, শক্তি-সামর্থ প্রভৃতির দিক দিয়ে বড় স্বাভাবিক নিয়মেই একাজে তাদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে আসা উচিত হলেও প্রায় সকলক্ষেত্রেই বড়ত্বের অহমিকা সেই ঔচিত্য বোধকে দুর্বল এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে নির্মূলও করে তোলে। ফলে বিরোধ-বিক্ষোভ ও সংঘাত-সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে শান্তির মূলে কুঠারাঘাত করে। আল্লাহ্ অসীম অনন্ত জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও শক্তিসামর্থের অধিকারী হয়েও তাঁর সকাশে অতি নগণ্য ফেরেশতাদের কাছে তাঁর এই প্রস্তাবনার উত্থাপন ও অভিমত শ্রবণের ঘটনা থেকে মানুষ নিজেদের মধ্যে ঐক্য-সংহতি ও সৌহার্দ-সম্প্রীতি গড়ে তোলার শিক্ষা, প্রেরণা ও পথ-নির্দেশ লাভ করবে সেটাই ছিল এই ঘটনা সংঘটনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

এ বাক্যাংশটির মাধ্যমে মানব-জাতির জন্য অন্য যেসব শিক্ষা ও পথ-নির্দেশকে দেদীপ্যমান করে তোলা হয়েছে অতঃপর "চিন্তা ও বাক্ স্বাধীনতা", "প্রতিনিধি কি এবং কেন?" "ঝগড়া ফাসাদ রক্তপাত", "স্তব-স্তুতি ও গুণগান" এ কয়েকটি উপ-শিরোনাম দিয়ে সেগুলোকে একে একে নিম্নে তুলে ধরা হবে। তবে স্থানাভাববশত এর কোনওটি নিয়েই যে বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয় বিনয়ের সাথে সেকথাও বলে রাখছি।

চিন্তা ও বাক্ স্বাধীনতা

ভেবে আশ্চর্যান্বিত হতে হয় যে, পৃথিবীতে আবির্ভাবের হাজার হাজার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে আজ মানুষ চিন্তা ও বাক স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন শুরু করেছে।

অথচ মানব-সৃষ্টিরও বহু পূর্বে যখন এই সৃষ্টির পরিকল্পনা চলছিল এবং আল্লাহ উক্ত পরিকল্পনাকে প্রস্তাবনার আকারে ফেরেশতাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছিলেন তখনই এই চিন্তা ও বাক্স্বাধীনতা থাকার কথা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছিল। বিষয়টিকে খুলেই বলা যাক—

আমরা জানি— আল্লাহ সর্বজ্ঞ। সুতরাং ফেরেশতারা যে তাঁর মানব-সৃষ্টির প্রস্তাবনায় আপত্তি উত্থাপন করবেন নিশ্চিতরূপেই সেকথা তিনি পরিজ্ঞাত ছিলেন।

পক্ষান্তরে ফেরেশতাদেরও অবশ্যই একথা জানা ছিল যে "আল্লাহ্ অনর্থক বা অপ্রয়োজনীয় কিছু বলেন না এবং করেনও না। অতএব তিনি যে মানব-সৃষ্টির ইচ্ছা করেছেন তা তিনি অবশ্যই বাস্তবে রূপায়িত করবেন। এমতাবস্থায়

www.pathagar.com

আমাদের আপত্তি কোনও কাজেই লাগবে না।" বলাবাহুল্য, একথা জানার পরেও তারা বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করেছিলেন এবং আপত্তির মাধ্যমে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেছিলেন।

এ ঘটনাটির মাধ্যমে প্রস্তাবিত মানবজাতির জন্য যে শিক্ষাকে সুস্পষ্ট করে তোলা হয়েছিল তা হলো— ফেরেশতাদের মতো প্রস্তাবিত মানবজাতিও জন্মগতভাবে চিন্তা ও বাকস্বাধীনতার অধিকারী। পার্থিব জীবনে এই মানবজাতির যারা জ্ঞানবুদ্ধি শক্তিসামর্থ্য প্রভৃতিতে বড় হবে— নেতৃত্বের অধিকার লাভ করবে তারা অবশ্যই মানুষের চিন্তা ও বাকস্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করে নেবে এবং সকলের জন্য সে সুযোগ লাভের পথও উন্মুক্ত রাখবে।

পক্ষান্তরে এই ঘটনাটির মধ্যে ছোট তথা সাধারণ মানুষদের জন্য যে শিক্ষা রয়েছে তা হলো তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করবে এবং এই চিন্তার ফল বা অভিমত স্বাধীনভাবে ও অকুতোভয়ে ব্যক্ত করবে। অভিমত গ্রাহ্য হবে না বলে বুঝতে পারলেও এই ব্যক্ত করার কাজ থেকে বিরত হবে না।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরে এবারে আসুন আমাদের এ সম্পর্কীয় বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছুটা পর্যালোচনা করি ঃ

এ সম্পর্কে অনেকেরই বাস্তব এবং তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, যেকোনও-ভাবেই যারা বড় বা নেতৃত্ব কর্তৃত্বের অধিকারী হয় তাদের প্রায় সকলেরই প্রথম ও প্রধান কাজ হলো— সাধারণ মানুষদের (তাদের ভাষায় 'বাজে লোক') পরামর্শ ও মতামতকে দম্ভের সাথে অগ্রাহ্য-অমান্য করা এবং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের চিন্তা ও বাকস্বাধীনতা নস্যাৎ করে দেয়া। আর সাথে সাথে স্তাবক বা জী হুজুরের দল সৃষ্টি করা।

আর এসব কাজের ফলে সাধারণ মানুষদের যারা নীতিহীন এবং সুযোগ-সন্ধানী তারা অতি সহজেই জী হুজুরের দলে ভীড়তে থাকে এবং স্বার্থান্ধ ও কপটের সংখ্যা বাড়াতে থাকে।

আর সাধারণ মানুষদের মধ্যে যারা বিবেক ও আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন তাঁরা তাঁদের জন্মগত অধিকারকে ফিরে পাওয়ার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই অনন্যোপায় হয়ে বিপ্লব এবং প্রথমে নিরস্ত্র এবং পরে শসস্ত্র আন্দোলনের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ফলে শুরু হয়ে যায় এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম; আর খুন-জখম, নির্যাতন-নিপীড়ন ও আর্তনাদ-আহাজারিতে আল্লাহর আকাশবাতাস বিষাক্ত ও বেদনার্ত হয়ে ওঠে; হিংসা ও নররক্তের প্লাবনে পৃথিবীর মাটি ও মানবতার ইতিহাস হয়ে ওঠে ভীষণভাবে কলুষিত ও কলঙ্কিত।

বলাবাহুল্য, এই সর্বনাশা অবস্থার সৃষ্টি-ই যাতে হতে না পারে সে জন্যই উল্লেখিত ঘটনাটির মাধ্যমে চিন্তা ও বাকস্বাধীনতার এমন একটি অনবদ্য

www.pathagar.com

উদাহরণ মানবসৃষ্টির পূর্বেই এত সুন্দরভাবে আল্লাহর বিধানের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

তবে অতীব দুঃখজনক হলো— এই অনবদ্য ইতিহাস বা ঘটনার বিবরণ আমাদের এত নাগালের কাছে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাকে জানা, অনুধাবন করা এবং তা থেকে শিক্ষাগ্রহণের কোনও প্রয়োজনই আমরা অনুভব করিনি। ফলে ভ্রান্ত-পথে চালিত হয়ে এমন এক অশান্তির দাবানল আমরা সৃষ্টি করেছি যে সেই দাবানলে আমাদের জীবনের সুখ, শান্তি, নিরাপত্তা প্রভৃতি সবকিছু দগ্ধিভূত হয়ে চলেছে।

প্রতিনিধি কী এবং কেন?

প্রতিনিধি শব্দের তাৎপর্য নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনা। কেননা, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ছাড়াও সংস্থা, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান এমনকি ব্যক্তি বিশেষের পক্ষ থেকেও প্রতিনিধি নিয়োগের ব্যবস্থা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত রয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং রাষ্ট্র-সংঘে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশের প্রতিনিধি তো রয়েছেই; তদুপরি সময়ে সময়ে বাণিজ্য প্রতিনিধি, সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি, অর্থ-বিষয়ক প্রতিনিধি, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে এবং ভিন্ন ভিন্ন কাজে প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থাও চালু রয়েছে। অতএব প্রতিনিধি বলতে কি বোঝায় সেকথা নতুন করে বোঝানোর কোনও প্রয়োজন হয় না।

তবে প্রতিনিধির যোগ্যতা এবং দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে দু'টি কথা বলার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি। আমরা জানি, যে কাজের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয় সেকাজটি নিঃসন্দিগ্ধরূপেই নিয়োগকারী ব্যক্তি বা সংস্থার। অতএব নিয়োগকারীর ইচ্ছা, প্রয়োজন এবং নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিনিধিকে যথাযথভাবে কাজটি সমাধা করতে হয়।

যেহেতু প্রতিনিধি কাজটির মালিক বা কর্তা নয়, অতএব এক্ষেত্রে তার স্বাধীনতা বা ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। তথাপি সে যদি নিয়োগকারীর ইচ্ছা, নির্দেশ ও প্রদত্ত অধিকারের প্রতি প্রয়োজনীয় গুরুত্ব ও প্রাধান্য না দিয়ে নিজের ইচ্ছা বা খেয়ালখুশিকে গুরুত্ব ও প্রাধান্য প্রদান করে তবে সেটাকে অবাধ্যতা, সীমালংঘন, স্বেচ্ছাচারিতা, ক্ষমতার অপব্যবহার প্রভৃতি এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে বিদ্রোহ বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। আর এ কাজের জন্য কিরূপ শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে দেশ-বিদেশের আইন কানুনের খবর রাখেন এমন ব্যক্তিদের সেকথা অবশ্যই অজানা নয়।

অতএব, আল্লাহর প্রতিনিধি হওয়ার অর্থই হলো— আল্লাহর বিধানে যে কাজ যেভাবে করার নির্দেশ রয়েছে নিজের ইচ্ছা, অনিচ্ছা, আবেগ, অনুরাগ,

www.pathagar.com

খেয়াল-খুশী প্রভৃতি সবকিছুকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও সততার সাথে সেকাজটি ঠিক সেইভাবে সুসম্পন্ন করা।

অবশ্য আরবি ভাষার অভিধানানুযায়ী খলিফাহ্ শব্দের আরো দু'টি বিশেষ অর্থ রয়েছে। তার একটি হলো 'যে পরে এসেছে' এবং অন্যটি 'মৃত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত পূর্ববর্তীর স্থলাভিষিক্ত।' বলাবাহুল্য, এদুটি অর্থই গভীর তাৎপর্য বহন করছে। নিম্নের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এই তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাবে বলে আশা করি।

যে পরে এসেছে

মানুষই যে এই পৃথিবীর সর্বশেষ বাসিন্দা বিভিন্ন তথ্য প্রমাণাদি থেকে সেকথা আজ প্রায় নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানতে পারা গিয়েছে। এই বিশ্বের ছোট-বড় নির্বিশেষে সবকিছুই যে মানুষের ভোগ-ব্যবহার ও অন্যান্য প্রয়োজন মিটানোর জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে— সৃষ্টিরহস্যের প্রতি একটু নজর দিলেই সেকথা বুঝতে পারা যায়। অবস্থা দৃষ্টে একথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে, বিশ্বের সবকিছুর সৃষ্টি ও যথাযথ বিন্যাস সাধনের পরে তার ভোগ-ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা তথা সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল ও সার্থক করে তোলার জন্য সবশেষে মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন ও তৎপূর্ববর্তী বিধানসমূহ থেকেও এ কথার পুরাপুরি সমর্থন পাওয়া যায়। যথাস্থানে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে। মোটকথা, খলিফাহ্ শব্দের 'যে পরে এসেছে' এই অর্থটি যে যুক্তিযুক্ত এবং গ্রহণযোগ্য সে সম্পর্কে সন্দেহের আর কোনও অবকাশই থাকছে না।

অতঃপর মানুষের 'মৃত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত পূর্ববর্তীর স্থলাভিষিক্ত' হওয়া সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, আলোচ্য বাক্যাংশটিতে যে আদম বা আদি মানবের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে অনেকের মতে মাত্র কয়েক সহস্র বছর পূর্বে এই পৃথিবীতে তার আবির্ভাব হয়েছিল।

কিন্তু আদি সৃষ্টির নানা অবস্থা অতিক্রম করে লক্ষ লক্ষ বছর পরে যে পৃথিবী বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে এমন যথেষ্ট প্রমাণই বিদ্যমান রয়েছে। এমতাবস্থায় পৃথিবীর সেরাজীব বলে অখ্যাত মানব-সৃষ্টিতে এত বিলম্ব হলো কেন এ প্রশ্ন স্বাভাবিক।

এর পূর্বে পৃথিবী যে ভীষণভাবে উত্তপ্ত ও মানুষের বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিল বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সেতথ্য ধরা পড়েছে। এই উত্তপ্ত অবস্থায় সুবৃহৎ সরীসৃপ জাতীয় এক প্রকার জীব পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকা সম্পর্কেও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

www.pathagar.com

পবিত্র হাদিসের গ্রন্থসমূহ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ঐ সুবৃহৎ সরীসৃপেরা ছিল অগ্নি থেকে সমুৎপন্ন এবং জিন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত জিন সম্প্রদায়ের পূর্বেও বানু, তাম, রম প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। জিন সম্প্রদায়ের পরে এবং আধুনিক মানবজাতির পূর্বের এই মধ্যবর্তী সময়েও যে বহু জীব পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল এবং তাদের কোনও কোনওটি যে আকারেপ্রকারে অনেকটা মানুষের মত ছিল তেমন প্রমাণের অভাব নেই।

বৈজ্ঞানিকরা আধুনিক মানবজাতির কংকালের ন্যায় সহস্র সহস্র বছরের প্রাচীন যেসব কঙ্কাল আবিস্কার করে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হন এবং ঐসব আধুনিক মানবজাতির কঙ্কাল বলে মন্তব্য করেন প্রকৃতপক্ষে ওসব কঙ্কাল ভিন্ন জাতীয় এবং আকার আকৃতিতে অনেকটা মানবসৃদশ জীবেরই কঙ্কাল।

মোটকথা, মানবসৃষ্টির পূর্বে পরস্পর দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও রক্তপাতের ফলে তারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং মানবজাতি তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে বলে, মানব জাতিকে 'খলিফাহ' বলা হয়েছে।

স্মর্তব্য যে, ফাসাদ ও রক্তপাতের আশঙ্কায় ফেরেশতারা মানবসৃষ্টিতে আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন। এবারে বুঝতে পারা গেল যে, তাদের এই আশঙ্কা অমূলক ছিলনা— ধ্বংসপ্রাপ্ত পূর্ববর্তীদের চরিত্র ও পরিণাম থেকেই তাদের মনে এই আশঙ্কা স্থান পেয়েছিল। অতএব খলিফাহ শব্দের অন্যতম তাৎপর্য যে 'মৃত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত' এ থেকে সুস্পষ্টরূপেই সেকথা জানতে পারা গেল।

তবে এখানে গভীরভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, 'পরে আসা' এবং 'মৃত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত' হওয়াটা বড়কথা নয়; বড়কথা হলো— মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি, আর প্রতিনিধির কাজ হলো— প্রভু, মালিক বা নিয়োগকারীর কর্তৃত্বাধীনে, তাঁরই অর্পিত দায়িত্ব-কর্তব্যকে তাঁরই দেয়া ব্যবস্থাপত্র বা বিধানানুযায়ী অতীব নিষ্ঠা ও সততার সাথে যথাযথরূপে পালন করে যাওয়া।

অন্যথায় অযোগ্য, দায়িত্বহীন, সীমা লঙ্ঘনকারী, স্বেচ্ছাচারী প্রভৃতি এমনকি বিদ্রোহী বলে আখ্যাত হওয়া এবং যথাযোগ্য শাস্তির পাত্রে পরিণত হওয়া যে অবধারিত বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন এবং দেশ-বিদেশের খবর রাখেন এমন ব্যক্তিদের কাছে সেকথা খুলে বলার কোনও প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি না।

তবে শাস্তির প্রশ্ন যেখানে রয়েছে সেখানে পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও সততার সাথে যথাযথভাবে কাজ সম্পাদনের পুরস্কারও যে রয়েছে সেকথা বলাই বাহুল্য। এখানে একথাও বিশেষ গুরুত্বসহকারে বলে রাখা প্রয়োজন যে, প্রতিনিধির পক্ষে

www.pathagar.com

একমাত্র নিয়োগকারীর আনুগত্য করা এবং নির্দেশ মেনে চলাই নিয়ম ও বিধি। এক্ষেত্রে অন্য কোনও শক্তি, সত্তা, বিষয়, বস্তু প্রভৃতি কোনও কিছুর সামান্যতম অধীনতা বা আনুগত্যও যে ভীষণভাবে অপরাধজনক এমনকি ক্ষেত্র ও অবস্থাভেদে বিদ্রোহাত্মক সেকথাটিকেও কোনওক্রমেই ভুলে যাওয়া চলবে না।

প্রতিনিধি বলতে কি বোঝায় এবং প্রতিনিধির দায়িত্ব কর্তব্য কী বা কী হওয়া উচিত সে সম্পর্কে প্রায় সকলেরই সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে। তথাপি একথাগুলো একান্ত বাধ্য হয়েই আমাকে বলতে হলো। কারণ, সুস্পষ্ট ধারণা থাকলেও তদনুযায়ী কর্মদ্যোগ গ্রহণের অভাব শুধু সুস্পষ্টই নয়— প্রচণ্ডও; আর তা রয়েছে প্রায় সর্বত্র এবং প্রায় সর্বক্ষেত্রে।

অতঃপর প্রতিনিধি কেন? অর্থাৎ প্রতিনিধি সৃষ্টির কারণ কী সে সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে দুকথা বলতে চাই।

প্রশ্নটি যে খুবই জটিল এবং দুচার কথায় এর উত্তর দেয়া যে সম্ভব নয় সেকথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। অগত্যা এ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণায় উপনীত হওয়ার কাজে সহায়ক হতে পারে এমন কতিপয় দিকের প্রতি সংক্ষেপে কিছুটা আলোকপাত করা যাচ্ছে ঃ

অজ্ঞতা অভিশাপ; ভ্রান্ত ধারণা বা অন্ধ-বিশ্বাস যে তার চেয়েও বড় অভিশাপ এবং অজ্ঞতাই যে অন্ধবিশ্বাসের জন্ম দেয় সেকথা ইতোপূর্বে বলা হয়েছে। আর এই অজ্ঞতা এবং অন্ধবিশ্বাস যদি নিজের সম্পর্কে হয় তবে সেটা যে কত বড় সর্বনাশা হয়ে থাকে প্যাগানিজম সম্পর্কীয় আলোচনা থেকে সে প্রমাণ আমরা পেয়েছি।

❑ সে সময়ে আমরা লক্ষ্য করেছি যে নিজেদের মান, মর্যাদা, অধিকার এবং দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে একদিকে প্রচণ্ড অজ্ঞতা এবং অন্যদিকে নিদারুণ অন্ধ-বিশ্বাস বিদ্যমান থাকার ফলে তদানিন্তন মানুষেরা কখনও মানুষকে দেবতা, অবতার এমনকি স্বয়ং ভগবানের আসনে বসিয়েছে কখনও আবার দাস, অন্তজ্য অচ্ছ্যুৎ বলে কল্পনা করে পশুরও নীচে নামিয়েছে।

❑ নিজের পরিচয় না জানার কারণেই যে অনন্ত আকাশের অভিযাত্রী এবং এত উন্নতি অগ্রগতি সাধনের পরও মানুষ সীমাহীন পাপ ও নীতিহীনতায় নির্বোধ পশুকেও হার মানিয়ে চলেছে এবং গোটা পৃথিবীকে ভয়, অশান্তি ও নির্মমতার আগারে পরিণত করেছে ইতোপূর্বে সেকথাও বলা হয়েছে।

নিজেদের সম্পর্কে এই অজ্ঞতা এবং অন্ধবিশ্বাস বিদ্যমান থাকার ফলেই যে একশ্রেণীর মানুষ সেরা জ্ঞানী-বিজ্ঞানী ও মানবদরদী বলে সুপরিচিত হয়েও মানুষকে 'বুদ্ধিমান পশু' 'বানরের বংশধর' প্রভৃতি বলে মন্তব্য প্রকাশ করতে

www.pathagar.com

পারছেন এবং এই মন্তব্যের দ্বারা গোটা মানবজাতির মনে শুধু হীনমন্যতার সৃষ্টিই নয়— তাদের বানর তথা পশুসুলভ কার্যকলাপে উৎসাহিতও করছেন এবং করে চলেছেন অথচ সেকথা তাঁরা যে বুঝতে পারছে না ইতোপূর্বে এ আভাসও দেয়া হয়েছে।

❑ মানুষের মনে যাতে এই অজ্ঞতা এবং অন্ধ-বিশ্বাসের সৃষ্টি-ই হতে না পারে সেজন্যে মানব-সৃষ্টির পূর্বেই মহান আল্লাহ তাঁর এই প্রস্তাবনার মাধ্যমে মানুষের মান-মর্যাদা, অধিকার এবং দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তুলে ধরেছেন। শুধু তা-ই নয়— মানুষ যে সৃষ্টির সেরা এবং আল্লাহর প্রতিনিধি অর্থাৎ মর্যাদার ব্যাপারে মহান আল্লাহর পরেই যে মানুষের স্থান সেটাও সুস্পষ্ট করে তুলেছেন।

বলাবাহুল্য, প্রতিনিধি সৃষ্টির কারণ সম্পর্কে ওপরের এ কথাগুলোই যথেষ্ট নয়। এর পরও প্রশ্ন থেকে যায় যে, যেহেতু আল্লাহ ইচ্ছাময় এবং সর্বশক্তিমান অতএব তিনি ইচ্ছা করা মাত্রই সবকিছু হয়ে যায় এবং এ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর জন্য কোনও উপায়-উপকরণ এবং সহকারী সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয় না।

অথচ প্রতিনিধি নিয়োগের যে ব্যবস্থা বিভিন্ন দেশে চালু রয়েছে তা থেকে প্রতিনিধিকে সাহায্যকারী হিসেবে ধারণা-সৃষ্টি মোটেই বিচিত্র বা অস্বাভাবিক নয়। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি ভাল ভাবে বোঝানো যেতে পারে।

সাধারণত রাজা, রাষ্ট্রপ্রধান প্রভৃতির পক্ষ থেকে সেই দেশের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা, নির্দিষ্ট কার্যসম্পাদন, বার্তা-বহন প্রভৃতি এক বা একাধিক কাজের জন্য অন্য দেশে প্রতিনিধি পাঠানো হয়ে থাকে।

বলাবাহুল্য, রাজা, রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রতিনিধি নিয়োগকারী সংস্থা-সংগঠনের পক্ষে বিভিন্ন দেশে স্বয়ং উপস্থিতি ও এসব কার্য সম্পাদন সম্ভব নয় বলেই তাকে বা তাদের প্রতিনিধি নিয়োগ করতে হয়। এখানে অক্ষমতার পরিচয় সুস্পষ্ট। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রতিনিধিকে 'সাহায্যকারী' বলা বা মনে করা খুবই স্বাভাবিক।

অথচ অসীম অনন্ত আল্লাহর বেলায় অক্ষমতা বা সাহায্যগ্রহণের প্রশ্নই উঠতে পারে না। অতএব প্রতিনিধি সম্পর্কে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে বিষয়টি বিচার করা হলে এক্ষেত্রে কোনও মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভব হবে না। বরং বিভ্রান্তি সৃষ্টিরই যে প্রবল আশঙ্কা রয়েছে ধর্ম সম্পর্কীয় আলোচনায় তার সুস্পষ্ট প্রমাণ আমরা পেয়েছি।

অতএব বিষয়টি অন্যভাবে ভেবে দেখতে হবে। এ জন্য কয়েকটি বিষয়ের প্রতি গভীর মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি। সে বিষয়গুলো হলো—

www.pathagar.com

ক) আল্লাহর স্থূল-দেহী বা চর্মচক্ষে পরিদৃশ্য মান হওয়া যুক্তি-গ্রাহ্য এবং বাস্তব-সম্মত নয়। অথচ তিনি তাঁর অস্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে চান। এই বিকাশ ঘটানোর জন্যই যে তিনি 'আলম' (পৃথিবী) সৃষ্টি করেছেন এবং 'আলম'-এর অর্থ যে 'যদ্বারা স্রষ্টাকে জানা যায়' ইতোপূর্বে যে কথা বলা হয়েছে। অতএব 'আলম' যে আল্লাহকে জানার একমাত্র মাধ্যম এবং এই মাধ্যমটি ছাড়া তাঁকে জানার যে আর কোনও উপায় নেই 'আলম' শব্দের দ্বারা সেকথাই সুস্পষ্ট করে তোলা হয়েছে।

খ) বলাবাহুল্য, অজানা, অদৃশ্য বা অনুপস্থিত কোনও কিছুকে জানার জন্য শুধু মাধ্যম-ই যথেষ্ট নয়— মাধ্যমের ব্যবহারকারী বা জানার মতো যোগ্য পাত্রেরও প্রয়োজন হয়ে থাকে।

অথচ মানবসৃষ্টির পূর্বে এই পৃথিবীতে বিদ্যমান জিন-ফেরেশতাদিসহ অতিকায়, মহাকায়, ছোট-বড় কোটি কোটি জীব বিদ্যমান থাকলেও এই 'আলম'-এর মাধ্যমে তার স্রষ্টাকে জানার সামান্যতম যোগ্যতাও যে তাদের ছিল না মানব-সৃষ্টিই সেকথার জাজ্বল্যমান প্রমাণ বহন করছে। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে ওসবের যোগ্যতা যাঁচাই করা হলেও এই একই প্রমাণ আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং একমাত্র মানুষকেই যে এই জানার যোগ্যতা দিয়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে সেকথাও আমরা জানতে পেরেছি।

গ) কিন্তু মানুষকে এই জানার যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করা হলেও চর্মচক্ষে বা বাহ্য দৃষ্টিতে 'আলম' কে দেখে তার স্রষ্টাকে জানা অর্থাৎ তাঁর সম্পর্কে সম্যক ধারণায় উপনীত হওয়া কোনওক্রমেই সম্ভব হতে পারেনা। কেননা এই 'আলম'-এর মাঝে নানাভাবে এবং নানা অবস্থায় বিদ্যমান বস্তু-নিচয়ের মধ্যে রয়েছে স্রষ্টার সৃষ্টি-নৈপুণ্য, শ্রেষ্ঠত্ব, বিরাটত্ব, বিশালত্ব, সার্বভৌমত্ব, প্রভৃতির বিকাশ বা পরিচয়, চর্মচক্ষে বা বাহ্যদৃষ্টিতে যা দৃষ্টি গোচর হতে পারেনা।

এমতাবস্থায় ওসব বস্তু-নিচয়ের অনুসন্ধান, আহরণ, গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে স্রষ্টার উল্লিখিত গুণাবলীর সাথে পরিচিত হওয়া এবং সেই পরিচয়ের সূত্র ধরেই যে তাঁর 'জাত' বা সত্তাকে জানা সম্ভব সেকথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না।

ঘ) আল্লাহ তাঁর অস্তিত্বের কথা জানানোর জন্যেই যে 'আলম'-এর সৃষ্টি করেছেন ইতোপূর্বে হাদিসে কুদসির উদ্ধৃতি থেকে সেকথা আমরা জানতে পেরেছি। অতএব জানানোর কাজটা যে একান্তরূপেই তাঁর নিজস্ব সেকথা অনায়াসে বুঝতে পারা যাচ্ছে। অথচ প্রত্যক্ষ উপস্থিতি এবং উল্লিখিত বস্তুনিচয়ের অনুসন্ধান, আহরণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রভৃতি তাঁর পক্ষে বাস্তবসম্মত এবং যুক্তি-গ্রাহ্য নয়।

www.pathagar.com

সেই কারণেই প্রয়োজনীয় যোগ্যতা দিয়ে তিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং নিজে পরোক্ষে থেকে মানুষের দ্বারা এই কাজটি চালিয়ে নিচ্ছেন। বলাবাহুল্য, এ থেকে তাঁর অক্ষমতা বা মানুষের সাহায্য গ্রহণ সূচিত হচ্ছে না বরং শক্তিমত্তা এবং কর্ম কুশলতার পরিচয়ই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। তিনি "পরোক্ষে থেকে মানুষের দ্বারা কাজটি সমাধা করে চলেছেন" এই হিসাবে মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি বলে আখ্যা প্রদান যে খুবই যুক্তিপূর্ণ হয়েছে সেকথা কোনওক্রমেই অস্বীকার করা যেতে পারে না।

ঙ) অতঃপর খলিফাহ্ বা প্রতিনিধি শব্দের তাৎপর্য সম্পর্কে অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়কে তুলে ধরা যাচ্ছে। অতএব এদিকে গভীর মনোযোগ দেয়ার জন্য সুধী পাঠকবর্গের সমীপে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে রাখছি।

সুধী পাঠকবর্গ, নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে প্রস্তাবনা সংক্রান্ত পবিত্র কুরআনের ওপরোদ্ধৃত বাক্যাংশটির প্রথমেই বলা হয়েছে ঃ (হে নবী!) যখন আপনার রব ফেরেশতাদের বলেছিলেন যে নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে (আমার) খলিফাহ্ সৃষ্টি করব— এখানে আল্লাহ্ যে নিজেকে 'রব' বলে পরিচয় দিয়েছেন এবং মানবসৃষ্টির সাথে যে এই রব নামটির অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে অনায়াসে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে সে কথা বুঝতে পারা যাচ্ছে।

'রব' শব্দের গভীর এবং ব্যাপক তাৎপর্য রয়েছে। তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ না থাকায় অতি সংক্ষেপে বলা যাচ্ছে যে রব শব্দের মোটামুটি অর্থ হলো— 'প্রতিপালক'। একথা বলাই বাহুল্য যে, সৃষ্টির সাথে প্রতিপালনের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ এমনকি অবিচ্ছেদ্যও। কেননা, প্রতিপালন ছাড়া সৃষ্টির কাজ চলতেই পারে না। আর চলতে যে পারে না তার যথেষ্ট বাস্তব অভিজ্ঞতাও আমাদের রয়েছে।

আমাদের বাস্তব এবং বংশানুক্রমিক অভিজ্ঞতা একথাই বলে যে, একমাত্র মানুষ ব্যতীত অন্যসব জীবেরই প্রতিপালনের কাজ প্রাকৃতিক নিয়মে চালু রয়েছে। একমাত্র মানুষই এদিক দিয়ে একান্তরূপে অসহায় এবং পরমুখাপেক্ষী। জন্মের সাথে সাথে তার প্রতিপালনের দায়িত্ব পিতা, মাতা বা অন্য কাউকে গ্রহণ করতে হয় এবং সারাজীবন কোনও না কোনওভাবে তার এই পরমুখাপেক্ষিতা চলতে থাকে। বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর এই পরমুখাপেক্ষিতা কেটে যায় বলে কেউ হয়তো মন্তব্য করতে পারেন, কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে বলে আশা করি।

বেঁচে থাকা বা প্রতিপালিত হওয়ার জন্য খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, আত্মরক্ষা প্রভৃতি মৌলিক প্রয়োজনের অপরিহার্যতার কথা আমাদের জানা রয়েছে।

www.pathagar.com

বলাবাহুল্য, এর কোনওটাই মানুষের দ্বারা সৃষ্ট নয় এবং মানুষের একক প্রচেষ্টায় লাভ করাও সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে শুধু খাদ্যের কথাই ভেবে দেখা যাক।

খাদ্যোৎপাদনের জন্য জমি, পানি, সূর্যকিরণ, উৎপাদিকাশক্তি, বীজ প্রভৃতি এবং মানুষের এ সম্পর্কীয় জ্ঞান, বুদ্ধি, কর্মশক্তি, হস্তপদ প্রভৃতি যাকিছু ব্যবহৃত হয় তার কোনটাই মানুষের সৃষ্ট নয়।

❑ জমি চাষ করার জন্য লাংগলের প্রয়োজন। লাংগল বানাতে লোহা এবং কাঠের প্রয়োজন হয়। খনি থেকে লোহা উত্তোলন, তাকে বয়ে আনা, বাজারজাতকরণ অবশেষে কর্মকারের হস্তগত হওয়া পর্যন্ত কত মানুষ কতভাবে এতে কার্যরত রয়েছে সেকথা ভেবে দেখুন। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। লোহা গরম করার জন্য কয়লার প্রয়োজন আর তাও কোনও খনি থেকে উত্তোলন করতে হয়, বয়ে আনতে হয়, বাজারজাত করতে হয়, কামারের কামারশালায় পৌঁছাতে হয়।

❑ এর পর কাঠের বিষয়টি ভেবে দেখুন, ভেবে দেখুন বীজ উৎপাদনের সাথে কত লোক জড়িত রয়েছে। এমনিভাবে ভেবে দেখলে বুঝতে পারবেন যে আপনার খাদ্যের সাথে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ জড়িত রয়েছে।

❑ অনুরূপভাবে বস্ত্র, আশ্রয়, আত্মরক্ষা, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি মৌলিক প্রয়োজনসমূহের সাথে কতভাবে কত মানুষ জড়িত রয়েছে সেকথা চিন্তা করলে শেষপর্যন্ত আপনাকে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হবে যে বিশ্বের প্রতিটি মানুষই এই প্রতিপালনের সাথে কোনও না কোনওভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। এখানে উপনীত হয়ে কবির— "সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে" সেই অমর বাণীটিই আপনার সম্মুখে ভাস্বর ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

অবস্থাদৃষ্টে একথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে গোটা মানবজাতিই দিবারাত্রি কোনও না কোনওভাবে এই প্রতিপালনের কাজে রত রয়েছে। অর্থাৎ— এই প্রতিপালন এবং প্রতিপালিত হওয়াই যেন মানবজীবনের একমাত্র না হলেও অন্যতম প্রধান কাজ।

বলাবাহুল্য, সৃষ্টিকর্তা হিসাবে প্রতিপালনের দায়িত্ব একান্তরূপেই আল্লাহর। নিজে পরোক্ষে থেকে মানবজাতিকে দিয়ে কিভাবে সেই দায়িত্ব তিনি পালন করে চলেছেন এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে সে-সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণায় উপনীত হওয়া সম্ভব।

প্রতিপালক হিসাবে সাধারণভাবে তাঁর অন্যতম গুণবাচক নাম যে 'রব' এবং বিশ্ব প্রতিপালক হিসাবে 'রব্বুল আলামিন' পবিত্র কুরআনের পাঠকমাত্রেরই সেকথা জানা রয়েছে।

www.pathagar.com

যেহেতু তাঁর এই রবুবিয়াত বা প্রতিপালকত্বের দায়িত্বটি তিনি প্রকারান্তরে মানুষের দ্বারা চালিয়ে নিচ্ছেন অতএব এই হিসাবে মানুষ যে তাঁর এই বিশেষ গুণ বা 'রবুবিয়াত'-এর প্রতিনিধি সে-সম্পর্কে দ্বিমতের কোনও অবকাশই থাকতে পারে না। খুব সম্ভব সেই কারণেই মানব-সৃষ্টি সংক্রান্ত পবিত্র কুরআনের ওপরোদ্ধৃত বাণীটিতে তিনি নিজেকে রব এবং মানুষকে তাঁর (অর্থাৎ সেই রব-এর) প্রতিনিধি বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে রাজা, রাষ্ট্রপ্রধান প্রমুখেরা যে প্রতিনিধি নিয়োগ করেন তা ব্যক্তি হিসাবে নয়, বরং রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবেই করা হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধান কোনও ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়— দায়িত্বের নাম; আর সেই দায়িত্বেরই অংশ বিশেষকে পালন করার জন্যই প্রতিনিধি নিয়োগের এই ব্যবস্থা।

এ থেকে মানুষ যে অসীম অনন্ত এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর সত্তা বা 'জাত'-এর প্রতিনিধি নয় (এবং তা' হওয়া বাস্তবসম্মত এবং যুক্তি-গ্রাহ্য হতে পারে না) বরং রবুবিয়াত-রূপী বিশেষ গুণের প্রতিনিধি সেকথা আমরা অনায়াসে ধরে নিতে পারি। বলাবাহুল্য, সে কারণেই উক্ত বাণীটিতে আল্লাহর পরিবর্তে 'রব' নামটির উল্লেখ করা হয়েছে।

চ) পরিশেষে প্রতিনিধি শব্দের যে তাৎপর্যটি তুলে ধরা হবে তার গুরুত্বও মোটেই কম নয়। অতএব সুধী পাঠকবর্গের অখণ্ড মনোযোগ আকর্ষণ করে বলা যাচ্ছে যে—

মানুষ যে সৃষ্টির সেরাজীব সে সম্পর্কে আজ আর দ্বিমতের কোনও অবকাশই নেই। কিন্তু সৃষ্টির সেরা হলেও তার এই শ্রেষ্ঠত্ব কোনও আকস্মিক ঘটনাপ্রসূত বা অনায়াসলব্ধ নয়। বলাবাহুল্য, কঠোর সাধনা ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মাধ্যমেই এই শ্রেষ্ঠত্ব তাকে 'অর্জন' করতে হয়। আর এই সাধনা ও সংগ্রামের ফল লাভের জন্য সবচেয়ে যা বেশি প্রয়োজন তার নাম— বুক ভরা 'আশা' এবং অদম্য 'মনোবল'। আর এই আশা এবং মনোবলের জন্য প্রয়োজন— আত্মমর্যাদা বোধের।

বলাবাহুল্য, তাকে 'দাস', 'অন্ত্যজ', 'হরিজন' অথবা 'বানরের বংশধর' বলে সাব্যস্থ করে তার এই 'আত্মমর্যাদা বোধ' 'আশা' এবং 'মনোবল' সৃষ্টি করা কোনওক্রমেই সম্ভব হতে পারে না। বরং তা দিয়ে তার মনে হীনমন্যতার সৃষ্টি করে চিরদিনের জন্য তার আত্মমর্যাদা বোধ আশা এবং মনোবলকে চূর্ণবিচূর্ণ ও ধূলিসাৎ করা যেতে পারে এবং তা করা হয়েছেও।

স্মর্তব্য যে, ধর্মীয় বিধান মানুষকে কখনও ভগবান, দেবতা, অবতার, অতিমানব, মহামানব প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে তাকে মানুষের পর্যায় থেকে বহুদূরে

www.pathagar.com

সরিয়ে দিয়েছে; আবার কখনও দাস, অন্ত্যজ, বানর, হনুমান, অসুর, দানব, রাক্ষস প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করে পশুরও নীচে নিক্ষেপ করেছে।

একমাত্র ইসলামই তাকে সৃষ্টির 'সেরাজীব' এবং 'আল্লাহর প্রতিনিধি' আখ্যা প্রদান করে তাকে যথাযোগ্য মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর ইসলামের দেয়া তার এই আখ্যা বা পরিচয় যে সত্য, অভ্রান্ত এবং যথার্থ তার বাস্তব প্রমাণও আমাদের চোখের সম্মুখেই রয়েছে।

ফাসাদ ও রক্তপাত

এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি না। কেননা, সত্য-অসত্য, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, কল্যাণ-অকল্যাণ প্রভৃতির একটি যে অন্যটির সাথে সংগ্রামরত রয়েছে এবং এই সংগ্রাম যে স্বাভাবিক ও চিরন্তন সুধী পাঠক মাত্রেরই সেকথা জানা রয়েছে।

অন্যায়, অসত্য এবং পাপ ও অকল্যাণ যখন ন্যায়, সত্য, পুণ্য ও মঙ্গল তথা মানবতার টুটি টিপে ধরে— আর্তনাদ, হাহাকার আর নির্যাতন নিপীড়নে পৃথিবীর আকাশ-বাতাস যখন হয়ে ওঠে বিষাক্ত ও বেদনার্ত তখন মানবতাকে রক্ষা করার জন্য ফাসাদ ও রক্তপাত যে অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায় সেকথা খুলে বলার কোনও প্রয়োজনই হয় না।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, 'অহিংসা পরম ধর্ম' 'জীবহত্যা মহাপাপ' 'একগালে চড় খেয়ে অন্য গাল ফিরিয়ে দেয়ার' কথা শুনতে যত ভালই লাগুক বাস্তবে তা সম্ভব নয়— যুক্তিসম্মতও নয়।

যারা অন্যায়ের সাথে আপোস করে সহঅবস্থানে বিশ্বাসী তাদের এই বিশ্বাসের দাবি যে সত্যভিত্তিক এবং বাস্তবসম্মত নয় তার এত বাস্তব প্রমাণ চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে যে নতুন করে কোনও প্রমাণ তুলে ধরার প্রয়োজনই হয় না।

যেহেতু মানবতার কল্যাণই ইসলামের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অতএব সেই মানবতা যখন বিপন্ন-বিপর্যস্থ ও ধ্বংসের সম্মুখীন হয় এবং ফাসাদ ও রক্তপাতকে অবশ্যাম্ভাবী করে তোলে শুধু তখনই ইসলাম ফাসাদ ও রক্তপাতের শুধু সমর্থনই করে না একান্ত অপরিহার্য বলেও ঘোষণা করে।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, যেখানে ফাসাদ ও রক্তপাতের প্রয়োজন নেই সেখানে সামান্যতম ফাসাদ এবং রক্তপাতও ইসলামের দৃষ্টিতে শুধু পরিত্যজ্যই নয় অতি জঘন্য ধরনের পাপ এবং কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলেও অতি কঠোর এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষিত হয়েছে।

www.pathagar.com

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ফাসাদ ও রক্তপাতের পরিবর্তে আপোস মীমাংসা ও ক্ষমাপ্রদর্শনকে অশেষ কল্যাণ-প্রদ ও পুণ্যজনক বলে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, এ থেকেও ফাসাদ এবং রক্তপাত সম্পর্কে ইসলাম মানুষের মধ্যে কি ধারণা সৃষ্টি করতে চায় অনায়াসে সেকথা বুঝতে পারা যাচ্ছে।

এখানে প্রশ্ন হলো— ক্ষেত্র এবং অবস্থা বিশেষে ফাসাদ রক্তপাত যদি অবশ্যম্ভাবীই হয় তবে ফেরেশতাগণ কেন সেই ফাসাদ ও রক্তপাতের আশঙ্কায় মানব-সৃষ্টিতে আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন?

আলোচনা প্রসঙ্গে পরবর্তী কতিপয় নিবন্ধে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। এখানে শুধু এটুকু বলেই ক্ষান্ত হচ্ছি যে, অতীতে অমানব বহু জাতি পারস্পরিক ফাসাদ ও রক্তপাতে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ঘটনা থেকেই ফেরেশতাদের মনে এই আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছিল। আলোচনা প্রসঙ্গে ওসবের সংক্ষিপ্ত আভাস ইতোপূর্বে তুলে ধরা হয়েছে। আসলে প্রস্তাবিত মানব জাতিকে যে সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন উপাদানে সৃষ্টি করা হবে ফেরেশতাদের সেকথা জানা ছিল না। বলাবাহুল্য, এই না জানাই ছিল ফেরেশতাগণ কর্তৃক আপত্তি উত্থাপনের কারণ।

স্তব স্তুতি গুণগান

আদি প্যাগানিজম ও ধর্ম বিষয়ক আলোচনায় এটা লক্ষ্য করা গিয়েছে যে বিভিন্ন অশরীরি শক্তি, কল্পিত দেবদেবী গ্রহ-উপগ্রহ প্রভৃতির ক্রোধ প্রশমন ও সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আদি মানবেরা তাদের উদ্দেশে স্তবস্তুতি পঠন ও গুণকীর্তনের প্রতি সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিল।

বাস্তব ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই তারা যে এপথ বেছে নিয়েছিল সেকথাও আমরা উক্ত আলোচনা থেকে জানতে পেরেছি। মানুষ যত ক্রুদ্ধই হোক না কেন কাকুতিমিনতি এবং গুণ গান দ্বারা তার ক্রোধ প্রশমন যে সম্ভব এ অভিজ্ঞতা আমাদের প্রায় সকলেরই রয়েছে। কৌশলে কার্যোদ্ধার করার জন্য স্তব-স্তুতি ও গুণ-কীর্তন যে বিশেষ ফলদায়ক হয়ে তাকে সে অভিজ্ঞতাও আমাদের নতুন নয়। অপরের মুখে নিজের গুণ বা প্রশংসার কথা শুনলে মনে যে পুলক জাগে সে অভিজ্ঞতাও আমাদের বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ।

মাত্রা এবং পরিমাণে অল্প হলেও আদিমানবদেরও যে এ অভিজ্ঞতা ছিল সেকথা বলাইবাহুল্য। আর এই অভিজ্ঞতা থেকেই যে নিদারুণভাবে অসহায় ও ভীত-সন্ত্রস্থ আদি-মানবেরা স্তবস্তুতি পঠন ও প্রশংসাকীর্তনের পথ বেছে নিয়েছিল সেকথাও খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না।

www.pathagar.com

কিন্তু তাই বলে স্তবস্তুতি পঠন ও প্রশংসাকীর্তনের যে কোনও মূল্যই নেই সেকথা মনে করা হলে প্রচণ্ড ভুল করা হবে। গুণীর গুণ এবং উপকারীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার যে মানবীয় কর্তব্যসমূহের অন্যতম এবং তা না করা যে অতি অমানবিক এবং অতি জঘন্য কাজ প্রতিটি মানুষের বিবেকই সেই সাক্ষ্য প্রদান করে।

কিন্তু অসুবিধা হলো— মানুষের মাঝে অজ্ঞতা এবং আত্মপূজার মানসিকতা বিদ্যমান থাকায় এমন ভাল কাজটিও বহু ক্ষেত্রে ভীষণভাবে ক্ষতিকর হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে—

ক) স্তবস্তুতি ও প্রশংসাকীর্তনের সময় অনেক ক্ষেত্রেই মাত্রাজ্ঞান থাকে না বা সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয় না। সময় সময় এবং ক্ষেত্র বিশেষে ইচ্ছা করেই মাত্রা লংঘন করা হয়। ফলে যে যা নয় তাকে তা-ই বানানো হয়ে থাকে। মিথ্যা ও মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা যে প্রশংসাকারী এবং প্রশংসিত এ উভয়ের জন্যই ভীষণভাবে ক্ষতিকর সেকথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখেনা।

খ) অনেক ক্ষেত্রেই গুণীর গুণ এবং উপকারীর কৃতজ্ঞতা স্বীকারকে আসল লক্ষ্য হিসাবে নয় বরং সহজে ও কৌশলে কার্যোদ্ধারের একটি উপায় হিসাবে বেছে নেয়া হয়। এটা যে নিছক চাটুকারিতা এবং একটি জঘন্য ধরনের পাপ সেকথা নিষ্ঠুর হতে পারে কিন্তু অসত্য নয়।

গ) অত্যাচারী এবং পাষণ্ড ব্যক্তিদের স্তবস্তুতি ও প্রশংসাকীর্তনে অনেককেই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। এটা যে ব্যক্তি, সমাজ এবং উক্ত পাষণ্ড ও অত্যাচারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের পক্ষে কত বড় ক্ষতিকর সেকথা খুলে বলার কোনও প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি না।

ঘ) অজ্ঞতা এবং ভ্রান্ত ধারণার কারণে কল্পিত ভূত-প্রেত, ক্ষতিকর পদার্থ এমনকি হিংস্র জন্তু-জানোয়ারদের উদ্দেশে স্তবস্তুতি ও প্রশংসা কীর্তন করতে গিয়ে আদি মানবেরা যে ভীষণভাবে হীনমন্যতার শিকারে পরিণত হয়েছিল ইতোপূর্বে সেকথা আমরা জানতে পেরেছি।

ওসবের কোনওটাই যে স্তবস্তুতি এবং প্রশংসার যোগ্য নয় সেকথা বলাই বাহুল্য। আর অযোগ্য অপাত্রের প্রশংসা যে হীনমন্যতার সৃষ্টি করে সেকথাও খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না। তথাপি আজও কোনও কোনও সমাজে পিতৃপুরুষদের ঐতিহ্য অথবা ধর্মের নামে ওসব অযোগ্য অপাত্রদের স্তবস্তুতি এবং প্রশংসা কীর্তনের কাজ চালু রাখা হয়েছে। এ কাজ যে প্রকৃতই হীনমন্যতার সৃষ্টি করে ওসব ব্যক্তির মন-মানস এবং কার্যকলাপের খোঁজখবর নিলে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে।

www.pathagar.com

বলাবাহুল্য, এমনি ধরনের বহু উদাহরণই রয়েছে। মোটকথা, স্তবস্তুতি এবং প্রশংসাকীর্তন যত ভাল কাজই হোক, ক্ষেত্রবিশেষে এবং অজ্ঞতার কারণে তা যে ভীষণ ক্ষতিকরও হয়ে থাকে সেকথাটি বিশেষভাবে এবং অতীব সতর্কতার সাথে মনে রাখতে হবে।

অতঃপর ফেরেশতাদের কথায় আসা যাক। নূর বা জ্যোতি থেকে ফেরেশতাদের সৃষ্টি করা হয়েছে বলে জানতে পারা যায়। অতএব ফেরেশতারা স্থূল-দেহী নয়। আর স্থূল-দেহী নয় বলে ক্ষুধা-তৃষ্ণা, কাম-ক্রোধ, ভোগ-বিলাস, স্ত্রী-পরিবার, ঘর-সংসার প্রভৃতির কোনওটাই তাদের নেই— থাকার প্রয়োজনও নেই।

বলতে গেলে আল্লাহর স্তুতিগান এবং পবিত্রতা ঘোষণা ছাড়া তাদের আর কোনও কাজও নেই। অতএব এ ছাড়া আর কোনও কাজ যে থাকতে পারে তেমন ধারণাই তাদের ছিল না। ফলে প্রস্তাবিত মানবজাতিও যে তাদেরই মতো স্তবস্তুতি ও পবিত্রতা ঘোষণার কাজে রত হবে এমন ধারণা তাদের মনে সৃষ্টি হওয়া ছিল খুবই স্বাভাবিক।

মোটকথা আল্লাহ যে সম্পূর্ণ ভিন্ন উপাদান দিয়ে এবং ভিন্ন কাজের জন্য মানব সৃষ্টি করবেন সেকথা ফেরেশতাদের জানা ছিলনা— জানা থাকার কথাও নয়। বলাবাহুল্য, মানবসৃষ্টিতে তাদের আপত্তি উত্থাপনের কারণ ছিল এটাই।

এবারে আসুন স্তবস্তুতি ও পবিত্রতা ঘোষণার প্রশ্নটি নিয়ে কিছু চিন্তাভাবনা করি ঃ

আমরা জানি, আল্লাহ সর্ব-শক্তিমান এবং যাবতীয় প্রশংসার একমাত্র পাত্র। স্বয়ংসম্পূর্ণ হিসাবে তিনি কোনও কিছুর মুখাপেক্ষীও নন। অতএব কারো প্রশংসা বা গুণকীর্তনের মুখাপেক্ষী তিনি হতে পারেন না। সর্বগুণাধার এবং সকল প্রশংসার একমাত্র যোগ্য পাত্র হিসাবে কেউ প্রশংসাকীর্তন করলে তাঁর প্রশংসা বৃদ্ধি পায় না। আবার কেউ তা না করলেও তাঁর প্রশংসায় ঘাটতি পড়ে না। আর যেহেতু তিনি লাভ-ক্ষতির সম্পূর্ণ উর্ধ্বে রয়েছেন অতএব মানুষ বা অন্য কারো প্রশংসা অপ্রসংশায় তার কোনও লাভ বা ক্ষতি হতে পারে না।

প্রকৃত কথা হলো— তাঁর প্রশংসাকীর্তন এবং পবিত্রতা ঘোষণার দ্বারা প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণাকারীরাই নানাভাবে লাভবান হয়ে থাকে। কি কি ভাবে এবং কোন কোন প্রকারে লাভবান হয়ে থাকে সেকথা ভেবে দেখার দায়িত্ব সুধী পাঠকবর্গের ওপর ছেড়ে দিয়ে শুধু এটুকু বলেই প্রসঙ্গান্তরে যাচ্ছি ঃ

আল্লাহ সকল প্রশংসার একমাত্র যোগ্য পাত্র এবং সকল পবিত্রতারও একমাত্র যোগ্য আধার হিসাবে তাঁর প্রশংসাকীর্তন এবং পবিত্রতা ঘোষণার কাজে

www.pathagar.com

ফেরেশতাদের রত থাকার মধ্যে কোনও ভুল-বিভ্রান্তি বা কৃত্রিমতার অবকাশ বা কোনও সুযোগই থাকতে পারে না।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে মানুষের প্রশ্ন স্বতন্ত্র ঃ কেননা, ভিন্ন উপাদান দিয়ে এবং ভিন্ন উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর মানুষ ভুল-ভ্রান্তি, লোভ-লালসা, লাভক্ষতি প্রভৃতি থেকেও মুক্ত নয়। সুতরাং ফেরেশতাদের স্তবস্তুতি এবং পবিত্রতা ঘোষণার সাথে মানুষের স্তবস্তুতি এবং পবিত্রতা ঘোষণার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে এবং থাকাটা যে খুবই স্বাভাবিক সেকথা সহজেই অনুমেয়। অতঃপর আলোচনা প্রসঙ্গে মানুষ এবং ফেরেশতার মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্যের কথা বিভিন্ন সময়ে তুলে ধরতে হবে। তথাপি পরবর্তী আলোচনার সহায়ক হবে বলে 'মানুষ ও ফেরেশতা' এই উপশিরোনাম দিয়ে অতি সংক্ষেপে একটি নিবন্ধ সুধী পাঠকবর্গের বিবেচনার জন্য নিম্নে উপস্থাপিত করা যাচ্ছে ঃ

মানুষ ও ফেরেশতা

আলোচনার সুবিধার জন্য বক্ষ্যমাণ নিবন্ধকে কয়েকটি ভাগে পৃথক পৃথকভাবে তুলে ধরা যাচ্ছে। সুধী পাঠকবর্গ বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করবেন বলে আশা রাখি। এ সম্পর্কে তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত, উপদেশ এবং পরামর্শ অন্তরের সাথে কামনা করি।

❑ একথা অনস্বীকার্য যে আল্লাহর ইচ্ছায় এই বিশ্ব নিখিল সৃষ্ট হয়েছে এবং তাঁর ইচ্ছা বা তাঁরই সৃষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মে এটা চালু রয়েছে। একটু লক্ষ্য করলে একথা বুঝতে কষ্ট হয় না যে, এই প্রাকৃতিক নিয়মের কণামাত্র ব্যতিক্রম করার সাধ্যও কারো নেই— সবই নিয়মের ছকে বাঁধা এবং গতানুগতিক!

যা একান্তরূপেই নিয়মের ছকে বাঁধা এবং গতানুগতিক তার নিজের কোনও ইচ্ছা, অনিচ্ছা বা স্বাধীনতা থাকে না। সুতরাং তাদের কাজে নিছক একঘেঁয়েমি ছাড়া কোনও বৈচিত্র, বৈশিষ্ট, প্রজ্ঞাশীলতা বা প্রগতি আশা করা যায় না।

এ থেকে বেশ দৃঢ়তার সাথেই বলা যেতে পারে যে, আলোচ্য সময়ে অর্থাৎ— মানবসৃষ্টির পূর্বে গোটা সৃষ্টিই প্রাকৃতিক নিয়মের গদবাঁধা পথে বিশ্বস্রষ্টার আনুগত্য করে চলছিল।

এবারে আনুগত্যের সাথে সাথে ব্যতিক্রমধর্মী প্রবণতা এবং প্রয়োজনীয় প্রজ্ঞা ও স্বাধীনতা দিয়ে তিনি এক নবতর সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন। বলাবাহুল্য, তাঁর এই নবতর সৃষ্টিই হলো— প্রস্তাবিত মানবজাতি।

❑ আনুগত্যের সাথে সাথে ব্যতিক্রমধর্মী প্রবণতা থাকার ফলে একদিকে তিনি কত বড় সমন্বয়কারী এবং মহান স্রষ্টা সেটা দেদীপ্যমান হয়ে উঠবে; অন্যদিকে এই সৃষ্টির মাধ্যমে পাপে-পুণ্যে, ন্যায়ে-অন্যায়ে, কোমলে-কঠোরে,

www.pathagar.com

ত্যাগে-ভোগে, সুখে-দুঃখে আনন্দে-বিষাদে, সুন্দরে-অসুন্দরে, আনুগত্যে-অনানুগত্যে, ক্ষমায়-নিষ্ঠুরতায়, সংগ্রামে-শান্তিতে, শুধু এই নবতর সৃষ্টির জীবনই নয়— গোটা সৃষ্টিই হয়ে উঠবে বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের এক অভিনব লীলাভূমি।

❑ আমরা জানি, ঋণাত্মক (Negative) এবং ধনাত্মক (Positive) পরস্পর বিরোধী এ দুটি শক্তির সংঘাত থেকে আলোকের উদ্ভব ঘটে। এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ভিন্ন-ধর্মী দু'টি শক্তির সংঘাত থেকে আবার একটি ভিন্নধর্মীয় শক্তির উদ্ভব হয়ে থাকে।

প্রকৃতির মধ্যে ভাল-মন্দ, আলো-আঁধার, পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, ন্যায়-অন্যায়, রাত-দিন, ঠাণ্ডা-গরম প্রভৃতি পরস্পর বিরোধী নানা অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। অনুধাবন করলে এটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে মনুষ্যপূর্ব বিশ্বের সর্বত্র এইরূপ নানা ধরনের এমন সব ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বা ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ভিন্ন ভিন্নভাবে এবং নিজস্ব পরিমণ্ডলে বিদ্যমান ছিল যাদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টির কোনও সুযোগ ছিল না। এ সম্পর্কে একটি উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে।

দানব নামে আখ্যাত দুর্মদ ও চরম শক্তিশালী একটি শক্তির অস্তিত্বের কথা প্রায় প্রত্যেকেরই জানা রয়েছে। এর বিপরীত সত্তার নাম ফেরেশতা। একটিকে মন্দ ও অন্যটিকে ভালোর চরম বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। বিচ্ছিন্নভাবে ও নিজ নিজ পরিমণ্ডলে অবস্থিতির জন্য এ উভয়ের মধ্যে সংঘাতের কোনও সুযোগ ছিল না। ফলে এ উভয়ই ছিল নিয়মের ছকে বাঁধা একঘেঁয়ে এবং গতানুগতিক।

সৃষ্টি-শৌকর্যের জন্য এ উভয়ের সংঘাত এবং তৃতীয় শক্তির উদ্ভব ছিল বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। অতএব এই সংঘাতের সুযোগ সৃষ্টির জন্য এ উভয়ের সমাবেশ ঘটিয়ে একটি নবতর সৃষ্টির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। বলাবাহুল্য, এই নবতর সৃষ্টির নামই হলো মানব বা ইনসান। আর এই মানব বা ইনসানের মধ্যে সমাবেশকৃত পরস্পর বিরোধী শক্তিদ্বয়ের সংঘাতে উদ্ভূত তৃতীয় শক্তিটির নাম হলো— মানবতা বা ইনসানিয়াত।

মানবের এই যোগ্যতা এবং বৈশিষ্ট্যের কথা জানার পর এবারে আসুন ফেরেশতাদের যোগ্যতা এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে মোটামুটিভাবে একটা ধারণায় উপনীত হতে চেষ্টা করি ঃ

যতদূর জানা যায়, মানুষ তৈরি করা হয়েছে মাটি দিয়ে। আর নূর বা জ্যোতি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ফেরেশতাদের। সুতরাং ফেরেশতারা হলেন— জ্যোতির্ময়। কিন্তু তাদের মাঝে কোনও বিরুদ্ধ শক্তি বিদ্যমান না থাকার কারণে তাদের জীবন হলো সংঘাত-সংঘর্ষহীন একঘেঁয়ে এবং গতানুগতিক। তাই পৃথিবীতে বিদ্যমান নানা বিরুদ্ধ শক্তি ও অবস্থার সাথে সংগ্রাম করে সেখানে ন্যায়, সত্য, কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা বা আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করা তাদের দ্বারা

www.pathagar.com

সম্ভব ছিল না। আর সম্ভব ছিল না বলেই তাদের বিদ্যমানতা স্বত্বেও মানবসৃষ্টির প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল।

পক্ষান্তরে মানবের মধ্যে পরস্পর বিরোধী প্রচণ্ড দুটি শক্তির বিদ্যমানতা তার জীবনকে সংঘাত-মুখর করে রেখেছে। আর সংঘাত যেখানে রয়েছে সেখানেই জয়-পরাজয়, উত্থান-পতন, সাফল্য-ব্যর্থতা রয়েছে— রয়েছে পুরস্কার-তিরস্কারের প্রশ্নও।

পরবর্তী আলোচনার মধ্যেও মানুষ এবং ফেরেশতার পরিচয় রয়েছে। অতএব আসুন আমরা পবিত্র কুরআনের উপরোদ্ধৃত বাণীটির পরবর্তী বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় ব্রতী হই।

আদিমানবের সৃষ্টি ও 'আছমা' শিক্ষা

পবিত্র কুরআনের আলোচ্য বাণীটির পরবর্তী কিছু অংশের হুবহু বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করে তার মধ্যে সৃষ্টি পরবর্তী সময়ের জন্য যেসব তত্ত্ব ও তথ্য নিহিত রয়েছে সেগুলো একে একে তুলে ধরা যাচ্ছে ঃ

"এবং তিনি আদমকে সমস্ত নাম শিক্ষা দিলেন, অনন্তর তৎসমুদয় ফেরেশতাদের সমক্ষে উপস্থাপন করলেন; তারপর বললেন ঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে আমাকে এই সকলের নামসমূহ বিজ্ঞাপিত কর। তারা বলেছিল— তুমি পরম পবিত্র; তুমি আমাদের 'যা শিক্ষা দিয়েছ' তদ্ব্যতীত আমাদের কোনওই জ্ঞান নেই; নিশ্চয় তুমি মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।"

— আল কুরআন, বাকারা ৩১-৩২

আছমা-এছম্ এর বহুবচন; অর্থ— নামসমূহ। সাধারণত বস্তু, বিষয় এবং অবস্থারই নামকরণ করা হয় এবং উক্ত নামের দ্বারাই তাদের পরিচয় জানা সম্ভব হয়ে থাকে। 'তৎসমুদয়কে' ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করা থেকে বুঝতে পারা সহজ যে, এই 'তৎসমুদয়' বলতে বস্তুকে বোঝাচ্ছে। কেননা বস্তুকেই উপস্থাপন করা সম্ভব।

নাম রাখার নিয়ম হলো— নাম অর্থপূর্ণ এবং উপযোগী হতে হবে। উপযোগী অর্থে এ কথাই বোঝাচ্ছে যে নামের দ্বারাই যেন বস্তুটির মোটামুটি পরিচয় বিধৃত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ নামটি শোনার সাথে সাথেই শ্রোতা যেন বস্তুটি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণায় উপনীত হতে সক্ষম হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, 'সোনার পাথরের বাটি' এবং 'কাঠালের আসমত্ত' ধরনের নাম অর্থপূর্ণ নয়— উপযোগীও নয়।

বলাবাহুল্য, কাকেও শুধুমাত্র কোনও কিছুর নাম শিক্ষা দেয়ার কোনও তাৎপর্য থাকতে পারে না। অতএব 'নামসমূহ' শিক্ষাদানের অর্থ যে নামধেয়

www.pathagar.com

বস্তুসমূহের গুণ ও ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা বা অবহিতকরণ সেকথা সহজেই আমরা ধরে নিতে পারি। আর এ থেকে এটা ধরে নেয়াও খুব অন্যায় এবং অস্বাভাবিক হবে না যে, 'নামসমূহ' বলতে এখানে বিশেষ করে 'বস্তু বিজ্ঞানের' প্রতিই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, মানুষকে পৃথিবীর প্রতিনিধি করে সৃষ্টি করা হবে। পার্থিব বস্তু নিচয়ের জ্ঞান না থাকলে প্রতিনিধিত্ব করা কোনওক্রমেই সম্ভব হতে পারে না। অতএব মানুষকে বস্তুবিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া যে একান্তরূপেই অপরিহার্য ছিল সেকথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না।

এর মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অন্য যে বিষয়টি রয়েছে তা হলো— ইতোপূর্বের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, 'আল্লাহর এবাদতই মানবসৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য।" এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, আল্লাহর এবাদত মানবসৃষ্টির 'একমাত্র' উদ্দেশ্য হলে প্রথমেই তো তাকে এবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষাদানই ছিল সঙ্গত এবং স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় প্রথমেই তাকে 'আছমা' বা 'বস্তু বিজ্ঞান' শিক্ষাদানের কি তাৎপর্য থাকতে পারে? অর্থাৎ— মানবকে সৃষ্টি করা হলো যে কাজের উদ্দেশ্যে তাকে সেকাজ শিক্ষা না দিয়ে কেন অন্য কাজ শিক্ষা দেয়া হলো?

এই প্রশ্নের উত্তর হলো— পবিত্র কুরআন যে মানবজাতির জন্য আল্লাহর দেয়া সর্বশেষ জীবনবিধান সুতরাং এতে যে অশ্লীল, অশালীন, অবান্তর, অলীক-অদ্ভুত, অর্থাৎ বিশ্বাসযোগ্য এবং বিশেষভাবে তাৎপর্য পূর্ণ নয় এমন একটি কথাও নেই— থাকতে পারে না ইতোপূর্বে সে কথা পুনঃ পুনঃ বলা হয়েছে। আমাদের এ দাবি যে সত্য এখানে তারই একটি জ্বলন্ত প্রমাণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আমরা জানি জীবনধারনের জন্য খাদ্য একান্তরূপেই অপরিহার্য। অর্থাৎ খাদ্যগ্রহণ না করে কোনও প্রাণীরই বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। অতএব জীবের জন্মের সাথে সাথেই খাদ্যের প্রয়োজন হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, বস্তু দিয়েই সেই খাদ্যের প্রয়োজন মিটাতে হয়।

পক্ষান্তরে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, আনুগত্য প্রকাশ প্রভৃতি অন্য কথায় এবাদতের প্রয়োজন হয় বেশ কিছুটা জ্ঞান-বুদ্ধি হওয়ার পরে। কারণ জ্ঞান-বুদ্ধি না হতে কোনও কিছুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং এবাদত-এর কোনওটাই যথার্থভাবে সম্পাদিত হতে পারে না।

এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, খাদ্য ছাড়া যেমন জীবনধারণ সম্ভব নয়, ঠিক তেমনই অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়েও জীবন-ধারণ সম্ভব হতে পারে না। এমতাবস্থায় খাদ্যগ্রহণের পূর্বেই কোনটা খাদ্য, কোনটা অখাদ্য এবং কোনটা কুখাদ্য সেটা জানা, খাদ্য-প্রস্তুতি এবং গ্রহণের পদ্ধতি অবহিত

www.pathagar.com

হওয়া বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। বলাবাহুল্য, সে কারণেই মানবজাতির আদি-পিতাকে সর্বপ্রথমে ধর্মজ্ঞান শিক্ষা না দিয়ে বস্তু-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়েছিল।

আশা করি, সুধী পাঠকবর্গ গভীরভাবে বিষয়টি ভেবে দেখবেন এবং এ থেকে পবিত্র কুরআনের মাধুর্য, সত্যতা এবং যথার্থতা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করবেন।

ফেরেশতাদিগের শিক্ষা ও জ্ঞান

"আল্লাহ যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া ফেরেশতাদের আর কোনও জ্ঞানই যে নেই" ওপরোদ্ধৃত বাণীটির মাধ্যমে ফেরেশতাদের স্বীকৃতি থেকে সেকথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নিজস্ব উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টায় শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানের কোনও সুযোগ যে ফেরেশতাদের নেই ফেরেশতাদের এই স্বীকৃতিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করছে।

প্রণিধানযোগ্য যে, স্থূলদেহের অধিকারী না হওয়ার কারণে ফেরেশতাদের জন্য আহার বিহার প্রভৃতি কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। অতএব বস্তুবিজ্ঞানের কোনও প্রয়োজনও যে তাদের থাকতে পারে না সেকথা সহজেই অনুমেয়। আর যা প্রয়োজনীয় নয় তা যে তাদের আল্লাহ শিক্ষা দিতে পারেন না সেকথা অনুমান করাও মোটেই কঠিন নয়। কথাটিকে আরো পরিষ্কার করে বলা যেতে পারে ঃ যেহেতু ফেরেশতাদের প্রতিনিধিত্ব দেয়া হয়নি অতএব প্রতিনিধির জন্য যে শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রয়োজন ফেরেশতাদের তা শিক্ষা দেয়ার কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না।

মোটকথা, গ্রহণযোগ্যতা এবং প্রয়োজনানুযায়ী যতটুকু না হলে চলে না ঠিক ততটুকুই যে ফেরেশতাদের শিক্ষা দেয়া হয়েছিল এ থেকে সেকথাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এখানে প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক যে ফেরেশতাদের শিক্ষা ও জ্ঞানের পরিমাণ নিশ্চিতরূপেই আল্লাহ পরিজ্ঞাত ছিলেন এবং ফেরেশতারা যে 'নামসমূহ' বিবৃত করতে সক্ষম হবেন না সেকথাও নিশ্চিতরূপেই আল্লাহ অপরিজ্ঞাত ছিলেন না। এমতাবস্থায় কেন তিনি ফেরেশতাদের 'নামসমূহ' বিবৃত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন?

এই প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ সবই জানতেন। আসলে এটা ছিল মানুষ ও ফেরেশতার পার্থক্যকে সুস্পষ্ট করে তোলা এবং সুস্পষ্ট করে রাখার একটি বিশেষ ব্যবস্থা। তাছাড়া শিক্ষাই যে সম্মান ও মর্যাদা

www.pathagar.com

লাভের চাবিকাঠি সেকথার একটি অনবদ্য উদাহরণকে প্রস্তাবিত মানবজাতির সম্মুখে বিদ্যমান করে রাখাও ছিল এই ঘটনা সংঘটনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

খুব সম্ভব ফেরেশতাগণ যে নিজেদের অজ্ঞতার কারণেই মানবসৃষ্টিতে আপত্তি উত্থাপন করে ছিলেন তাদের সম্মুখে তার বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরাও ছিল এই ঘটনাটি সংঘটনের একটি কারণ।

এই ঘটনা সংঘটন ও তার বিবরণ আল্লাহর বিধানের মাধ্যমে সংরক্ষিতকরণের অন্য যে কারণ থাকতে পারে তা হলো— এই ঘটনার বিবরণ থেকে প্রস্তাবিত মানবজাতি ফেরেশতাদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মান-মর্যাদার সাথে নিজেদের জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও মান-মর্যাদার পরিমাণ ও পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম হবে, ফলে ভবিষ্যতে তারা ফেরেশতাদের সম্পর্কে কোনও বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত হবে না।

এবারে আসুন, 'আমাদের তুমি যা শিক্ষা দিয়েছ তা ছাড়া আমাদের কোনও জ্ঞানই নেই" ফেরেশতাদের এই স্বীকারোক্তিটি নিয়ে একটু পর্যালোচনা করি ঃ

ফেরেশতাদের এই স্বীকারোক্তিটি নিয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে এর মাঝে একটি বিশেষ ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন থাকার কথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই বাক্যটির মাধ্যমে নিজেদের অবস্থার বিবরণ দেয়ার সাথে সাথে ফেরেশতারা যেন প্রচ্ছন্নভাবে একথাও বলেছিলেন যে, "হে আল্লাহ! তুমি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছ তা ছাড়া আমাদের কোনও জ্ঞানই নেই এবং নিজস্ব প্রচেষ্টায় কোনও কিছু শিক্ষালাভের যোগ্যতাও নেই। কিন্তু মানবজাতিকে তুমি যা শিক্ষা দিলে তারা কিন্তু (নিজেদের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায়) তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের শিক্ষাগ্রহণেও (অর্থাৎ ভিন্ন ধরণের শিক্ষার উদ্ভাবন এবং প্রবর্তনেও) সক্ষম।"

ফেরেশতাদের এই ইঙ্গিত যে মোটেই অমূলক ছিল না মানবজাতির পার্থিব জীবনের বহু ঘটনাই তার জাজ্জল্যমান প্রমাণ বহন করছে। তবে বলে রাখা প্রয়োজন যে, এক্ষেত্রে ফেরেশতারা পূর্বের মতো ভুলই করে ছিলেন।

লক্ষ্যণীয় যে, ফেরেশতাদের এই ইঙ্গিত সম্পর্কে আল্লাহ কোনও মন্তব্যই করেননি। খুব সম্ভব ইতোপূর্বে মানবসৃষ্টি সম্পর্কে "তোমরা যা অবগত নও আমি তা পরিজ্ঞাত রয়েছি" এই উক্তিটির মাধ্যমেই তিনি এ ইঙ্গিতের উত্তর দিয়ে রেখেছিলেন।

এবারে আসুন ফেরেশতাদের এই ইঙ্গিত যে অমূলক ছিল না তার কোনও প্রমাণ আছে কিনা সেকথা জানতে চেষ্টা করি ঃ

উল্লেখ্য, আল্লাহ শুধু 'আছমা' বা বস্তুবিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েই যে ক্ষান্ত হননি বরং যুগে যুগে মানবজাতির জন্য জীবন-বিধান ও উক্ত বিধান-বাহকদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় যাবতীয় শিক্ষাও যে তিনি প্রদান করেছেন তার সুস্পষ্ট এবং বাস্তব

www.pathagar.com

প্রমাণ স্বরূপ পবিত্র কুরআন এবং তৎপূর্ববর্তী বিধানসমূহ ও উক্ত বিধানবাহকদের জীবনবৃত্তান্ত আমাদের সম্মুখেই বিদ্যমান রয়েছে।

কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় আল্লাহ প্রদত্ত এই পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও একশ্রেণীর মানুষ নিজস্ব উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের শিক্ষার উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করে নিয়েছে।

প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সেইসব শিক্ষা কি? এই প্রশ্নের উত্তর হলো— চুরি, ডাকাতি, মিথ্যা, শঠতা, জুয়া, ব্যাভিচার ছল-চাতুরী প্রভৃতি।

আল্লাহ যে মানুষকে এসবের কোনওটাই শিক্ষা দেননি বরং এসব থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকার জন্য পুনঃ পুনঃ নির্দেশ দিয়েছেন এবং এসবের অনুষ্ঠাতাদের জন্য কঠোর শাস্তি অবধারিত থাকার কথা ঘোষণা করেছেন আল্লাহ প্রদত্ত বিধানসমূহই তার জাজ্জল্যমান প্রমাণ বহন করছে।

কেউ কেউ হয়তো মানুষের এইসব পাপ কাজের উদ্ভাবন, অনুষ্ঠান ও প্রচলনের জন্য শয়তানকে দায়ী করতে পারেন। তাদের অবগতির জন্য বলা প্রয়োজন যে, পাপ কাজের উদ্ভাবন ও অনুষ্ঠান শয়তানের কাজ নয়, কাউকে এ ধরনের শিক্ষাও শয়তান দেয় না, কেন না, তার কাজ মাত্র একটিই আর তা হলো— কুমন্ত্রণা দেয়া। সুতরাং এজন্য শয়তানকে দায়ী করে রেহাই পাওয়া যাবে না। বরং আত্মপ্রবঞ্চক ও সুবিধাবাদী বলেই চিহ্নিত হতে হবে।

এর পরও একটি প্রশ্ন থেকে যায়। আর তা হলো— মানুষ সম্পর্কে এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিয়ে ফেরেশতারা কি ভুল করেছিলেন?

এই প্রশ্নের উত্তর হলো— মানুষকে সীমিত হলেও স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে এবং পাপ ও পুণ্য এ দুটি পথও তার জন্য খোলা রাখা হয়েছে। এটা তার জন্য এক মহা পরীক্ষা।

বলাবাহুল্য, সাফল্যের সাথে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ওপরেই নির্ভর করছে তার সৃষ্টির সেরা ও আল্লাহর যথাযোগ্য প্রতিনিধি হওয়া এবং প্রতিশ্রুত মহাপুরস্কার। অতএব এটা বুঝতে পারা সহজ যে, এই তত্ত্ব না জানা থাকার কারণেই ভুল করে ফেরেশতারা উল্লেখিত প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটি দিয়েছিলেন।

মানব শ্রেষ্ঠত্বের বাস্তব প্রদর্শনী

অতঃপর আলোচ্য বাণীটিতে বলা হয়েছে— "তিনি (আল্লাহ) বলেছিলেন— হে আদম, তুমি তাদের অর্থাৎ ফেরেশতাদের ঐ সকলের নামসমূহ জ্ঞাপন কর; অতঃপর সে তাদের নামসমূহ পরিজ্ঞাপন করে ছিল, তখন

www.pathagar.com

তিনি (আল্লাহ) বলেছিলেন— আমি কি তোমাদের বলিনি যে নিশ্চয় আমি ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয়সমূহ অবগত আছি এবং তোমরা যা প্রকাশ কর ও যা গোপন কর আমি তাও পরিজ্ঞাত আছি।

"এবং যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম যে, তোমরা আদমকে 'সিজদা' কর— তখন ইবলিস ব্যতীত সকলে 'সিজদা' করেছিল, সে অগ্রাহ্য করলো ও অহংকার করলো এবং অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।"

— আল কুরআন, বাকারা ৩৩-৩৪

আদম বা মানবের আদি পিতা যে তাকে শিখানো নামসমূহকে যথাযথভাবে ফেরেশতাদের কাছে বিবৃত করতে সক্ষম হয়েছিলেন এতদ্বারা সেকথা অনায়াসে বুঝতে পারা যাচ্ছে।

অতএব কোনওকিছু 'শিক্ষা করা' এবং অপরকে 'শিক্ষাদান' এদুটি যোগ্যতা যে মানবজাতিকে দেয়া হয়েছে এবং এ দুটি যোগ্যতা যে সম্মান ও সাফল্যের চাবিকাঠি তার বাস্তব নিদর্শনকে সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরার জন্য ফেরেশতা কর্তৃক আদম (মানবজাতির আদি পিতা) কে 'সিজদা' করার এক প্রদর্শনীও যে সেসময় অনুষ্ঠিত হয়েছিল ওপরোদ্ধৃত বাণীটি থেকে সুস্পষ্টরূপে সেকথাও আমরা জানতে পারছি।

বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অতএব সকলের অবগতির জন্য আরো পরিষ্কার করে বলা যাচ্ছে যে, যেহেতু আদম (আঃ) কর্তৃক 'আছমা' শিক্ষা ও ফেরেশতাদের শিক্ষাদান এ দুটি কাজের পূর্বে সিজদা করার প্রশ্ন দেখা দেয়নি অতএব 'শিক্ষাগ্রহণ' ও 'শিক্ষাদান' এ দুটি যোগ্যতাই যে তাকে সিজদা লাভের উপযুক্ত করে তুলেছিল সেকথা সহজেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। আর পার্থিব জীবনে আদম-সন্তানদের যারা এ দুটি যোগ্যতার অধিকারী হবে তারা যে শুধু পৃথিবীর অধিবাসীদেরই নয়, আকাশের ফেরেশতাদেরও সম্মানার্হ হতে পারবে এতদ্বারা সে কথাকেও যে সুস্পষ্ট করে তোলা হয়েছে তাও বুঝতে পারা যাচ্ছে।

আল্লাহর বিধান তথা ইসলাম এ দুটি যোগ্যতাকে যে কত বেশি গুরুত্ব দিয়েছে সে সম্পর্কে পরিস্কার উপলব্ধির জন্য বিষয়টির আরো কিছু বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি।

ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে জানতে পেরেছি যে, ফেরেশতারা আল্লাহর প্রশংসা-কীর্তন, পবিত্রতা বর্ণনা এবং আনুগত্যের কাজে একনিষ্ঠভাবে রত রয়েছেন। বলাবাহুল্য, এসব কাজ এবাদতের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু এছাড়া ফেরেশতাদের আর কিছু জানা নেই— করণীয়ও নেই অতএব ফেরেশতাদের আমরা 'একনিষ্ঠ এবাদতকারী' বলে ধরে নিতে পারি।

www.pathagar.com

সেই হিসাবে আছমা বা বস্তুবিজ্ঞান শিক্ষাপ্রাপ্ত আদম বা মানবজাতির আদি পিতাকে 'জ্ঞানী' বা 'বৈজ্ঞানিক' বলে অভিহিত করতে হয়। এ থেকে বুঝতে পারা সহজ যে তাদের একজনের শক্তি হলো 'এবাদত' আর অন্য জনের শক্তি 'জ্ঞান'। ঠিক এ-ই যখন অবস্থা তখনই আদমকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

ফেরেশতা এবং আদম এই নামের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে যোগ্যতা বা শক্তির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হলে বলতে হয় যে, ফেরেশতা অর্থাৎ— 'এবাদত'কে বলা হয়েছিল— "হে এবাদত! তুমি জ্ঞানকে সিজদা কর"।

আল্লাহর বিধান তথা ইসলামের দৃষ্টিতে এবাদত (আল্লাহর অর্চনা) এবং আছমা বা এলম (জ্ঞান) এ দুয়ের পার্থক্য যে কত বেশি আশা করি এ বাস্তব উদাহরণটি থেকে তা সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যাবে।

এবাদত এবং এল্‌ম এ উভয়ের পার্থক্য বুঝাতে গিয়েই ইসলামের নবী (স) দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন— "সারা রাত আল্লাহর এবাদত করা অপেক্ষা রাতের কিছু সময় জ্ঞানচর্চা করা সমধিক উত্তম।" "মুর্খের এবাদত এবং আলেমের (জ্ঞানী ব্যক্তির) নিদ্রা এ উভয়ের মধ্যে আলেমের নিদ্রাই উত্তম।" "শহীদের রক্ত এবং আলেমের কালি এ উভয়ের মধ্যে আলেমের কালিই বেশি মর্যাদার যোগ্য" ইত্যাদি।

বলাবাহুল্য, আল্লাহর দৃষ্টিতে জ্ঞান তথা 'শিক্ষাগ্রহণ' এবং 'শিক্ষা দান' এ দুটি যোগ্যতাই যে মানবজাতির সম্মান, মর্যাদা, উন্নতি, অগ্রগতি প্রভৃতি এক কথায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভের চাবিকাঠি ফেরেশতা কর্তৃক আদি পিতাকে সিজদাকরণের এই ঘটনার মাধ্যমে সেই শিক্ষাকেই বাস্তব এবং প্রাণবন্ত করে তুলে ধরা হয়েছে।

অহমিকা ও তার পরিণতি

অহমিকার পরিণাম যে কত ভয়াবহ তার বহু উদাহরণই তুলে ধরা যেতে পারে। এ সম্পর্কে প্রায় সকলেরই যথেষ্ট বাস্তব-অভিজ্ঞতা রয়েছে। সুতরাং শুধু শয়তানের উদাহরণটি নিয়েই কিছু পর্যালোচনা করা যাচ্ছে।

আমরা জানি, অহমিকার মূলে রয়েছে জন্ম, বংশ, রক্ত, পদমর্যাদা, দৈহিক-শক্তি; অর্থ-বিত্ত, ধার্মিকতা প্রভৃতির দাবি। ঘটনার বিবরণ থেকে একথাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে জিন জাতি 'অগ্নি' বা 'অগ্নি শিখা' থেকে সৃষ্ট এই অহমিকাই ছিল জ্বিনবংশোদ্ভূত আজাজিল (আল্লাহর দাস) কর্তৃক মাটির মানুষের কাছে নত হওয়ার নির্দেশকে অমান্যকরণ ও শয়তান (আশাহীন)-এ পরিণত হওয়ার কারণ। অহমিকা যে শুধু দৃষ্টিশক্তি এবং জ্ঞান-বিবেককেই ভীষণভাবে আচ্ছন্ন

www.pathagar.com

করে না— আল্লাহর নির্দেশকে অমান্য করার মতো জঘন্য মানসিকতাও সৃষ্টি করে এ থেকে সেকথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর অহমিকা যে আল্লাহর দাস (আজাজিল) উপাধি প্রাপ্তকেও ইবলিস (আশাহীন) এ পরিণত করতে পারে এতদ্বারা সেকথাও সুস্পষ্ট করে তোলা হয়েছে।

স্মর্তব্য যে, নূর বা জ্যোতি থেকে সৃষ্ট ফেরেশতারা মানবসৃষ্টিতে আপত্তি উত্থাপনকারী হয়েও আল্লাহর নির্দেশে বিনা বাক্যব্যয়ে সেই আদমকে সিজদা করেছিলেন।

বলাবাহুল্য, আল্লাহ নিছক মাটির মানুষকে সিজদা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন না। তেমন নির্দেশ দেয়া হলে আছমা শিক্ষা দেয়ার পূর্বেই তা দেয়া হতো : আদম কর্তৃক আছমা শিক্ষাকরণ এবং পরে তা বিবৃতকরণের মাধ্যমে ফেরেশতাদের শিক্ষাদান পর্যন্ত প্রতীক্ষার কোনও প্রয়োজন হতো না।

অতএব নিছক মাটির মানুষকে নয়— বরং জ্ঞান বা শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাপ্রদানের যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষকেই যে সিজদার মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল সেকথা দিবালোকের মতোই সুস্পষ্ট।

এ নিয়ে আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে চাইনা। শুধু এটুকু বলেই ক্ষান্ত হতে চাই যে, অহমিকার জঘন্য পরিণতি সম্পর্কে মানুষকে সাবধান-সতর্ক করার জন্য শয়তান সংক্রান্ত এই ঘটনার বিবরণ আল্লাহ স্বকীয় বিধানসমূহের মাধ্যমে চিরভাস্বর করে রাখা ছাড়াও তিনি যুগে যুগে স্বীয় বার্তাবাহক এবং সতর্ককারী পাঠিয়ে মানবজাতিকে সাবধান-সতর্ক করার কাজ অব্যাহত রেখেছেন।

অথচ চরম দুঃখ ও পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে যে, এতসব সত্ত্বেও জন্ম, বংশ, গোত্র, পদমর্যাদা প্রভৃতির অহমিকায় মত্ত মানুষেরা শয়তানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে চলেছে।

ফলে সারা পৃথিবীর অখণ্ড মানবতা আজ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ঃ গোটা পৃথিবী আজ দম্ভ-অহংকার, অত্যাচার-নির্যাতন এবং আর্তনাদ-হাহাকারের এক অতি জঘন্য লীলাভূমিতে পরিণত; মানুষের চরম ও পরম কাম্য শান্তি আজ অশান্তির দাবানলে দগ্ধ— ভস্মীভূত!

অতএব একথা বলা অন্যায় হবে না যে, যারা নিছক জন্ম, বংশ, গোত্র, রক্ত, পদ-মর্যাদা, অর্থ-বিত্ত নিষ্ঠাশীলতা প্রভৃতির মিথ্যা ও স্বকৌশল কল্পিত দাবিতে মত্ত হয়ে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে চলেছে আসলে তারা মানুষ নয়— মানুষরূপী শয়তান।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিশ্বনবী (স) তাঁর ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের দিনে বিশ্ববাসীর উদ্দেশে অন্যান্য বিষয়ের সাথে এ কথাটিও কঠোর

www.pathagar.com

ভাষায় এবং উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন ঃ মানবজাতির আদি পিতা আদম (আ) কে মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল; অতএব কৌলিন প্রথা তথা জন্ম, বংশ, গোত্র, রক্ত প্রভৃতির দাবি মিথ্যা এবং নিছক অজ্ঞতা-প্রসূত। আজ থেকে এই সব দাবি আমার পদতলে নিস্পিষ্ট এবং চিরতরে নিষিদ্ধ হয়ে গেল; অতএব সাবধান!

ইনসান, জান্নাত এবং নিষিদ্ধ বৃক্ষ

আলোচ্য বাণীটির পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে ঃ "এবং আমি বলেছিলাম, হে আদম তুমি ও তোমার সহধর্মিনী জান্নাতে অবস্থান কর এবং তা থেকে যা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ কর, কিন্তু ঐ বৃক্ষের নিকটবর্তী হবে না— অন্যথায় তোমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" — আল কুরআন, বাকারা ৩৫;

যারা পবিত্র কুরআন বা তাৎপূর্ববর্তী বিধানসমূহের কোনওটির সাথেই পরিচিত নন তাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, আদম (আ)-এর সহধর্মিনীকে কখন এবং কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল?

তাদের অবগতির জন্য বলতে হচ্ছে যে, জান্নাতে অবস্থানের অনুমতি প্রদানের পূর্বেই যে আদম বা মানবজাতির আদি পিতার পাঞ্জরাস্থি দিয়ে তদীয় সহধর্মিনী হাওয়াকে তৈরি করা হয়েছিল পবিত্র কুরআনের অন্যত্র এবং তৎপূর্ববর্তী বিধানসমূহের 'আদম এবং ইভ'-এর সৃষ্টি প্রসঙ্গে সেকথা বলা হয়েছে।

স্মর্তব্য যে, এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে কতিপয় ধর্মীয় বিধান থেকে আদি মানব-মানবীর সৃষ্টি সংক্রান্ত বর্ণনার উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়েছে। সেই বর্ণনার সাথে ওপরোক্ত ইসলামী বিধানসমূহের বর্ণনার বেশ কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

এই সব ধর্মীয় বিধানের কোনওটিতে বলা হয়েছে যে, "সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রথম নিজের দেহ দু'ভাগ করে এক ভাগের দ্বারা নারী সৃষ্টি করেছিলেন।" কোনওটি আবার ব্রহ্মার পরিবর্তে মনু বা অন্য কারো নামের কথা বলেছে। তবে নাম যা-ই হোক শরীরের অধ্যাংশ দ্বারা যে নারী সৃষ্টি করা হয়েছিল এটাই এখানে লক্ষ্যণীয়। অতএব ইসলামী বিধানের মতে আদি পিতার পাঞ্জরাস্থি আর ধর্মীয় বিধানের মতে শরীরের অর্ধাংশ এই যা পার্থক্য।

তবে ইসলামী বিধানের সাথে এই ব্যাপারে ধর্মীয় বিধানের আরো কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। আর তা হলো— ধর্মীয় বিধানের মতে "ততঃ স্বদেহ সম্ভূতা মাত্মজা মিত্য কল্পয়ৎ" (বায়ু পুরাণ) অর্থাৎ— "নিজের দেহ থেকে উৎপন্ন বিধায় উক্ত নারীকে "আত্মজা' (কন্যা) বলে কল্পনা করা হয়েছে।' এই কন্যার নাম

www.pathagar.com

সাবিত্রী। অন্য নারী না থাকায় ব্রহ্মা এই কন্যার গর্ভে সন্তানোৎপাদন করেন বলে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। বলাবাহুল্য, এই কল্পনার ফলে গোটা মানবজাতিই পিতা ও কন্যার অবৈধ মিলনের ফসল রূপে পরিগণিত হয়েছে।

পরে অবশ্য এ নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং "দেবতার কার্য মানুষের বিচার্য্য নয়" বলে বিষয়টি ধামাচাপা দেয়া হয়।

পক্ষান্তরে ইসলামী বিধানের মত হলো ঃ যেহেতু স্বাভাবিক নিয়ম বা যৌনমিলনের দ্বারা উক্ত নারীকে সৃষ্টি করা হয়নি দেহের পাঞ্জরাস্থি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছিল সেহেতু কোনওক্রমেই তাকে আত্মজা বা কন্যা বলা যেতে পারে না— তাকে অর্ধাঙ্গিনী বা সহধর্মিনী বলাই যুক্তিসঙ্গত।

ইসলামী বিধান এবং ধর্মীয় বিধানের এই পার্থক্যের কথা ছেড়ে দিয়ে অতঃপর একটি রহস্যের কথায় আসা যাক!

নারীমাত্রই রহস্যময়ী। অতএব সেই নারীর সৃষ্টিতে কিছুটা রহস্য থাকা যে খুবই স্বাভাবিক সেকথা বলাই বাহুল্য। এই নারী সৃষ্টি নিয়ে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে যে ঃ

আল্লাহ ইচ্ছাময়। অর্থাৎ— তিনি ইচ্ছা করা মাত্রই সবকিছু হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তিনি তাঁর ইচ্ছা দ্বারাই তো নারী বা মানবজাতির আদি মাতাকে সৃষ্টি করতে পারতেন। আর আদি পিতাকেও তো তিনি সেভাবেই সৃষ্টি করে ছিলেন। তাহলে আদি পিতার পাঞ্জরাস্থি দিয়ে সেই নারী বা আদি মাতাকে তিনি সৃষ্টি করতে গেলেন কেন?

পবিত্র কুরআন, হাদিসের গ্রন্থসমূহ এবং কুরআন-পূর্ববর্তী ইসলামী বিধানসমূহের আলোকে আমি এই প্রশ্নের যে উত্তর খুঁজে পেয়েছি মোটামুটিভাবে তার সারমর্ম হলো ঃ

আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা দ্বারা আদি মাতাকে সৃষ্টি করতে পারতেন একথা সত্য। কিন্তু বিশেষ কারণে তিনি তা করেননি। আর সেই বিশেষ কারণটি হলো— নারীকে নরের অর্ধাঙ্গিনী বা দেহের অংশ বিশেষ হিসাবে একটা অনুভূতি সৃষ্টি করা; যার ফলে উভয়ের মধ্যে একাত্মতা, সম্প্রীতি ও ভালোবাসার সৃষ্টি হতে পারে। বলাবাহুল্য, এই সম্প্রীতি বা ভালোবাসা সৃষ্টির অন্য একটি বিশেষ কারণও রয়েছে।

সেই কারণটি হলো— ইসলামী পরিভাষায় মানুষকে বলা হয় 'ইনসান'। উন্স্ ধাতু থেকে এই শব্দটির উদ্ভব। উন্স্ শব্দের অর্থ হলো— সম্প্রীতি, প্রেম, ভালোবাসা প্রভৃতি। অর্থাৎ নর-নারীর পারস্পরিক সম্প্রীতি, প্রেম ও ভালোবাসার ফসলরূপে জন্মগ্রহণ করবে এবং সম্প্রীতি ও প্রেম ভালোবাসা দিয়ে সমাজ গড়ে

www.pathagar.com

তুলবে সেই কারণেই ইসলামের পরিভাষার মানুষের নাম রাখা হয়েছে— 'ইনসান'।

অতঃপর জান্নাত-এর কথায় আসা যাক। বাণীটির উদ্ধৃতাংশ থেকে সুস্পষ্টরূপে জানতে পারা যাচ্ছে যে, মানবজাতির আদি পিতা মাতাকে জান্নাতে 'অবস্থান' ও ইচ্ছামত আহার-বিহার করতে এবং একটি বিশেষ বৃক্ষের নিকটবর্তী হওয়া থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছিল।

জান্নাত এবং নিষিদ্ধ বৃক্ষটি সম্পর্কে বাইবেল এবং কুরআনের ব্যাখ্যাতাগণ ভিন্ন ভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এই সব অভিমতের কোনটা সত্য এবং কোনটা সত্য নয় তা যাঁচাই করার সুযোগ এখানে নেই। আমরা সরলভাবে জান্নাতকে জান্নাত এবং নিষিদ্ধ বৃক্ষকে নিষিদ্ধ বৃক্ষ ধরে নিয়ে আলোচনার সুবিধার জন্য 'প্রস্তুতি পর্ব' উপ-শিরোনাম দিয়ে একটি নিবন্ধ এবং সেই নিবন্ধের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ নিম্নে ভিন্ন ভিন্নভাবে তুলে ধরবো।

প্রস্তুতি পর্ব

❑ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, আদি মানব-মানবীকে জান্নাতে 'অবস্থান' করতে বলা হয়েছিল— 'স্থায়ীভাবে' বসবাস করতে বলা হয়নি। বলাবাহুল্য, এটা পবিত্র কুরআনের বৈশিষ্ট্য এবং সত্যতার অন্যতম প্রমাণ।

বিষয়টিকে খুলে বললে বলতে হয় যে, পবিত্র হাদিসের ভাষায় মানুষ তার পরকালের শস্য-ক্ষেত্ররূপী এই পৃথিবীতে যেরূপ চাষাবাদ করবে তদনুযায়ী মৃত্যুর পর পারলৌকিক জীবনে স্থায়ীভাবে ফল ভোগ করতে থাকবে। সুতরাং জীবিত অবস্থায় অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে স্থায়ীভাবে জান্নাতে বসবাসের কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। আর পারে না বলেই মানবজাতির আদি পিতা মাতাকে জান্নাতে 'অবস্থান' করতে বলা হয়েছিল। আর 'অবস্থান' যে অস্থায়ী বা সাময়িকই হয়ে থাকে সে কথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না।

একটি কথা এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, পৃথিবীর প্রতিনিধি হিসাবে আদিমানবের জন্য এটা ছিল 'প্রস্তুতি পর্ব'। জান্নাতে অবস্থানও ছিল সেই প্রস্তুতিরই অংশ বিশেষ। অর্থাৎ— জান্নাতে 'অবস্থানের সুযোগের তিনি জান্নাত সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তিনি এবং তার বংশধররা তাদের পার্থিব কর্মক্ষেত্রকে সুন্দর করে' গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন— এটাই ছিল জান্নাতে অবস্থান দানের উদ্দেশ্য। বলাবাহুল্য, অন্যথায় দু'দিনের জন্য জান্নাতে অবস্থান করতে দেয়ার কোনও তাৎপর্য বা যুক্তি-সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না।

www.pathagar.com

❑ জান্নাতে অবস্থানকালে ইচ্ছামত আহার-বিহার ও নিষিদ্ধ বৃক্ষের নিকটবর্তী না হওয়া এ দুটি কাজ ছাড়া অন্য কোনও কাজ এমনকি যে ইবাদতকে মানবসৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য বলে বলা হয়েছে তা সম্পাদনের নির্দেশও দেয়া হয়েছিল না।

এর কারণ এই হতে পারে যে (ক) খাদ্যগ্রহণ ছাড়া জীবনধারণ সম্ভব ছিল না (খ) বৃক্ষের মধ্যে এমন বৃক্ষও রয়েছে যা জীবনের পক্ষে ভীষণভাবে ক্ষতিকর, অতএব তা থেকে দূরে থাকা প্রয়োজন। (গ) আদিপিতার জন্য ইবাদত করার মতো পরিবেশ তখনো সৃষ্টি হয়েছিল না।

অবশ্য ইবাদতের নির্দেশ না দেয়ার অন্য একটি বিশেষ কারণও থাকতে পারে আর তা হলো— জান্নাত ইবাদতের স্থান নয়— ইবাদতের ফল ভোগের স্থান।

❑ এর পরে 'নিষিদ্ধ বৃক্ষের' কথায় আসা যাক। মানবজীবনে বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশি হাজার হাজার বছরের গভীর গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তার কিছুটা আমরা জানতে সক্ষম হয়েছি। অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও মানবজীবনের টিকে থাকা তথা শ্বাস-প্রশ্বাসগ্রহণে বৃক্ষের যে বিরাট অবদান রয়েছে সেকথা আজ আমরা জানতে পেরেছি।

অথচ ভেবে আশ্চর্যান্বিত না হয়ে পারা যায় না যে, আল্লাহর বিধান জান্নাতে আদি মানবমানবীর অবস্থান, সেখানে বৃক্ষের বিদ্যমানতা এবং একটি বিশেষ বৃক্ষের নিকটবর্তী হাওয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে আজ থেকে হাজার হাজার বছর পূর্বে মানবজীবনে বৃক্ষের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে।

বলাবাহুল্য, যাতে তাদের পার্থিব জীবনে বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যবহার সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণার কাজে উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করতে পারে সে কারণেই প্রস্তুতি-পর্বে অনুষ্ঠিত এই ঘটনার বিবরণ তাদের সম্মুখে চিরভাস্বর করে রাখা হয়েছে। অবশ্য এর অন্য উদ্দেশ্যও রয়েছে পরে সে সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো।

ধরার বুকে মাটির মানুষ

পবিত্র কুরআন, হাদিসের গ্রন্থসমূহ এবং আল্লাহর দেয়া পূর্ববর্তী বিধানসমূহের বর্ণনা থেকে জানতে পারা যায় যে, শয়তানের প্ররোচনায় প্রথমে আদি মাতা উক্ত নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করেন এবং পরে আদি-পিতাকে তা ভক্ষণ করান।

www.pathagar.com

বলাবাহুল্য, ব্যাখ্যাতা ও ভাষ্যকারদের মধ্যে এ নিয়েও প্রচুর মতভেদ রয়েছে, আমরা তা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না।

বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, আদি মানব-মানবী তথা মানবজাতির আদি পিতা মাতার 'নীচে নেমে আসা' বা জান্নাত বিচ্যুতিকে শয়তানের প্ররোচনা এবং নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের পরিণাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কথাকে বিশেষভাবে মনে রেখে অতঃপর আমরা কিছুটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিষয় দুটিকে ভেবে দেখতে চেষ্টা করবো এবং আমাদের এই চেষ্টার ফলাফলকে 'শয়তান কী এবং কেন?' ও 'বিজ্ঞানের বিভ্রাট' এই দুটি উপশিরোনাম দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে নিম্নে তুলে ধরবো। তৎপূর্বে প্রস্তুতি-পর্বের এই সব ঘটনার বিবরণ কেন আল্লাহর বিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সে সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা যাচ্ছে ঃ

আমরা জানি, মানুষ ইতিহাস সৃষ্টি করে এবং ইতিহাস যারা লিখে তারাও মানুষই। অতএব ইতিহাস লিখার পূর্বে ভাষার উদ্ভাবন করতে এবং ইতিহাস লিখার মতো মন-মানস গড়ে উঠতে যে হাজার হাজার বছর কেটে গিয়েছে সেকথা সহজেই অনুমেয়।

অতএব ইতিহাস লিখার কাজ যে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের হাজার হাজার বছর পরে শুরু হয়েছিল; ফলে এই শুরু হওয়ার পূর্ববর্তী হাজার হাজার বছরের ইতিহাস লিখা যে সম্ভব হয়েছিল না অর্থাৎ আদিম জামানার হাজার হাজার বছরের ইতিহাস যে মানুষের অজ্ঞাতই থেকে যাচ্ছে সেকথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না।

অবশ্য প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায়-রত ব্যক্তিরা গবেষণা এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে এই হাজার হাজার বছরের ইতিহাস অর্থাৎ ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের জন্য অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে এ কাজে তাঁরা কতটা সাফল্য অর্জনে সক্ষম হবেন সেকথা বলা কঠিন। তাঁদের এ প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে সফল হোক এ কামনাই করি।

কিন্তু তার পরও কথা থেকে যায় যে তাঁরা যদি আদি-মানব মানবীর পৃথিবীতে পদার্পনের এই দিনটি এবং তার পরবর্তী গোটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের যাবতীয় তথ্যাবলী সংগ্রহ করে মানবজাতির ইতিহাস সঙ্কলনে সক্ষমও হন তবু সেটাকে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বলা যাবে না।

কেননা, পৃথিবীতে আবির্ভাবের পূর্ববর্তী এই প্রস্তুতি-পর্বের কোনও নিদর্শনই পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হবেনা। আর সম্ভব হবেনা বলেই এই প্রস্তুতি-পর্বে সংঘটিত ঘটনাবলীর মধ্যে গোটা পার্থিব জীবনের জন্য যেসব মূল্যবান শিক্ষা ও পথ-নির্দেশ রয়েছে আদম সন্তানদের তা থেকে চিরবঞ্চিতই

www.pathagar.com

থেকে যেতে হবে। বলাবাহুল্য, এই কারণেই মানবের যিনি সৃষ্টিকর্তা, পরিচালক, ব্যবস্থাপক এবং বিশ্বের সবকিছু যার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে স্বয়ং তিনি মানবজাতিকে অবহিত করনের জন্য তাঁর প্রেরিত বিধানসমূহের মাধ্যমে সেই সব ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এমন সুস্পষ্ট, প্রাঞ্জল এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তুলে ধরার ব্যবস্থা করেছেন।

শয়তান কি এবং কেন?

অহমিকাবশত আদম বা মানবজাতির আদি পিতাকে সিজদা করার নির্দেশ অমান্য করার কারণে বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত জনৈক জিন যে অভিশপ্ত এবং শয়তান বলে আখ্যায়িত হয়েছে সেকথা আমরা ইতোপূর্বে জানতে পেরেছি।

শয়তান চর্ম-চক্ষে পরিদৃশ্যমান নয় : যা চর্মচক্ষে পরিদৃশ্যমান নয় তার সম্পর্কে একটা ধারণায় উপনীত হতে হলে আন্দাজ-অনুমান ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। একথা বলাই বাহুল্য, যে ভিন্ন ভিন্ন মানুষের আন্দাজ-অনুমানের ফল ভিন্ন ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক এবং হয়েছেও তা-ই।

ফলে শয়তান সম্পর্কেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা গড়ে উঠেছে। আর তারই ফল হিসেবে রচিত হয়েছে বিশ্বাস্য-অবিশ্বাস্য এবং অদ্ভুত অলৌকিক নানা কথা-কাহিনী, নানা উপাখ্যান এবং আরো অনেক কিছু। নাম ভিন্ন ভিন্ন হলেও পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি ধর্মগ্রন্থে শয়তানের পরিচয় এবং তার কার্যকলাপ সম্পর্কে ভীতিপ্রদ নানা কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে। যেসব ধর্মের লিখিত কোনও গ্রন্থ নেই সে সব ধর্মে যারা বিশ্বাসী তাদের মন-মানসেও ভিন্ন ভিন্ন নামে শয়তানের পরিচয় এবং কার্যকলাপ সম্পর্কীয় ধারণা বদ্ধমূল থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহর বিধানসমূহেও শয়তানের মোটামুটি পরিচয় এবং কার্যকলাপের মোটামুটি বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, শয়তান চর্মচক্ষে পরিদৃশ্যমান নয় বলে তার সম্পর্কে আন্দাজ-অনুমান ও জল্পনা-কল্পনার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। ফলে এত সব কল্প-কাহিনী রচিত হয়েছে যে তা থেকে শয়তানের আসল পরিচয় খুঁজে বের করা কোনওক্রমেই সম্ভব নয়।

অতএব আমরা সেদিকে না গিয়ে আল্লাহর বিধানসমূহ এবং প্রাকৃতিক নিয়মের আলোকে শয়তান সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেষ্টা করবো।

শয়তান চর্মচক্ষে পরিদৃশ্যমান নয় বলে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ প্রায় সকলে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে ভীষণভাবে সন্দীহান। অথচ চর্মচক্ষে পরিদৃশ্যমান নয় এমন অনেক কিছুরই অস্তিত্বে তারা বিশ্বাস পোষণ করেন। বলাবাহুল্য, আমরাও শয়তানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। আমাদের এই বিশ্বাসের প্রধান কারণ— আল্লাহর বিধানে শয়তানের অস্তিত্ব সম্পর্কে পুনঃ পুনঃ ঘোষণা রয়েছে।

www.pathagar.com

শয়তানের অস্তিত্বে আমাদের বিশ্বাস থাকার অন্য কারণ হলো— প্রাকৃতিক নিয়ম। অবশ্য এই কারণের প্রতিও আল্লাহ্‌র বিধানের সমর্থন রয়েছে। প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে ঃ

প্রাকৃতিক নিয়ম বিদ্যমান থাকা এবং পৃথিবীর দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান সবকিছু জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করার কথা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রকৃতির মধ্যে নর-নারী, দিন-রাত, সাদা-কালো, ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, ঠাণ্ডা-গরম, কঠিন-তরল প্রভৃতি পরস্পর বিপরীত-ধর্মী পদার্থ এবং অবস্থা যে বিদ্যমান রয়েছে আমরা স্বচক্ষেই তা দেখতে পাচ্ছি। ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি যেসব পদার্থ খুব বেশি শক্তিশালী অণুবিক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা সম্ভব নয় এমন পদার্থসমূহও যে স্ত্রী-পুরুষ বা ঋণাত্মক (Negative) ধনাত্মক (Positive) এই বিপরীত ধর্মী দু'টি ভাগে বিভক্ত বৈজ্ঞানিক মাত্রেরই সেকথা জানা রয়েছে।

দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তির সংঘর্ষে একটি তৃতীয় শক্তির উদ্ভব ঘটার কথা ইতোপূর্বে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। মানুষের মধ্যে বিদ্যমান পরস্পর বিরোধী দুটি শক্তির সংঘাতেই যে তৃতীয় শক্তি হিসেবে 'ইনসানিয়াত' বা 'মানবতার' উদ্ভব হয়ে থাকে ইতোপূর্বে সেকথাও বলা হয়েছে।

সংঘাত ছাড়া শক্তি এবং শক্তি ছাড়া টিকে থাকা শুধু কল্পনাতীতই নয়— প্রকৃতি-বিরুদ্ধও। এই পৃথিবীতে যাকে যত বেশি বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয় সে যে তত বেশি শক্তিশালী এবং প্রতিরোধ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকে সে অভিজ্ঞতা আমাদের বাস্তব, প্রত্যক্ষ এবং বংশানুক্রমিক। গাছ যত বড় ঝড়-তুফানের তাণ্ডব যে তার ওপরেই তত বেশি হয়ে থাকে সেকথাও আমাদের জানা রয়েছে।

অতএব মানবসৃষ্টির পর যতদিন 'আদম বা মানবজাতির আদি পিতাকে' 'আছমা বা নামসমূহ' শিক্ষা দেয়া হয়নি এবং সিজদার প্রশ্ন দেখা দেয়নি ততদিন শয়তান বলতে কোনও কিছুর অস্তিত্ব যে ছিল না সেকথা অনায়াসেই বুঝতে পারা যাচ্ছে।

মানবসৃষ্টির লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে এই পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব ঘটেছে বলে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। এই লক্ষ লক্ষ বছর এমনকি মানবসৃষ্টির সময়েও এই পৃথিবীতে ফেরেশতাদিসহ ছোট, বড়, অতিকায়, মহাকায় নির্বিশেষে কোটি কোটি জীব-বিদ্যমান ছিল; অথচ এই লক্ষ লক্ষ বছর শয়তানের অস্তিত্ব এমনকি নামগন্ধও ছিল না।

এই অস্তিত্ব না থাকার একটি মাত্র কারণই থাকতে পারে। আর তা হলো— শয়তানের কাজ— 'কুমন্ত্রণা দিয়ে বিপথে চালিত করা'। পক্ষান্তরে ফেরেশতাদি

www.pathagar.com

সহকারে ছোট, বড়, অতিকায়, মহাকায় নির্বিশেষে এই কোটি কোটি জীবের জীবন প্রাকৃতিক নিয়মের অলঙ্ঘ্য শৃংখলে বাঁধা, একঘেঁয়ে এবং গতানুগতিক। সুতরাং কারো মন্ত্রণা বা কুমন্ত্রণা শ্রবণ ও তাকে কাজে লাগানোর সামান্যতম সুযোগ, স্বাধীনতা এবং অবকাশই তাদের নেই— থাকতে পারেনা। এমতাবস্থায় তাদের জন্য শয়তানের বিদ্যমানতা যে একান্তরূপেই অপ্রয়োজনীয় এবং পণ্ডশ্রম সেকথা খুলে বলার কোনও প্রয়োজনই হয় না।

অতএব মানবের জন্যই যে শয়তানের প্রয়োজন সেকথা অনায়াসে বুঝতে পারা যাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো— মানবের জন্যই যদি প্রয়োজন তবে মানবসৃষ্টির সাথে সাথেই কেন শয়তান সৃষ্টি বা আজাজিলকে ইবলিস বা শয়তানে পরিণত করা হলো না? আর কেনইবা আদম কর্তৃক আছমা বা নামসমূহ শিক্ষা ও তা বিবৃতকরণ পর্যন্ত প্রতীক্ষা করতে হয়েছিল?

এই প্রশ্নের উত্তরও একটিই হতে পারে; আর তা হলো— শিক্ষা বা জ্ঞানহীন মানুষ মনুষ্যত্বের জীবদেরই সমতুল্য; তাদেরকে কুমন্ত্রণা দেয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। কেননা মুর্খতা বা জ্ঞানহীনতার কারনে তারা নিজেরাই শুধু কুপথে পরিচালিত হবে না আরো দশজনকেও সেপথে নিয়ে যাবে। পবিত্র কুরআনেও জ্ঞান-বিবেকহীন মানুষকে পুনঃ পুনঃ চতুস্পদ জন্তু অপেক্ষাও হীন বলা হয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের জন্য শয়তানের করণীয় কিছুই থাকতে পারে না। আর পারেনা বলেই প্রতীক্ষা করতে হয়েছিল এবং উপযুক্ত সময়ে আজাজিলকে ইবলিস বা শয়তানে পরিণত করা হয়েছিল।

এখানে আজাজিল ও ইবলিস শব্দের তাৎপর্য বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য বলে মনে করি। 'আজাজিল' শব্দের অর্থ 'আল্লাহর দাস'; । ঘটনার বিবরণ থেকে জানা যায়, জনৈক জিন আল্লাহর ইবাদত করতে করতে ফেরেশতাদেরও ছাড়িয়ে যায় এবং তাদের নেতৃত্ব লাভ করে; ফলে তাকে আজাজিল বা আল্লাহর দাস এই উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

আবার এই আজাজিলই যখন অহমিকাবশত আদমকে সিজদা করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে তখন সাথে সাথে তার ওপর কঠোর শাস্তি নেমে আসে— ইবলিস (আশাহীন ও অভিশপ্ত) বা শয়তান আখ্যা দিয়ে তাকে বিতাড়িত করা হয়।

বলাবাহুল্য, আল্লাহর বিধান যে কত কঠোর ও নিরপেক্ষ এবং আল্লাহর দাসকেও যে অহমিকার কারণে ইবলিস বা শয়তানে পরিণত হতে হয় এই ঘটনার মাধ্যমে মানবজাতির জন্য তার এক দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা তুলে ধরা হয়েছে। অতীব দুঃখের বিষয় এ থেকে শিক্ষাগ্রহণ না করে আমরা দিন রাত অবলীলাক্রমে শয়তানের ভূমিকা পালন করে চলেছি।

www.pathagar.com

আর একটিমাত্র বিষয়ের প্রতি কিছুটা আলোকসম্পাত করেই প্রসঙ্গের ইতি টানছি।

কেউ কেউ মনে করেন যে, শয়তান সৃষ্টিই যত অনর্থের মূল। অর্থাৎ তাদের বিবেচনায় শয়তান সৃষ্টি না করা হলে মানুষ পাপের সাথে চলতো না। ফলে দুনিয়ার অশান্তি এবং পরকালের শাস্তিও ভোগ করতে হত না। শয়তানের তাৎপর্য বুঝতে না পেরে কেউ কেউ শয়তান সৃষ্টির জন্য আল্লাহকে এবং নিজের পাপের জন্য শয়তানকে দায়ী করে থাকে।

বলাবাহুল্য, এসবই ভ্রান্ত ধারণা-প্রসূত। এখানে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই এবং প্রয়োজনও নেই। কেননা, মানুষ যাতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ ও পারলৌকিক পুরস্কারের যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ পায় সে জন্যই শয়তান সৃষ্টি যে অপরিহার্য ছিল সুধী পাঠকবর্গ একটু চিন্তা করলেই সেকথা অনায়াসে বুঝতে পারবেন বলে দৃঢ় আশা পোষণ করি।

শয়তান সৃষ্টির অপরিহার্যতা সম্পর্কে এখানে প্রাকৃতিক নিয়মের কথা তুলে ধরা যেতে পারে। আমরা জানি, প্রকৃতির মধ্যে রাত-দিন, সাদা-কালো সুন্দর-অসুন্দর, তরল-কঠিন, ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি পরস্পর বিরোধী অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। পরস্পর বিরোধী বা একে অন্যের বিপরীত হলেও এদের একটির জন্য অন্যটির অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা শুধু প্রয়োজনীয়ই নয়— একান্ত-রূপে অপরিহার্যও। কেননা এদের একটি না থাকলে অন্যটির কোনও তাৎপর্য এবং গুরুত্বই থাকে না।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, দুঃখ আছে বলেই সুখকে সুখ বলে অনুভব করতে পারি, দুঃখকে দূর করতে এবং সুখকে একান্তরূপে আপনার করে নিতে পাগলপারা হই— অবিরাম সংগ্রাম করে চলি। দুঃখ যদি না থাকতো তাহলে একঘেঁয়ে সুখের অত্যাচারে জীবন বিষময় হয়ে উঠতো। মোটকথা, দুঃখ না থাকলে সুখকে সুখ বলে অনুভব করা সম্ভব হতো না, সুখের মূল্য-মর্যাদা এবং আদর-কদরও থাকতো না।

এমনিভাবে অন্ধকার না থাকলে আলো, রাত না থাকলে দিন, পাপ না থাকলে পুণ্য, মন্দ না থাকলে ভালোর কোনও মূল্য-মর্যাদা থাকতো না। গোটা সৃষ্টিই বৈচিত্র্য-বৈশিষ্ট্যহীন, একঘেঁয়ে এবং গড্ডলিকা প্রবাহে পরিণত হতো।

এ জন্যই পবিত্র কুরআন জোড়া জোড়া সৃষ্টিকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করেছে। কোথাও বা এই জোড়া জোড়া সৃষ্টিকে সৃষ্টির সামঞ্জস্য বিধান, সৌকর্য সাধন, সৌন্দর্য সংরক্ষণ প্রভৃতির জন্য প্রয়োজনীয় ছিল বলে উল্লেখ করেছে। অতএব দুঃখ, মন্দ, অন্ধকার, পাপ প্রভৃতিকে আমরা যত বিষ-নজরেই দেখি না কেন সৃষ্টির স্বার্থ এবং যথাক্রমে সুখ, ভালো, আলো, পুণ্য

www.pathagar.com

প্রভৃতির মূল্য-মর্যাদা রক্ষার প্রয়োজনেই যে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে সেকথা অনায়াসে বুঝতে পারা যাচ্ছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চিন্তা করলে প্রাকৃতিক কারণে এবং মানবের শ্রেষ্ঠত্বকে দেদীপ্যমান করে তোলার জন্যই যে শয়তান সৃষ্টি অপরিহার্য ছিল সেকথা বুঝতে পারা যাবে বলে আশাকরি। এবং শয়তানকে সৃষ্টি না করা হলে মানুষও যে অন্যান্য ইতরজীবের পর্যায়ভুক্ত হতে পারতো এবং তার কোনও মূল্য-মর্যাদাই থাকতো না, আশাকরি সেকথা বুঝতে কারো কষ্ট হবে না।

আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই রয়েছেন যাঁরা প্রায়শই পাপ-দুর্নীতিকে 'উৎখাত' 'খতম' বা 'নির্মুল' করার শপথ গ্রহণ করেন এবং অন্যকেও এ কাজে এগিয়ে আসার জন্য উদাত্ত কণ্ঠে আবেদন নিবেদন পেশ করেন।

হয়তো তাঁরা এ সম্পর্কে ইসলাম কি বলে সেকথা জানেন না অথবা অন্যকোনও কারণে এটা করে থাকেন। ওপরের এই আলোচনা থেকে বুঝতে পারা সহজ যে, পাপ-দুর্নীতি নির্মূল বা খতম করা সম্ভব নয়— প্রকৃতি-সম্মতও নয়। পুণ্য ও সুনীতি গ্রহণীয়, আকর্ষণীয়, মর্যাদাশালী এবং ভাস্বর ও প্রাণবন্ত করে রাখার জন্যই পাপ-দুর্নীতির টিকে থাকা প্রয়োজন এবং প্রকৃতি বা ইসলামের শিক্ষাও তাই।

তবে বলে রাখা প্রয়োজন যে, পাপ-দুর্নীতি বা পুণ্য ও সুনীতি হওয়ায় বিদ্যমান কোনও বস্তু নয়; মানুষকে আশ্রয় করেই এরা টিকে থাকে এবং মানব-চরিত্রের মাধ্যমেই বিকাশ লাভ করে। প্রকৃতি ও ইসলামের শিক্ষা হলো— একদিকে পাপ দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামরত থেকে তাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করা আর অন্যদিকে যথাযোগ্য অনুশীলনের মাধ্যমে পুণ্য ও সুনীতিকে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত, প্রতিষ্ঠিত ও প্রাণবন্ত করে তোলা।

বিজ্ঞানের বিভ্রাট

বিজ্ঞান অর্থ— বিশেষ জ্ঞান বা গবেষণা-লব্ধ অভিজ্ঞতা। আরো বিস্তারিত-ভাবে বললে বলতে হয়— যথাযোগ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিন্তা-গবেষণার সাহায্যে বস্তু বা বস্তু বিশেষের অন্তর্নিহিত গুণ, অবস্থা, শক্তি, কার্যকারিতা প্রভৃতি সম্পর্কে যে জ্ঞান অর্জিত হয় তাকেই বলা হয়— বিজ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞান।

ইতোপূর্বে আমরা পবিত্র কুরআন থেকে জানতে পেরেছি যে, আদম বা মানবজাতির আদি পিতাকে আছমা বা নামসমূহ শিক্ষা দেয়া হয়েছিল। যেহেতু নাম বস্তুর এবং বস্তু নামের উপযোগী হয়ে থাকে এবং নামটি বলার সাথে সাথে উক্ত নামের সাহায্যে শ্রোতার মনে বস্তুটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকে

www.pathagar.com

এবং তা-ই স্বাভাবিক, সেই কারণেই আছমা বা নামসমূহ আমরা বস্তুবিজ্ঞান বলে উল্লেখ করেছি।

এখানে প্রশ্ন জাগা খুবই স্বাভাবিক যে, যখন এই আছমা বা বস্তু বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়েছিল তখন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার সামান্যতম সুযোগও ছিল না। এমতাবস্থায় এই শিক্ষা দান কিরূপে সম্ভব হয়েছিল?

এই প্রশ্নের কয়েকটি উত্তর হতে পারে। এখানে সে সব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার কোনও সুযোগই নেই। অতএব সংক্ষেপে কিছুটা আলোকপাত করেই আমাদের মূল বক্তব্য শুরু করতে হবে।

ক) যেহেতু আল্লাহ সর্বশক্তিমান, ইচ্ছাময় এবং অঘটন ঘটন পটিয়সী শক্তির অধিকারী আর যেহেতু তিনি স্বয়ং এই শিক্ষা-দান করেছেন অতএব নিশ্চিতরূপেই মানবরচিত যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণের কোনও প্রয়োজন তাঁর ছিল না।

খ) এখানে শিক্ষা দেয়ার অর্থ এও হতে পারে যে, তিনি আদম বা মানবের আদি পিতাকে 'শিক্ষা লাভের যোগ্যতা প্রদান' করে ছিলেন। কেননা, যোগ্যতাই যদি না থাকে তবে শত চেষ্টা করেও শিক্ষাদান সম্ভব হতে পারেনা। এই অর্থে যদি যোগ্যতা সম্পন্ন করে তোলাকে শিক্ষাদান বলা হয়ে থাকে তবে সেটাকে ভুল বলে অভিহিত করা যায় না।

গ) চিরকালই প্রায় প্রতিটি সমাজে সংখ্যায় অতি নগণ্য হলেও এমন কিছু মানুষের সন্ধান পাওয়া যায় যারা বিশেষভাবে প্রতিভাধর হয়ে থাকেন। লেখাপড়া না শিখেও কোনও কোনও বিষয়ে তারা এমন প্রতিভার অধিকারী হয়ে থাকেন যে, বড় বড় শিক্ষিত মানুষকেও কোনও কোনও বিষয়ে তাঁদের কাছে হার মানতে হয়। অতএব আদি মানবকে যদি তেমন প্রতিভার অধিকারী করে সৃষ্টি করা হয়ে থাকে তবে লেখাপড়া না শিখে এবং যন্ত্রপাতির সাহায্য না নিয়ে তার পক্ষে বস্তুবিজ্ঞানে পারদর্শী হওয়াটা মোটেই অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য হতে পারে না।

ঘ) পৃথিবীতে যেসব প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে তাঁদের প্রায় সকলেই নিরক্ষর ছিলেন। বিশেষ করে শেষ এবং শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ (স) নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার যে তাঁর কাছে উন্মুক্ত হয়েছিল সেকথাও প্রায় সকলেরই জানা রয়েছে।

পবিত্র কুরআন এবং হাদিসের গ্রন্থসমূহও তার জাজ্জল্যমান সাক্ষ্য হিসাবে বিদ্যমান রয়েছে। অতএব বিনা যন্ত্রপাতি এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়া আদি মানবকে বস্তু-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া অবিশ্বাস্য বা অসম্ভব বলা যেতে পারে না।

www.pathagar.com

অতঃএব আসুন, মানবের আদি পিতাকে এই নামসমূহ বা বস্তুবিজ্ঞান শিক্ষা দানের পরিণাম কি হয়েছিল এবং এই ঘটনার মাধ্যমে তাঁর বংশধর তথা বিশ্ব-মানবের জন্য কি উপদেশ তুলে ধরা হয়েছে তা জানতে চেষ্টা করি।

ইতোপূর্বে আলোচনা প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয়েছে যে, যেহেতু জন্মের সাথে সাথেই জীবনরক্ষার জন্য খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা প্রভৃতির প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয় এবং যেহেতু বস্তু দ্বারাই ওসব প্রয়োজন মিটানো সম্ভব অতএব মানবের আদি পিতাকে সর্বপ্রথমে সেই বস্তুবিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়েছিল।

এই বস্তুবিজ্ঞান শিক্ষার পর আদি পিতার মনে কি কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল এবং তার মাঝে তার বংশধর বা মানবজাতির জন্য কি কি উপদেশ রয়েছে নিম্নে অতি সংক্ষেপে পৃথক পৃথকভাবে সেকথা উল্লেখ করা যাচ্ছে।

ক) নামসমূহ বা বস্তুবিজ্ঞান শিখে তার বিবরণ যথাযথভাবে ফেরেশতাদের সম্মুখে বিবৃত করতে সক্ষম হওয়ায় তিনি ফেরেশতাদের সম্মান এবং জান্নাতে অবস্থানের অনুমতি লাভ করেছিলেন।

এতদ্বারা এ কথাই বোঝানো হয়েছে যে বস্তুবিজ্ঞান শিক্ষা করা ও শিক্ষাদান মানুষকে শুধু প্রভুত সম্মানের পাত্রেই পরিণত করে না তার জন্য জান্নাতের সুখসৌন্দর্য উপভোগেরও সুযোগ সৃষ্টি করে।

খ) কিন্তু এ সম্মান এবং সুখ-সম্ভোগ খুবই ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে; পরিণামে লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত হতে হয়। কারণ ঃ

গ) বস্তুবিজ্ঞান মানুষকে বস্তুলোভী ও উদর-সর্বস্ব জীবে পরিণত করে।

ঘ) শয়তানের প্ররোচনা এবং নারীর মোহের করুণ শিকারে পরিণত করে।

ঙ) আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার মানসিকতা সৃষ্টি করে।

প্রিয় পাঠকবর্গ। ইতিহাস এবং বর্তমান অবস্থার প্রতি একটু লক্ষ্য করলেই এই অবস্থাগুলো যে আবহমান কাল যাবত ঘটে চলেছে তা অনায়াসে আপনারা বুঝতে পারবেন বলে দৃঢ় আশা পোষণ করি; এ সম্পর্কীয় দু-একটি উদাহরণ অতি সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে।

❑ ধর্মীয় তথা দীনী নিয়ন্ত্রণবিহীন বিজ্ঞান কিভাবে একশ্রেণীর মানুষকে অমানুষে পরিণত করে কোটি কোটি মানুষের সর্বনাশ ঘটায় এবং কিভাবে এই সব লাঞ্ছিত মানবতার অভিশাপ এবং ঘৃণা ধিক্কারের স্রোত উক্ত বিজ্ঞানী এবং বিশেষ শ্রেণীটির লব্ধ শ্রদ্ধা-সম্মান টুকুকে তৃণের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায় মহাকালের ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করছে। এমনকি আমাদের চোখের সম্মুখেও তার বহু জাজ্জল্যমান প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।

❑ বিজ্ঞানের বলে বড় সাধ করে যেসব 'নকল জান্নাত' তাঁরা নির্মাণ করছেন মাঝে মাঝেই বিপক্ষদল অথবা শত্রু দেশের বোমার আঘাতে তা চূর্ণ-

www.pathagar.com

বিচূর্ণ হয়ে চলেছে, অনেক রথী-মহারথীকে আক্রমণের সঙ্কেত বেজে উঠতেই ওসব নকল জান্নাত ছেড়ে ভূগর্ভে বা পরিখায় আশ্রয় নিতে গিয়ে ধুলা মাটিতে গড়াগড়ি খেতে হচ্ছে; অনেককে আততায়ীর অস্ত্রাঘাতে অকালে এবং আকস্মিকভাবে নকল জান্নাত থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করতে হচ্ছে।

❑ জান্নাতের বড় সম্পদ যে অনাবিল শান্তি বিজ্ঞানের বলে নির্মিত এ সব নকল জান্নাতের অধিবাসীদের মনে তার লেশ মাত্রও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেখানে যা খুঁজে পাওয়া যাবে তার নাম— ভয়, ত্রাস, হিংসা, অতৃপ্তি, পরশ্রীকাতরতা আর সীমাহীন কামনার লেলিহান শিখা।

এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। কারণ বিজ্ঞানের জয়যাত্রা আজ একশ্রেণীর মানুষকে কিভাবে ভোগ-বিলাস ও আত্ম-পূজার মোহে দুর্মদ ও বেপরোয়া করে তুলেছে এবং বিশ্বের যাবতীয় সম্পদ লুণ্ঠণ করে সেই পূজার বেদীমূলে উৎসর্গ করার হিংস্র অভিযান কিভাবে আজ গোটা বিশ্বে ভয়, ত্রাস, বিভীষিকা আর শোষণ-নির্যাতনের রাজত্ব কায়েম করেছে তা সকলেরই জানা রয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো— বিজ্ঞান যদি এমন ধ্বংসকর এবং ক্ষতিজনকই হয় তবে বিশ্বপতি আল্লাহ মানুষকে তা শিক্ষা দিতে গেলেন কেন? পরবর্তী নিবন্ধ থেকে এই 'কেন'র উত্তর পাওয়া যাবে এবং শুধু শান্তি, কল্যাণ, নিরাপত্তা ও মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই নয়— সৃষ্টির উদ্দেশ্য অর্থাৎ— 'আলম'-এর সাহায্যে তার স্রষ্টা বা আল্লাহর অস্তিত্বের বিকাশ ঘটানোর কাজকে সফল ও সার্থক করে তোলার জন্যও যে মানুষকে বিজ্ঞান শেখানো অপরিহার্য ছিল সেকথাও জানতে পারা যাবে।

উল্লেখ্য, আল্লাহ যে তাঁর অস্তিত্বের পরিচয় জানানোর জন্যই পৃথিবী তথা 'আলম' (যদ্দারা-স্রষ্টাকে জানা যায়) সৃষ্টি করেছেন এবং 'আলম' কে জানার প্রয়োজনেই যে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে ইতোপূর্বে সেকথা বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে।

আদি মানবের কালেমা শিক্ষা

পবিত্র কুরআনের ওপরোদ্ধৃত বাণীটিতে অতঃপর যা বলা হয়েছে তার হুবহু বঙ্গানুবাদ হলো— "অনন্তর আদম স্বীয় রব" (প্রতিপালক) থেকে কালেমা (কতিপয় বাক্য) শিক্ষা করলো, তৎপর তিনি তাকে ক্ষমা করলেন; নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, করুণাময়।" — আল কুরআন, বাকারা ৪, ৩৭

লক্ষণীয় যে এই কালেমা বা কতিপয় বাক্য শেখার ফলে আদম বা মানবের আদি পিতার পাপ মার্জিত হয়েছিল বলে বলা হয়েছে। অতএব এই কালেমা

www.pathagar.com

শেখার সাথে সাথেই তিনি যে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল-ভক্ষণজনিত পাপের কথা বুঝতে পেরেছিলেন এবং অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন সেকথা অনায়াসে বুঝতে পারা যাচ্ছে।

কথাটি অন্যভাবে বললে বলতে হয়— নিয়ন্ত্রণ বিহীন আছমা বা বস্তু-বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ স্বাভাবিকভাবেই তাকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করেছিল কালেমা শিক্ষার ফলে সেকথা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এবং অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। তাকে ক্ষমা করাও হয়েছিল।

অতএব এই কালেমার সাহায্যে তার মধ্যে যে দীনের (ভুল করে আমরা যাকে 'ধর্ম' বলে থাকি) জ্ঞান জাগ্রত হয়ে উঠেছিল এতদ্বারা সেকথাই বুঝতে পারা যাচ্ছে।

বলাবাহুল্য, আছমাকে বস্তুবিজ্ঞান বলা হলে কালেমাকে 'দীনি-জ্ঞান' বা ধর্মজ্ঞান বলতে হয়। সকলের বোধগম্য হবে বলেই এখানে 'ধর্মজ্ঞান' শব্দটি ব্যবহার করতে হয়েছে এবং আলোচনার সুবিধার জন্য আরো কয়েক বার এ শব্দটি ব্যবহার করা হবে।

আসলে ধর্ম এবং দীন এক কথা নয়— একটি অন্যটির প্রতিশব্দও নয়। অজ্ঞতা, ভুল অথবা হুবহু কোনও প্রতিশব্দ খুঁজে না পাওয়ায় এতদ্দেশে ধর্মকে দীন-এর প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। সুতরাং সুধী পাঠকবর্গকে প্রতীক্ষায় রেখে আপাতত ধর্মকে দীনের প্রতিশব্দ হিসাবে গ্রহণ করে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া হবে।

মানবের আদি-পিতাকে প্রথমেই কেন আছমা শিক্ষা দেয়া হয়ে ছিল ইতোপূর্বে সেকথা বলতে গিয়ে আমরা বলেছি যে, আছমা শব্দের অর্থ— বস্তুবিজ্ঞান। মানুষের জীবনরক্ষার জন্য তার জন্মের সাথে সাথেই খাদ্য, পাণীয়, আশ্রয়, চিকিৎসা প্রভৃতির প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়! আর বস্তু দ্বারাই এসব প্রয়োজন মিটাতে হয়; অন্য কিছু দ্বারা বা অন্য কোনও ভাবে এ প্রয়োজন মিটানো সম্ভব নয়। এই সম্ভব নয় বলেই মানবের আদি পিতাকে সর্বপ্রথমে আছমা বা বস্তুবিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়েছিল।

ইতোপূর্বে আলোচনা প্রসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, ধর্ম বা দীন হলো একান্তরূপেই বিশ্বাসের বিষয়, আর কোনও কিছুকে না জানা পর্যন্ত তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। অন্যদিকে জ্ঞান-বুদ্ধি কিছুট বৃদ্ধি না পাওয়া পর্যন্ত কোনও কিছুকে জানা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে কোনও কিছুকে জানা এবং বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য যে বেশ কিছুটা বয়ঃবৃদ্ধির প্রয়োজন হয়ে থাকে সে সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা এতই বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ যে নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

www.pathagar.com

বলাবাহুল্য, সেই কারণেই খাদ্যগ্রহণ ফরজ বা অপরিহার্য হয় জন্মের সাথে সাথে। ফলে সর্বাগ্রেই খাদ্য বা বস্তু সম্পর্কে অর্থাৎ কোনটা খাদ্য, কোনটা অখাদ্য, কোনটা বিষ প্রভৃতি জানাও ফরজ বা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে দীন বা ধর্মকে জানা এবং গ্রহণ করা ফরজ এবং অপরিহার্য হয় এর বেশ কয়েক বছর পরে। অর্থাৎ জ্ঞানবুদ্ধি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে যখন কোনও কিছুকে জানা এবং বিশ্বাস করার পর্যায়ে উপনীত হয়।

আদম বা মানবজাতির আদি পিতাকে কেন প্রথমে আছমা এবং তার বেশ কিছু কাল পরে কালেমা শিক্ষা দেয়া হয়েছিল আশা করি এই আলোচনা থেকে সুধী পাঠকবর্গ সেকথা অনায়াসে বুঝতে পারবেন।

এই 'আছমা' এবং 'কালেমা' শিক্ষার তাৎপর্য নিয়ে কোনও কোনও মহলে যথেষ্ট ভুল ধারণা রয়েছে। অতএব সুধী পাঠকবর্গ যাতে এই তাৎপর্যকে সহজে উপলব্ধি করতে পারেন সে জন্য এই দু ধরনের শিক্ষার তাৎপর্য সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা তুলে ধরা যাচ্ছে ঃ

এই দুধরনের শিক্ষা বা জ্ঞানের মূল লক্ষ্য একটিই এবং এদের একটি অন্যটির পরিপূরক। অথচ ভুলবশত কোনও কোনও মহল এর একটিকে অন্যটির ঘোর বিরোধী বলে মনে করেন। শুধু তা-ই নয়— এই মনে করার কারণে কেউবা এদের একটিকে এবং কেউ বা অন্যটিকে জীবন-সর্বস্ব হিসাবে গ্রহণ করে একে অপরের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে চলেছেন; এমনকি সময়ে সময়ে একে অপরকে ধ্বংস করার জন্য রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছেন। আশ্চর্যের বিষয় এ উভয় শ্রেণীই সমাজ কর্তৃক বিশেষভাবে জ্ঞানী, গুণী এবং সম্মানার্হ বলে বিবেচিত হয়ে আসছেন। অথচ অতীব দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, এ উভয় শ্রেণীই ভ্রান্ত এবং পথ-ভ্রষ্ট।

পবিত্র হাদিসে কুদসীর বিশ্ব-সৃষ্টি সংক্রান্ত বাণীটি নিশ্চয়ই সুধী পাঠকবর্গের স্মৃতিতে জাগরুক রয়েছে। স্রষ্টাকে জানার জন্যই যে তিনি এই 'আলম' (যদ্বারা স্রষ্টাকে জানা যায়) সৃষ্টি করেছেন উক্ত বাণী থেকে সেকথা আমরা জানতে পেরেছি।

আছমা বা বস্তুবিজ্ঞান শিক্ষা করে মানুষ এই 'আলম'-এর ক্ষুদ্র-বৃহৎ যাবতীয় পদার্থের রহস্য উদ্ধার এবং ভোগ-ব্যবহার করবে; ফলে এই 'আলম'-এর স্রষ্টার পরিচয় জানা তার পক্ষে সহজ ও সম্ভব হয়ে উঠবে; বলাবাহুল্য, এটা-ই ছিল মানুষকে আছমা বা বস্তুবিজ্ঞান শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য।

কিন্তু এই শিক্ষার একটি ভিন্ন দিকও রয়েছে। আর তা হলো— এই শিক্ষা বা বস্তুবিজ্ঞানের ভুল বা অপ-প্রয়োগ মানুষকে বস্তু এবং উদরসর্বস্ব জীবে পরিণত করতে পারে— লাঞ্ছনা, অপমান এমন কি নিদারুণ ধ্বংসকেও অনিবার্য এবং

www.pathagar.com

ত্বরান্বিত করে তুলতে পারে। আর পারে বলেই— মানবজাতিকে সাবধান-সতর্ক করার জন্য আদম বা তাদের আদি পিতার পতন ও লাঞ্ছনা-অপমান সংক্রান্ত ঘটনাকে পবিত্র কুরআন এবং তৎপূর্ববর্তী আল্লাহ'র বিধানসমূহের মাধ্যমে সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

কথাটিকে এভাবেও বলা যেতে পারে যে, আছমা বা বস্তুবিজ্ঞান ছাড়া 'আলম' কে জানা সম্ভব নয়, আর আলমকে না জানলে 'আলমের স্রষ্টা'কে জানা সম্ভব হতে পারে না। পক্ষান্তরে কালেমা বা ধর্মজ্ঞান ছাড়া আছমা বা বস্তুবিজ্ঞানকে সুনিয়ন্ত্রিত ও কল্যাণপ্রসূ করা যেতে পারে না। ফলে আল্লাহকে জানা এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার জন্য যে মানুষকে সৃষ্টির সেরাজীব এবং আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে সৃষ্টি করা হলো সেই মানুষেরই শয়তানের দাস, নিকৃষ্টতম জীব এমনকি খোদাদ্রোহীতে পরিণত হওয়াই অবধারিত হয়ে দাঁড়ায়।

সুতরাং আছমা বা বস্তুবিজ্ঞানকে সুনিয়ন্ত্রিত এবং কল্যাণপ্রসূ করার জন্য কালেমা বা ধর্মজ্ঞান শিক্ষা করাও মানুষের জন্য অপরিহার্য। আছমা এবং কালেমা যে একটি অন্যটির পরিপূরক অর্থাৎ এদের একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি যে চলতে পারে না আশা করি সুধী পাঠকবর্গ এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকেই সেকথা বুঝতে সক্ষম হবেন।

পরিশেষে সুধী পাঠকবর্গকে বিশ্বের বিজ্ঞান-পাগলদের বিধ্বংসী, বেপরওয়া, বর্বরোচিত এবং মানবতাবিধ্বংস কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে এবং কালেমা বা ধর্মজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণ না থাকাই এই অবস্থার জন্য দায়ী কি না গভীরভাবে সেকথা ভেবে দেখতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে প্রসঙ্গের ইতি টানছি।

পাপ ও পাপী

পাপীমাত্রই ঘৃণার পাত্র; সুতরাং ভালো মানুষেরা তাদের সংসর্গ-সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকেন— আপন-জনদেরকেও দূরে রাখার চেষ্টা করেন। এমন অনেক পাপী রয়েছে যাদের ঘৃণার সাথে সাথে ভয়ও করা হয়। পাপীদের জন্য শুধু ঘৃণা-ধিক্কারই যে যথেষ্ট নয় আবহমানকাল যাবৎ তাদের জন্য সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং পারলৌকিক শাস্তির ব্যবস্থাও যে চালু রয়েছে সেকথা কারো অজানা নয়।

সামাজিক শাস্তি হিসাবে তাদের একঘরে করে রাখা, অর্থদণ্ড, দৈহিক শাস্তি, নিম্ন শ্রেণীতে অবনমিত করা প্রভৃতি নানা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। আর রাষ্ট্রীয় শাস্তি হিসাবে চালু রয়েছে কারাবরণ, অর্থদণ্ড, বেত্রাঘাত এমনকি প্রাণদণ্ডের মত চরম ব্যবস্থাও। অবশ্য পারলৌকিক শাস্তির তুলনায় এসব শাস্তি এতই লঘু এবং নগণ্য

www.pathagar.com

যে ধর্তব্য বলেই গণ্য করা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থ মনুসংহিতা থেকে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং পারলৌকিক এই তিন ধরনের শাস্তি সম্পর্কীয় শ্লোকসমূহ থেকে মাত্র একটি করে শ্লোক বঙ্গানুবাদসহ নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

সামাজিক শাস্তি ঃ

সদ্যঃ পততি মাংসেন লাক্ষয়া লবণেন চ।
ত্র্যহেন শূদ্রী ভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীর বিক্রয়াৎ ॥

— মনুসংহিতা ১০ম অঃ ৯২ শ্লোক।

অর্থাৎ— ব্রাহ্মণ মাংস, লাক্ষা ও লবণ বিক্রয় করা মাত্রই পতিত হয়, এক-নাগারে তিন দিন দুগ্ধ বিক্রয় করলে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

এতদ্বারা বুঝতে পারা যাচ্ছে যে ব্রাহ্মণদের পক্ষে মাংস, লাক্ষা, লবণ ও দুগ্ধ বিক্রয় পাপজনক। অতএব কোনও ব্রাহ্মণ যদি প্রথমোক্ত দ্রব্যত্রয়ের কোনও একটি অথবা পরপর তিন দিন দুগ্ধ বিক্রয় করে তবে এই পাপের শাস্তি হিসাবে সমাজ তাকে শূদ্র হিসাবে গণ্য করবে উচ্চ বর্ণের সাথে তার আর কোনও সম্বন্ধ সম্পর্ক থাকবে না।

রাষ্ট্রীয় শাস্তি ঃ

যেন কেন চিদঙ্গেন হিংস্যাচ্চে চ্ছ্রেষ্ঠ মন্ত্যজঃ

... ...

পাদয়োদ্দার্টি কায়াঞ্চ গ্রীবায়াং বৃষণেষুচ।

— ঐ ৮ম অঃ ২৭৯-২৮০ শ্লোক

অর্থাৎ— শূদ্র করচরনাদির মধ্যে যে অঙ্গ দ্বারা শ্রেষ্ঠ জাতিকে প্রহার করে রাজা তার সেই অঙ্গ ছেদন করবেন— এ হচ্ছে মনুর আজ্ঞা।

শূদ্র যদি শ্রেষ্ঠ জাতিকে মারবার জন্য হস্ত উত্তোলন করে অথবা পদ উত্তোলন করে তবে হস্তের উত্তোলনে হস্ত এবং পাদোত্তলনে পাদচ্ছেদন দণ্ড প্রাপ্ত হবে। শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের সহিত একাশনে উপবেশন করে তবে রাজা তার কটিদেশে লৌহময় তপ্ত শলাকায় অঙ্কিত করে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করবেন অথবা যেন মৃত্যু না হয় এরূপ করে তার পাছা কেটে দেবেন।

কেউ যদি দর্প করে ব্রাহ্মণের গায়ে শ্লেষ্মা দেয়, তা হলে তার ওষ্ঠাধর ছেদন করবেন এবং প্রস্রাব করে দিলে লিঙ্গচ্ছেদন করবেন, ব্রাহ্মণের গাত্রে অধোবায়ু ত্যাগ করলে গুহ্যদেশ ছেদন করবেন।

শূদ্র যদি অহংকারে হস্ত দ্বারা ব্রাহ্মণের কেশ গ্রহণ করে তবে তার হস্তদ্বয় ছেদন করবেন এবং হিংসার জন্য পাদদ্বয় গ্রহণে, চিবুক স্পর্শে, গ্রীবা গ্রহণে বা অন্তকোষ গ্রহণে হস্তদ্বয় ছেদন দণ্ড করবেন।

www.pathagar.com

পারলৌকিক শাস্তি ঃ

ভোজনাভ্যঞ্জ নাদ্দানাদ্ যদন্যৎ কুরুতে তিলৈঃ
কৃমীভূতঃ শ্ববিষ্ঠায়াং পিতৃভিঃ সহ মজ্জতি ॥

— ঐ ১০ম অঃ ৯১ শ্লোক।

অর্থাৎ— ভোজন, মর্দন ও দান ব্যতিরেকে যদি অন্য নিমিত্ত তিল বিক্রয় করে তবে ঐ দোষে পিতৃ-পিতামহ প্রপিতামহের সঙ্গে কৃমিত্ব প্রাপ্ত হয়ে পরলোকে কুকুরের বিষ্ঠায় পতিত হয়।

এ থেকে পরিষ্কাররূপে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, এই শাস্ত্রানুযায়ী ভোজন, মর্দন ও দান এই তিন কাজ ব্যতীত তিল বিক্রয় নিষিদ্ধ এবং মহা-পাপজনক। কোনও ব্যক্তি যদি এই তিন কাজ ছাড়া অন্য কোনও কাজের জন্য তিল বিক্রয় করে তবে পরকালে সেই ব্যক্তি তার পিতা-ঠাকুর দাদা এমনকি ঠাকুর দাদার পিতা অর্থাৎ চার পুরুষ কৃমি হয়ে অনন্তকাল কুকুরের বিষ্ঠার মধ্যে বিচরণ করবে।

ধর্মীয় বিধানের মতে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শাস্তির চেয়ে পারলৌকিক শাস্তি যে কত প্রচণ্ড এবং ভয়াবহ আশা করি এ থেকে তা বুঝতে পারা যাবে।

এই পটভূমিকাটুকুর পরে এ বারে আসুন, পবিত্র কুরআন-বর্ণিত আদম বা আদি-মানব সংক্রান্ত ঘটনাটির প্রতি আমরা আমাদের মনযোগকে নিবদ্ধ করি ঃ

বলা আবশ্যক যে, আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করার কারণে আদি পিতা পাপী হয়েছিলেন এবং সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগের জন্যই তাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে এমন একটা ধারণা খ্রিস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। শুধু তা-ই নয়; আদি পিতার এই পাপের কারণে তাঁর বংশধররা অর্থাৎ— গোটা মানবজাতিই যে পাপী হয়ে জন্মগ্রহণ করে এমন একটা ধারণাও তাঁদের মধ্যে বিদ্যমান থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য, তাঁদের এই ধারণার সাথে পবিত্র কুরআনের বর্ণনার বিশেষ কোনও সম্পর্ক নেই। তা ছাড়া পবিত্র কুরআনের শিক্ষাও এ ধরনের ধারণা বিশ্বাসকে সমর্থন করেনা।

বাইবেলের আদি মানবসংক্রান্ত বিবরণকে কেন্দ্র করেই যে খ্রিস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিদের মনে এই ধারণা গড়ে উঠেছে সেকথা বলাই বাহুল্য। অথচ শিশুমাত্রই যে নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক এবং পাপের অনুষ্ঠান না করা পর্যন্ত কোনও মানুষকে যে পাপী সাব্যস্থ করা যেতে পারেনা— আবহমান কাল থেকেই সেকথা আমরা জেনে আসছি— বিশ্ব-বিবেকও সেই রায়ই প্রদান করে। এমতাবস্থায় আল্লাহর অন্যতম বিধান হয়ে বাইবেল কর্তৃক বিশ্বের সকল মানুষকে 'জন্মগতভাবে পাপী' বলে রায় প্রদান কি করে সম্ভব হতে পারে?

www.pathagar.com

এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য বাইবেল অর্থাৎ বাইবেল নামক যে গ্রন্থখানা আমাদের সম্মুখে রয়েছে তার পরিচয় জানার প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। অথচ অনেকেরই তেমন সুযোগের অভাব রয়েছে। স্থানাভাববশত এখানেও বাইবেলের সার্বিক পরিচয় তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছে না। আবার বিষয়টির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কথাও চিন্তা করা যাচ্ছে না। অগত্যা মোটামুটি একটা ধারণায় পৌছানোর জন্য ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে তুলে ধরা যাচ্ছে।

বাইবেলের পাঠকমাত্রই অবগত আছেন যে, মহাত্মা যীশুখৃস্ট তাঁর ত্রিশ বছর বয়ক্রমকালে প্রচারকার্য শুরু করেন এবং শত্রুপক্ষের প্রবল বিরোধিতার মুখে মাত্র তিনটি বছর কোনওক্রমে প্রচারকার্য চালিয়ে যেতে সক্ষম হন। এই তিন বছরে মাত্র দ্বাদশ ব্যক্তি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অবশেষে এই দ্বাদশ শিষ্যেরই অন্যতম 'যিহুদা'র কারসাজিতে তিনি শত্রুহস্তে ধৃত ও নিহত হন।

প্রচারকার্য শুরু করার সাথে সাথেই যে তদানীন্তন রাজশক্তি, যাজক সম্প্রদায় এবং তাদের অধীনস্থ জনগণ প্রচণ্ডভাবে তাঁর বিরোধিতায় লেগে যায় এবং তাঁকে জারজ, ভণ্ড, রাষ্ট্র ও ধর্মদ্রোহী প্রভৃতি এবং তাঁর মাতা মেরিকে অসতী বলে প্রচারণা চালিয়েই ক্ষান্ত হয় না বরং নানারূপ অত্যাচার-নির্যাতন এমনকি তাঁর প্রাণ নাশের ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত হয় বাইবেলে তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

পাঠকবর্গের অবগতির জন্য খোদ বাইবেল থেকে এ সম্পর্কীয় বিবরণের কিছু অংশ নিম্নে হুবহু উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ঃ

"তখন বারো জনের মধ্যে একজন, যাকে ঈষ্করিয়োতীয় যিহুদা বলা যায়, সে প্রধান যাজকদের কাছে গিয়ে বললো, আমাকে কি দিতে চান বলুন, আমি তাকে আপনাদের হস্তে সমর্পন করবো। তারা তাকে ত্রিশ রৌপ্যখণ্ড তৌল করে দিল, আর সেই সময় অবধি সে তাকে সমর্পন করবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করতে লাগলো।" — মথি ২৬; ১৪-১৬ (৫০ পৃষ্ঠা)

"তখন যীশু তাদের সঙ্গে গোৎশিমানী নামক একস্থানে গেলেন আর আপন শিষ্যদের বললেন, আমি যতক্ষণ ওখানে গিয়ে প্রার্থনা করি ততক্ষণ তোমরা এখানে বসে থাক। পরে তিনি পিতরকে এবং শিষ্যদের দুই পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন আর দুঃখার্ত ও ব্যাকুল হতে লাগলেন। এখন তিনি তাদের বললেন, আমার প্রাণ মরণ পর্যন্ত দুঃখার্ত হয়েছে; তোমরা এখানে থাক, আমার সঙ্গে জেগে থাক।"

".... পরে তিনি সেই শিষ্যদের কাছে এসে, দেখলেন তারা ঘুমিয়ে পড়েছেন, আর তিনি পিতরকে বললেন, এ কি? এক ঘণ্টাও কি আমার সঙ্গে

www.pathagar.com

জেগে থাকতে তোমাদের শক্তি হলো না? জেগে থাক ও প্রার্থনা কর যেন পরীক্ষায় না পড়।" — মথি ২৬; ৩৬-৪২

"...... পরে তিনি এসে দেখলেন, তারা ঘুমিয়ে পড়েছেন, কেননা তাদের চক্ষু ভারি হয়ে পড়েছিল, ... তিনি যখন কথা বলছিলেন, দেখ যিহুদা, সেই বারো জনের একজন আসল, এবং তার সঙ্গে বিস্তর লোক, খড়গ ও যষ্ঠি নিয়ে প্রধান যাজকদের ও লোকদের প্রাচীনদের কাছে আসলো, যে তাকে সমর্পন করেছিল, সে তাদের এই সংকেত বলেছিল, আমি যাকে চুম্বন করবো সে ঐ ব্যক্তি, তোমরা তাকে ধরবে।" — ঐ ৪৩-৪৯

আর উদ্ধৃতি তুলে না ধরে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, এমনি শঠতা ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তিনি শত্রু হস্তে ধৃত হন; পরে ধর্ম ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার মিথ্যা অপরাধে তাঁকে অতি নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। অবশ্য পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে ভিন্ন কথা বলা হয়েছে। তা নিয়ে আলোচনায় ব্রতী না হয়ে বাইবেলের বর্ণনার মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চাই।

এ কথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখেনা যে শত্রুপক্ষ মহাত্মা যীশু খৃস্টকে জঘন্যভাবে হত্যাকরেই ক্ষান্ত হয়েছিল না; তাদের এই জঘন্য কাজকে আইন ও যুক্তিসম্মত বলে প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে এক দিকে মহাত্মা যীশুকে জারজ, ভণ্ড, প্রতারক, অভিশপ্ত প্রভৃতি বলে প্রবলভাবে প্রচারণা শুরু করেছিল এবং অন্যদিকে যীশু শিষ্যগণ যাতে তাঁর ধর্মীয় মতবাদকে কোনওক্রমেই জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার সামান্যতম সুযোগও না পায় কঠোরভাবে তেমন ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিল।

উল্লেখ্য যে, প্রচার জীবনের তিনটি বছরের অধিকাংশ সময় শত্রুর আশঙ্কায় এখানে-ওখানে আত্মগোপন করা, মানসিক অস্থিরতা, সর্বোপরি আকস্মিক তিরোধান প্রভৃতি কারণে যীশুখৃস্টের জীবদ্দশায় ইঞ্জিলের সঙ্কলন সম্ভব হয়ে ওঠেনি। শত্রুপক্ষের প্রবল বিরোধিতার কারণে তাঁর তিরোধানের পরেও সুদীর্ঘকাল এই সঙ্কলনের কাজে হাত দেয়ার কোনও উপায় ছিল না। দুঃখের বিষয় যখন এ কাজে হাত দেয়া সম্ভব হয়েছিল তখন তাঁর দ্বাদশ শিষ্যের একজনও জীবিত ছিলেন না।

অতএব মহাত্মা যীশুখৃস্টের জীবদ্দশায় তাঁর নিজের দ্বারা অথবা তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অন্য কোনও ব্যক্তি দ্বারা এমনকি তাঁর দ্বাদশ শিষ্যের কোনও এক বা একাধিক জনের দ্বারাও যে ইঞ্জিল সঙ্কলিত হয় নি এখানে সেকথা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

শুধু এ কথাটি মনে রেখে অতঃপর আসুন অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করি ঃ

www.pathagar.com

শক্রুর ভয়ে মুখ খুলতে না পারলেও যীশু খৃস্টের জারজ, ভণ্ড, প্রতারক অভিশপ্ত প্রভৃতি এবং তাঁর মাতার অসতী হওয়া সম্পর্কীয় শক্রুর প্রচারণাকে মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন করা এবং উভয়ের চরিত্র ও মর্যাদাকে চিরভাস্বর ও সমুন্নত করে রাখার একটা প্রবল আগ্রহ যে যীশু-ভক্তদের মধ্যে ছিল এবং তা-ই যে স্বাভাবিক সেকথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না। তাছাড়া এ কাজকে তাঁরা যে নিজেদের জন্য এক বিরাট নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করতেন সেকথা অনুমান করাও খুব কঠিন নয়। অথচ শক্রুপক্ষের বিরোধিতার জন্য এ সম্পর্কে কোনও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে মনের আগ্রহকে মনের মধ্যে চেপে রেখে তাঁরা যে সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন সেকথা অনায়াসে বলা যেতে পারে।

ইঞ্জিল সঙ্কলনের সুযোগকে তাঁরা যে শুধু ইঞ্জিলের সঙ্কলনই নয়— তাদের মনের সেই চাপা আগ্রহকে বাস্তবায়িত করার এক বিরাট সুযোগ হিসাবেও গ্রহণ করেছিলেন সেকথা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া যীশু খৃস্ট এবং তাঁর মাতাকে কলঙ্কমুক্ত করা এবং তাঁদের মর্যাদাকে চিরভাস্বর ও সমুন্নত করে রাখার জন্য ইঞ্জিলের চেয়ে উৎকৃষ্ট এবং নির্ভরযোগ্য মাধ্যম যে আর হতে পারে না এ সহজ কথাটা নিশ্চিতরূপেই তাঁদের জানা ছিল বলে আমরা ধরে নিতে পারি।

সে যাই হোক সুদীর্ঘকাল পরে মহাত্মা যীশুখৃস্টের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিলনা এমন ব্যক্তিরা ইঞ্জিল সঙ্কলন করতে গিয়ে ইঞ্জিলের বাণীসমূহ কিভাবে এবং কোন সূত্র থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, তাঁরা নিজেরা এবং তাঁদের অবলম্বিত সূত্র বা সূত্রসমূহ কতখানি বিশ্বাসযোগ্য ছিল পরে সে সম্পর্কে কিছুটা আভাস দেয়া হবে। এখানে যা বলা প্রয়োজন তা হলো— এঁদের সংগৃহীত ও সঙ্কলিত ইঞ্জিলের সংখ্যা ছিল ৩৬; এবং 'প্রেরিতদের পত্র' নামীয় পত্রের সংখ্যা ছিল ১১৩।

কিন্তু বর্তমানে মথি মার্ক, লুক এবং যোহনের নামে চারখানা ইঞ্জিল, 'প্রেরিতদের কার্য' এবং 'শেষে প্রেরিত যোহনের প্রকাশিত বাক্য' শীর্ষক দুখানা নিয়ে মোট ছ'খানা পুস্তক ও বিভিন্ন মণ্ডলী বা বিশ্বাসীদের নিকট লিখিত একুশ খানা পত্র বিদ্যমান রয়েছে।

ইঞ্জিল এবং পত্রের সংখ্যা এমন নিদারুণভাবে হ্রাস পাওয়ার কারণ কি অনেকের মনেই সে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, অতএব বলা প্রয়োজন যে,

ইঞ্জিল সঙ্কলনের সময় থেকেই সঙ্কলন ও সঙ্কলকদের সম্পর্কে কোনও কোনও সুধী ব্যক্তির মনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। যতই দিন যেতে থাকে এঁদের সংখ্যাও ততই বাড়তে থাকে। দিনে দিনে এটা অনেকেরই লক্ষ্যিভূত

www.pathagar.com

হতে থাকে যে ইঞ্জিলের মধ্যে এমন বহু বিবরণই রয়েছে যা একান্তরূপেই অদ্ভুত এবং অবিশ্বাস্য।

অনেকেই ইঞ্জিল থেকে এসব অদ্ভুত অবিশ্বাস্য বিবরণ বাদ দেয়ার দাবি করতে থাকেন। কিছুকালের মধ্যে এমন অবস্থারই সৃষ্টি হয় যে ৩২০ খ্রিস্টাব্দে তদানীন্তন রোম সম্রাট কনস্টেন্টাইন এ সম্পর্কে এক মহা সম্মেলন আহবান করতে বাধ্য হন।

নিসিয়া (necea) তে এ সম্মেলন আহূত হয়। অন্তত আঠারো জন বিশপ এবং দুই সহস্র পাদরি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এই সম্মেলন 'নিসিয়া কাউন্সিল' নামে প্রসিদ্ধ।

বহু বাত-বিতণ্ডার পর এই সম্মেলন কর্তৃক আঠাশখানি ইঞ্জিল এবং বিরানব্বই খানা পত্র মিথ্যা এবং জাল বলে প্রত্যাখাত হয়। অর্থাৎ ইতোপূর্বে উল্লেখিত এবং বর্তমানে বিদ্যমান ছয়খানা পুস্তক ও একুশখানা পত্র সত্য, অভ্রান্ত এবং গ্রহণযোগ্য বলে গৃহিত হয়।[১]

অতঃপর বাইবেলের কথায় আসা যাক। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, ইঞ্জিলের ইংরেজি অনুবাদই বাইবেল নামে পরিচিত। মূল এবং অনুবাদের মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য হওয়া যে খুবই স্বাভাবিক শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই সেকথা জানা রয়েছে।

এই পার্থক্যের কথা ছেড়ে দিয়েও অতীব দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, বর্তমানে বাইবেল নামক যে গ্রন্থখানা চালু রয়েছে তাকেও ইঞ্জিলের হুবহু অনুবাদ বলা হলে প্রচণ্ড ভুল করা হবে।

আমাদের এই কথার সমর্থনে ১৮৭০ সালে ইংলণ্ডের ক্যান্টনবেরিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের কথা তুলে ধরা যেতে পারে। এ সম্মেলনে সমাগত খ্রিস্টান পণ্ডিতমণ্ডলী সর্বসম্মতভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে,

"১৬১১ খ্রিস্টাব্দে (প্রথম জেমস্ এর সময়ে) ইঞ্জিলের যে ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করা হয় বর্তমানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি ঘটায় তার বহু বিবরণকেই আর যুগের সাথে খাপ খাওয়ানো সম্ভব হয়ে উঠছে না। ফলে ওগুলো বাদ দিয়ে বাইবেলকে যুগোপযুগী করার প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।"

সে যা হোক, পরিশেষে এ সম্মেলন কর্তৃক এই কাজের জন্য ২৭ জন পণ্ডিতের সমবায়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। পূর্ণ দশ বছর পরে ১৮৮২

---

১. Encyclopaepia, art, Aphocryphal literature. দ্রষ্টব্য

www.pathagar.com

খ্রিস্টাব্দে এ কমিটি বাইবেলের সংস্কার করে 'Revised version নামে যে নতুন সংস্করণ বের করেন বর্তমানে তাই বাইবেল নামে চালু রয়েছে।[১]

পাঠকবর্গের অবগতির জন্য ইঞ্জিল এবং বাইবেলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে তুলে ধরা হলো। বলাবাহুল্য, ইঞ্জিলের সংগ্রহ-সঙ্কলন এবং বাইবেলের সংস্কার-সংশোধন প্রভৃতি নিয়ে কোনওরূপ সমালোচনা বা মন্তব্য প্রকাশের ইচ্ছা বা প্রয়োজন আমাদের নেই।

পাঠকবর্গের অবশ্যই স্মরণ রয়েছে যে, "বিশ্বের সকল মানুষই জন্মগতভাবে পাপী এবং একমাত্র খৃস্টানগণই নিষ্পাপ ও মুক্তির অধিকারী" খৃস্টান ভ্রাতাভগ্নিদের মনে এই ধারণা সৃষ্টির কারণ অনুসন্ধান এবং আল্লাহর অন্যতম বিধান হয়েও ইঞ্জিলের মধ্যে এই অন্যায়, অবাস্তব, প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত এবং একদেশদর্শী ধারণা সৃষ্টি হওয়ার মতো বিবরণাদি কি করে স্থান পেলো সেকথা বোঝানোর জন্যই ইঞ্জিল ও বাইবেলের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এখানে তুলে ধরতে হয়েছে।

অতঃপর খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিদের এই ধারণা সত্য এবং অভ্রান্ত হওয়া সম্পর্কে বাইবেলের যেসব যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে— পাঠকবর্গের অবগতি এবং ভেবে দেখার জন্য তার কতিপয়কে নিম্নে পৃথক পৃথক ভাবে তুলে ধরা যাচ্ছে।

❑ যীশুখৃস্ট সদা প্রভুর 'ঔরসজাত' একমাত্র পুত্র। (অতএব তাঁর জারজ হওয়া এবং তার মাতার সতীত্ব-হীনতা সম্পর্কীয় শত্রুপক্ষের যাবতীয় প্রচারণা মিথ্যা এবং দুরভিসন্ধি প্রসূত— লেখক)।

❑ মানবের আদি-পিতা নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করে পাপী হয়েছিলেন সুতরাং তার বংশধরগণ অর্থাৎ— গোটা মানবজাতিই জন্মগতভাবে পাপী।

❑ যেহেতু যীশু কোনও মানুষের ঔরসজাত নন— অতএব পৃথিবীতে একমাত্র তিনিই নিষ্পাপ এবং নিষ্কলঙ্ক মহাপুরুষ।

❑ যেহেতু কোনও পাপী মানুষের পক্ষে অন্য কোনও পাপী মানুষকে ত্রাণ বা পাপ-মুক্ত করা সম্ভব নয়, আর যেহেতু যীশুই একমাত্র নিষ্পাপ ব্যক্তি— অতএব পাপী মানুষদের ত্রাণ বা পাপমুক্ত করার যোগ্যতা এবং অধিকার একমাত্র নিষ্পাপ ব্যক্তির— অতএব পাপী মানুষদের ত্রাণ বা পাপমুক্ত করার যোগ্যতা এবং অধিকার একমাত্র তাঁরই রয়েছে। এই হিসাবে যীশুই মানুষের ত্রাণকর্তা।

❑ যীশু শুধু সদা প্রভুর ঔরসজাত একমাত্র পুত্র এবং ত্রাণকর্তাই নন— তিনি অন্যতম ঈশ্বরও।

---

১. Mr. Weincle ও Widgery লিখিত "Jessus in the 19th century and after" দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

❑ মানুষের যাবতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ব স্বরূপ যীশুখৃস্ট ক্রুশে প্রাণ বিসর্জন করে গিয়েছেন। সুতরাং তাঁর এই পবিত্র রক্ত বা প্রায়শ্চিত্ববাদ (Doctrine of Attonment)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন মাত্রই মানুষ তার জন্মগত এবং অর্জিত এ উভয় ধরনের পাপ থেকেই সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে যায়; তাকে পরকালে আর কোনওরূপ শাস্তি ভোগ করতে হয় না। পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস করবেনা অনন্ত কাল তাদের নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে ইত্যাদি।

এ নিয়ে আর বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না এবং ওপরোক্ত যুক্তিসমূহ কতখানি অভ্রান্ত ও গ্রহণযোগ্য সে সম্পর্কেও কোনও মন্তব্য প্রকাশ করতে চাই না। যুক্তির সারবত্তা থাক আর না থাক খৃস্টান ভ্রাতাভগ্নিরা যে বিশ্বের সকল মানুষকে পাপী বলে মনে করেন এবং তাদের সম্পর্কে অপরিসীম ঘৃণা-বিদ্বেষও পোষণ করেন এখানে শুধু সেকথাটিই অতীব দুঃখের সাথে আমরা বলে রাখতে চাই।

ঘটনার এখানেই শেষ হলে দুঃখের মাঝেও কিছুটা সান্ত্বনা পাওয়া যেতো; কিন্তু তার উপায় নেই। কেননা এর চেয়েও ঘৃণা-অপমানের দৃশ্য আমাদের চোখের সম্মুখে রয়েছে।

অপর মানুষ অর্থাৎ ভিন্ন ধর্মের মানুষকে পাপী মনে করা এবং তাদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করার কিছুটা যুক্তিহীন অজুহাত থাকতে পারে। কিন্তু যখন দেখি যে শ্বেতবর্ণের খৃস্টানগণ কৃষ্ণবর্ণের খৃস্টানদের শুধু তাদের গাত্রবর্ণ কালো হওয়ার কারণে তাদের ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছেন, স্কুল-কলেজ-হোটেল-রেস্তোঁরা-সিনেমা হল প্রভৃতি কুত্রাপি প্রবেশাধিকার দিচ্ছেন না, এমনকি অনেকে তাদের প্রতি ইতর জীবজন্তু অপেক্ষাও অধিক ঘৃণা পোষণ করে চলেছেন তখন আমরা শুধু বিস্মিতই হই না অপরিসীম বেদনাও বোধ করি। আবার যখন দেখি যে এইসব ঘৃণাবিদ্বেষ পোষণকারীদের মধ্যে প্রভূত পরিমাণে শিক্ষা-দীক্ষা, সম্মান প্রতিপত্তির অধিকারী এবং উচ্চমানের সভ্যতা সংস্কৃতির দাবিদার অনেক ব্যক্তিই রয়েছেন তখন শুধু বিস্মিত বেদনার্তই নয় আমাদের ভীষণভাবে হতাশাগ্রস্থও হতে হয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষার সাথে এসব ধারণা-বিশ্বাস এবং কার্যক্রমের সামান্যতম সম্পর্কও নেই। পাপ ও পাপী সম্পর্কে পবিত্র কুরআন জনমনে কি ধারণা-বিশ্বাস সৃষ্টি করতে চায় এবং তার গুরুত্ব ও মূল্য-মর্যাদা কত বেশি সেকথা সম্যকরূপে জানতে হলে প্রথমেই পাপ ও পাপী সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা বিশ্বাসসমূহ এবং তার সর্বনাশা প্রভাব সম্পর্কে জানার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

কিন্তু এই জানার কাজটি শুধু ভীষণভাবে কঠিনই নয়, ভয়ংকরভাবে বিপজ্জনকও। কারণ এই ধারণা-বিশ্বাসসমূহ সত্য ও বাস্তবতার সাথে সম্পর্কহীন এবং মানবতাবিরোধী হলেও সত্য, অভ্রান্ত এবং মহাপুণ্যজনক কাজ বলে সুদীর্ঘকাল যাবত চালু রয়েছে। ফলে এর বিষময় ফলসমূহ সমাজের গা-সহা হতে হতে সমাজ কর্তৃক সংগত ও স্বাভাবিক বলে গণ্য ও গৃহীত হয়েছে।

এমতাবস্থায় তাদের মাঝে সত্যকে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করা যে শুধু কঠিনই নয় রীতিমত বিপজ্জনকও সেকথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখেনা। বিষয়টি সকলের কাছে সহজবোধ্য করে তোলার জন্য এই সব ধারণা-বিশ্বাসের বিষময় ফল কিভাবে সত্য, স্বাভাবিক এবং মহাপুণ্যজনক বলে গৃহীত ও গা-সহা হয়ে পড়েছে তার কতিপয় বাস্তব উদাহরণ পৃথক পৃথকভাবে তুলে ধরা যাচ্ছে।

❑ পূর্ব জন্মার্জিত পাপ-পুণ্য, অদৃষ্টের লিখন, বিধির বিধান, লীলাময়ের লীলা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অজুহাতে কিছুসংখ্যক তথাকথিত পুণ্যবান ব্যক্তি কোটি কোটি মানুষকে পাপী সাব্যস্থ করে পশু অপেক্ষাও হীনতর জীবন যাপনে বাধ্য করেছে। দাস, শঙ্কর, প্রতিলোম, অন্ত্যজ, অচ্ছুৎ, হরিজন প্রভৃতি বলে আখ্যায়িত এসব কোটি কোটি মানুষ পবিত্র ধর্মের নামে হাজার হাজার বছর ধরে কিভাবে শোষিত-বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত-অপমানিত হয়ে চলেছে অহরহই তা আমরা দেখে চলেছি।

অথচ এটা যে অন্যায়, অসত্য এবং অতি জঘন্য ধরনের মানবতা বিরোধী কাজ সে অনুভূতি না আমাদের মধ্যে আর না ঐসব লাঞ্ছিত নির্যাতীতদের মধ্যে জেগে উঠছে। এ জেগে না ওঠার কারণ— আমাদের উভয়পক্ষের কাছেই এটা সত্য, স্বাভাবিক এবং গা-সহা হয়ে পড়েছে।

শুধু তা-ই নয়— এইসব শোষণ-নির্যাতন ও লাঞ্ছনা-অপমান যে ঐসব তথাকথিত পাপীদের পূর্বজন্মার্জিত পাপ স্খালনের মহান উদ্দেশ্যেই চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে এবং প্রশান্ত মনে এসব সহ্য করে যাওয়া যে তাদের নিজেদের স্বার্থেই অপরিহার্য এমন একটা বিশ্বাসও তাদের মাঝে নানা কৌশলে গড়ে তোলা হয়েছে। বলাবাহুল্য, এই গড়ে তোলার কাজটাও সুসম্পাদিত করা হয়েছে— পবিত্র ধর্মের নামেই।

❑ 'শয়তানের হাতিয়ার', 'দোজখের দ্বার', 'জন্মগত দাসী', 'কামুকা', 'পথভ্রষ্টকারিনী', 'পাপের প্রস্রবন', প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করে গোটা নারীজাতিকে আবহমানকাল যাবত পবিত্র ধর্মের নামে লাঞ্ছিতা, অপমানিতা ও অধিকারবঞ্চিতা করে রাখা হয়েছে।

❑ 'পূর্বজন্মার্জিত পাপের ফলে নারীরা স্বামী-ঘাতিনী তথা বিধবা হয়ে থাকে' এই অজুহাতে কোটি কোটি বিধবাকে অপরিসীম ঘৃণা ও লাঞ্ছনার করুন শিকারে পরিণত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

❑ কৌলিন্য প্রথার নামে শুধু লক্ষ লক্ষ কুমারীকেই সর্বনাশের শিকারে পরিণত করা হয়নি গোটা সমাজের ভিতটাকেই লণ্ড ভণ্ড করে তোলা হয়েছে।

কিন্তু মজার ব্যাপার হলো— যারা বা যে ভদ্র লোকেরা এই জঘন্য কৌলিন্য প্রথার সৃষ্টি করেছেন সর্বনাশের বেলায় তাদের নামটিও কেউ মুখে আনেনা; সকল দোষ চাপিয়ে দেয় ঐ আইবুড়ো মেয়েটি এবং তার কন্যা-দায়গ্রস্থ এবং দিশেহারা পিতা মাতার ওপর। কেননা, তাদের কর্মফল অথবা পূর্বজন্মার্জিত পাপই নাকি তাদের এই দুর্ভোগ ও ক্ষয়-ক্ষতির কারণ।

বহুকাল ধরেই সকলের চোখের সম্মুখে এটা ঘটে চলেছে, এ নিয়ে আত্মহত্যা, অপচয়, সর্বস্বান্ত হওয়া প্রভৃতি ঘটনার সংখ্যাও কম নয়।

অথচ এর কোনও প্রতিকার নেই— প্রতিক্রিয়াও নেই। অর্থাৎ এটাও পবিত্র ধর্মের অঙ্গ এবং মহাপুণ্যজনক কাজ বলে গা-সহা এবং স্বাভাবিক বলে গণ্য ও সর্বান্তঃকরণে গৃহীত হয়েছে!

❑ কোনও যৌবনবতী বিধবা স্বাভাবিক কামোত্তেজনা, অন্যের প্ররোচনা, অভাব অথবা অন্য যে কোনও কারণে ব্যভিচার করে ধরা পড়েছে; সঙ্গে সঙ্গে 'ধর্মরক্ষা' ও 'সমাজ দেহকে পবিত্রকরণের' নামে অতীব লাঞ্ছনাসহকারে তাকে সমাজ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, অগত্যা অনন্যোপায় হয়ে সেই হতভাগিনীকে বেশ্যালয়ে আশ্রয় নিতে অথবা আত্মহত্যা করতে হয়েছে।

হয়তো এটাই তার জীবনের প্রথম পাপ এবং অনভিজ্ঞতার কারণেই তাকে ধরা পড়তে হয়েছে। বহু সংখ্যক পাপ করেও বুদ্ধি আর সতর্কতার জন্য ধরা পড়েনি এমন বহু মানুষ চরিত্রবান বা চরিত্রবতী বলে সমাজে যথেষ্ট শ্রদ্ধা-সম্মান পেয়ে চলেছে। অথচ বিদ্যমান পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থা, জাতীয় চরিত্র প্রভৃতি কোনও কিছুর প্রতি লক্ষ্য না করেই একটি মাত্র পাপের জন্য এই হতভাগিনীকে পাপের সমুদ্রে ঠেলে দেয়া হলো। ফলে সে তো আকণ্ঠ পাপে নিমজ্জিত হলোই ওপরন্তু সমাজের আরো অনেককে পাপে নিমজ্জিত করার পথকেও সুগম এবং প্রশস্ত করে ছাড়লো।

বলাবাহুল্য, এইভাবে পাপের শাস্তি দিতে গিয়ে পবিত্র ধর্মের নামে হাজার হাজার নারীকে যে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন অথবা আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা হয়েছে এবং হচ্ছে সেকথা শুধু আমরা জানিই না এমন বহু ঘটনা আমাদের চোখের সম্মুখেও ঘটে চলেছে। শুধু আজই নয়— হাজার হাজার বছর ধরেই এটা ঘটে চলেছে। যদি এটা আমাদের গা-সহা না হতো এবং এ কাজকে স্বাভাবিক বলে আমরা গ্রহণ না করতাম তবে বহু পূর্বেই এর প্রতিকার প্রতিবিধান হয়ে যেতো।

www.pathagar.com

❑ সাধারণত অত্যন্ত গোপনে এবং বিশেষ সতর্কতার সাথে আঁট-ঘাট বেঁধেই পাপ কাজসমূহ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। লক্ষ লক্ষ পাপীর মধ্যে বোকা এবং অনভিজ্ঞ দু'চার জনই ধরা পড়ে। বড় বড় এবং ঝানু পাপীরা প্রায়ই ধরা পড়ে না। ধরা পড়েও তাদের অনেকেই শাস্তি এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়। সাধারণ পাপীদের যারা ধরা পড়ে হয়তো সেটাই তাদের প্রথম পাপ। প্রচলিত সমাজব্যবস্থা এবং ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় বিধানানুযায়ী তাদের বিচারের সম্মুখীন হতে হয়; অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাস্তিও ভোগ করতে হয়।

যাঁরা এই বিচার ও শাস্তি প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকেন খোঁজখবর নিলে দেখা যাবে যে তাঁদের মধ্যে এমন অনেকেই রয়েছেন যাঁরা বিচারাধীন ব্যক্তির পাপের তুলনায় অনেক বেশি পাপ করেছেন অথবা করে চলেছেন।

এমতাবস্থায় এই বিচার করার ন্যায়সঙ্গত অধিকার যে তাদের নেই— থাকতে পারেনা— আমাদের প্রায় সকলের বিবেকবুদ্ধিই সেকথা বলে। তথাপি এ কাজ আমাদের চোখের সম্মুখে অহরহই ঘটে চলেছে। অর্থাৎ এটাও আমাদের গা-সহা হয়ে পড়েছে এবং যত অন্যায়-অসঙ্গতই হোক এ কাজকে স্বাভাবিক বলে আমরা ধরে নিয়েছি।

❑ লঘুপাপে গুরুদণ্ড, বিচারের প্রহসন, গুরুপাপে লঘুদণ্ড, বিচার এড়িয়ে যাওয়া, বিচারে পক্ষপাতিত্ব, পাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের দম্ভের সাথে বুক ফুলিয়ে চলা এমনকি সমাজে নেতৃত্ব কর্তৃত্বকরণ এসব কিছুই আমাদের গা-সহা হয়েছে এবং এসব কিছুকেও আমরা স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছি। অন্যথায় এমন অবাধে এবং প্রকাশ্যভাবে এসব কাজ চলতে পারতোনা।

এ ধরনের বহু ঘটনাই আমাদের চোখের সম্মুখে ঘটে চলেছে।

সুতরাং উদাহরণের সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজন নেই। তথাপি পাপ ও পাপী সম্পর্কে ইসলামের অনবদ্য শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করার সময়ে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলোর কথা স্মৃতিপটে জাগরুক রাখার জন্য প্রিয় পাঠকবর্গের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে রাখছি ঃ

❑ আবহমানকাল ধরেই বিভিন্ন সমাজ নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী পাপী বলে সাব্যস্ত ব্যক্তিদের প্রতি অপরিসীম ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করে আসছে। শুধু তা-ই নয়— অকথ্য অত্যাচার নির্যাতন চালিয়েছে— সমাজ থেকে বহিষ্কার করে সমাজ দেহকে পবিত্র করেছে।

❑ সুদূর অতীতের সেই প্যাগানিজমের যুগ থেকে শুরু করে বহুকাল পর্যন্ত পাপী বলে সাব্যস্ত ব্যক্তিদের পাপের তারতম্যানুসারে শূলদণ্ড, শিরচ্ছেদ, ফাঁসি, ব্যাঘ্র-সিংহ-কুম্ভীর বন্যাবরাহ প্রভৃতির মুখে নিক্ষেপকরণ, মত্তহস্তীর পদতলে নিস্পেষণ, তুষানলে দগ্ধীভূতকরণ, বেত্রাঘাত ও কণ্টকের আঘাতে ক্ষত-

www.pathagar.com

বিক্ষতকরণ, তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ, বুকে গুরুভার প্রস্তর চাপানো, পর্বতশৃঙ্গ থেকে ভূতলে নিক্ষেপকরণ, করাতের সাহায্যে দ্বিখন্ডিতকরণ, হাত-পা বেঁধে সমুদ্রে বা অগ্নি-কুণ্ডে নিক্ষেপন প্রভৃতি দণ্ড প্রদান করেছে।

❑ বর্তমানের উন্নত ও সভ্যতা-সংস্কৃতির দাবিদার দেশসমূহে পাপী বলে বিবেচিত ব্যক্তিদের শাস্তিদানের জন্য ফাঁসির মঞ্চ, বৈদ্যুতিক চেয়ার, গ্যাস-চেম্বার, ফায়ারিং স্কোয়াড, জেলখানা, নির্জন সেল, এবং এমনি ধরনের বহু কিছুই প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ পাপীদের সম্পর্কে সকলের লক্ষ্য একটি-ই আর তা হলো— অপরিসীম ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ এবং অকথ্য অত্যাচার-নির্যাতনসহ চরম দণ্ডে দণ্ডিতকরণ।

সুধী পাঠকমন্ডলী! এবারে আসুন, পাপ ও পাপী সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের অভিমত কি সেকথা আমরা জানতে চেষ্টা করি। আপনাদের অবশ্যই মনে রয়েছে যে আদি পিতা সংক্রান্ত বিবরণকে অসমাপ্ত রেখে আমরা বর্তমান নিবন্ধের অবতারণা করেছি। অতএব অতঃপর সেই অসমাপ্ত বিবরণকে তুলে ধরা যাচ্ছে।

তবে বিষয়টি বিশেষ জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ বিধায় সংক্ষিপ্ত পটভূমিকা স্বরূপ এ সম্পর্কে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা কি বলে প্রথমে সেকথা তুলে ধরার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি। অতএব আসুন, আমাদের এ সম্পর্কীয় বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়েই আলোচনা করা যাক।

❑ পৃথিবীর সকল দেশে এবং সকল সমাজেই নব-জাত শিশুদের 'মাসুম' বা নিষ্পাপ বলা হয়ে থাকে। কেননা, জন্মের পূর্বে মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে পাপ বা পুণ্যজনক কোনও কাজ করার সাধ্য-শক্তি তাদের থাকে না।

❑ শৈশবে যতদিন শিশুদের মনে ভালোমন্দ বা পাপপুণ্যের বোধ জাগ্রত না হয় ততদিন তাদের অনুষ্ঠিত অন্যায় কাজসমূহকে শিশুসুলভ বা 'বালসুলভ' কাজ বলে উপেক্ষা করা হয় ঃ উক্ত কাজের জন্য তাদের দায়ী করা হয় না।

❑ পাগল বা উম্মাদদের কাজকর্ম এবং আচার-ব্যবহার যত দোষণীয় এবং ক্ষতিকরই হোক না কেন সেজন্য তাদের দায়ী করা হয় না; তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থাগ্রহণেরও কোনও উদ্যোগ গৃহীত হয় না। কারণ তারা উম্মাদ; বুঝেসুজে বা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনও কাজ তারা করে না— করার সাধ্যই তাদের থাকে না।

❑ পূর্ব-প্রস্তুতি ছাড়া কোনও ব্যক্তি কর্তৃক আকস্মিকভাবে কোনও ক্ষতিকারক কাজ অনুষ্ঠিত হলে সেই ক্ষতির জন্য তাদের দায়ী করা হয় না।

www.pathagar.com

অতএব সজ্ঞানে এবং স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোনও কাজ অনুষ্ঠিত না হলে উক্ত কাজের ফলাফল বা পরিণামের জন্য অনুষ্ঠাতা যে দায়ী হতে পারে না— এ অভিজ্ঞতা আমাদের বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ।

আবহমান কাল যাবত আমরা জেনে আসছি যে যাবতীয় অন্যায়, গর্হিত বা অকল্যাণকর কাজ অর্থাৎ যে কাজের দ্বারা নিজের বা অপরের সামান্যতম ক্ষতিও সাধিত হয় সে কাজকে পাপ কাজ বলা হয়ে থাকে।

আর যারা সংযম-হীনতার জন্য রীপু ও ইন্দ্রিয় তথা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের অন্যায় অপপ্রয়োগের দ্বারা নিজের বা অপরের সামান্যতম ক্ষতিরও কারণ ঘটায় পাপী বলতে আমরা তেমন লোকদেরই বুঝে থাকি।

এ থেকে এটা-ই প্রতিপন্ন হচ্ছে যে, নিজের বা অপরের ক্ষতিকর কোনও কাজ না করা পর্যন্ত কোনও মানুষকে পাপী বলা যেতে পারে না। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, কোনও কোনও ধর্ম যাবতীয় পাপ কাজের জন্য রীপু ও ইন্দ্রিয়সমূহকে দায়ী করে থাকে। তাদের বিবেচনায় পৃথিবী বা সংসার 'অসার' 'প্রপঞ্চ' 'মায়া' 'ফাঁদ' প্রভৃতি। সুতরাং রীপু, ইন্দ্রিয় এবং পৃথিবীরূপ মায়ার ফাঁদ থেকে মুক্তি লাভের জন্য তারা যোগাভ্যাস করেন— কৃচ্ছ্র সাধনায় লিপ্ত হন।

কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, এই রীপু ও ইন্দ্রিয়সমূহের সুনিয়ন্ত্রণ এবং পার্থিব সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহারের ওপরই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্য নির্ভর করছে। রীপু ও ইন্দ্রিয়কে ফাঁকি দেয়া এবং ফাঁদ কেটে পালিয়ে যাওয়ার অর্থই যে জীবন-যুদ্ধে পরাজয়বরণ এবং মানবতার মুখে কলঙ্ক লেপন দুঃখের বিষয় নানা কারণে সেকথাটা ভেবে দেখার মানসিকতাও তারা হারিয়ে ফেলেন।

অতঃপর আমাদের আলোচ্য বিষয়ে ফিরে গিয়ে বলতে হচ্ছে যে, স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানে কোনও পাপের অনুষ্ঠান না করা পর্যন্ত কোনও মানুষকে যে পাপী বলা যেতে পারে না এই বাস্তব অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই রয়েছে। শুধু বাস্ত ব অভিজ্ঞতাইবা বলি কেন? সাধারণ নীতিবোধ, বিবেক-বুদ্ধি, বিশ্বজনমত এবং সারাবিশ্বের আইন আদালতও এই একই কথা বলে।

অতএব আদি পিতা পাপ করেছিলেন বলে তার বংশধররা অর্থাৎ বিশ্বের সকল মানুষই 'জন্মগতভাবে পাপী' খৃস্টান ভ্রাতাভগ্নিদের এই বিশ্বাস যে ভ্রমাত্মক এবং আত্মঘাতী সেকথা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

খৃস্টান ভ্রাতাভগ্নিদের মনে শুভবুদ্ধির উদয় হোক; "আদি পিতা পাপী ছিলেন এবং সেই কারণে বিশ্বের সকল মানুষই জন্মগতভাবে পাপী", "যীশুখৃস্ট সদাপ্রভুর ঔরসজাত একমাত্র পুত্র সুতরাং পৃথিবীতে তিনিই একমাত্র নিষ্পাপ, অন্যতম ঈশ্বর এবং মানবজাতির ত্রাণকর্তা" তাঁদের এই সব ধারণা যে বিভ্রান্তি-মূলক, অযৌক্তিক এবং প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত সেকথা তাঁরা বুঝতে সক্ষম

www.pathagar.com

হোন এই কামনা করে আসুন আমরা আমাদের মূল বক্তব্য অর্থাৎ আদি পিতার প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, আদি পিতাকে কালেমা বা ধর্মজ্ঞান শিক্ষা দেয়ার পরেই তিনি তওবা করেছিলেন। এ থেকে বুঝতে পারা সহজ যে কালেমা শিক্ষার পরেই তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন এবং তওবা বা অনুতাপের মাধ্যমে ক্ষমা চেয়েছিলেন। তাঁকে যে ক্ষমা করা হয়েছিল পবিত্র কুরআনে সেকথা সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে। সুতরাং ক্ষমা লাভের পর তিনি যে নিশ্চিতরূপেই নিস্পাপ হয়েছিলেন সেকথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না। এমতাবস্থায় তাঁর বংশধররা অর্থাৎ "পৃথিবীর মানবসম্প্রদায় জন্মগতভাবে পাপী" খৃস্টান ভ্রাতাভগ্নিদের এই সিদ্ধান্ত আমরা সত্য ও সঠিক বলে মেনে নিতে পারি না।

আমাদের এই মেনে নিতে না পারার অন্য কারণও রয়েছে। আর তা হলো— পাপী ব্যক্তিদের সন্তান যে সৎ, সাধু, পুণ্যবান এমনকি মহাপুরুষও হতে পারে— এবং অনেক পুণ্যবান ব্যক্তির সন্তানও যে অতি জঘন্য ধরনের পাপে লিপ্ত হয় এমন বহু প্রমাণ ইতিহাসের পাতা এমনকি আমাদের চোখের সম্মুখেও বিদ্যমান।

গোটা পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন নামে বহু ধর্ম বিদ্যমান ছিল। বর্তমানে যেগুলো বিদ্যমান রয়েছে তাদের সংখ্যাও মোটেই অল্প নয়। অন্যান্য বিষয় তো বটেই একমাত্র পাপ ও পাপী সম্পর্কীয় ধারণা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও এদের পরস্পরের মধ্যে কোনও কোনও বিষয়ে প্রচণ্ড মতভেদ বিদ্যমান থাকতে দেখা যায়।

আল্লাহর বিধান পাপ ও পাপী সম্পর্কীয় ধারণা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যে বিরাট পরিবর্তন ঘটাতে চায় তা সম্যকরূপে বুঝতে হলে এই প্রচণ্ড ধরনের মতভেদগুলোর কথা মনে রাখতে হবে।

বলা আবশ্যক যে, এ সব মতভেদ নতুন বা অভিনব নয়— আমাদের অজানাও নয়। পরবর্তী আলোচনার সময়ে মনে রাখার সহায়ক হবে বিবেচনায় সে সম্পর্কীয় কয়েকটি মাত্র উদাহরণ পৃথক পৃথকভাবে নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

❑ আমরা জানি, এক ধর্ম কর্তৃক বৈধ হিসাবে ঘোষিত হয়েছে এমন বহু খাদ্য অন্যান্য ধর্মের সবগুলো অথবা কোনও কোনওটি কর্তৃক অবৈধ ও তা গ্রহণ করা মহা পাপজনক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। খাদ্য নিয়ে এই মতভেদের কারণে এক ধর্মাবলম্বী মানুষেরা অন্য বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষদের পাপী সাব্যস্ত করে তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করে চলেছে। শুধু তাই নয়— একদল অন্যদলের ধ্বংস সাধনকে ধর্মীয় কর্তব্য বলে দৃঢ় বিশ্বাসও পোষণ করে চলেছে।

www.pathagar.com

❑ এক ধর্মে পুণ্যজনক বলে ঘোষিত বহু কাজই অন্য ধর্ম কর্তৃক ভীষণ ধরনের পাপজনক বলে ঘোষিত হয়েছে। ফলে সকলেই নিজ নিজ ধর্মকে সত্য এবং অন্য সকল ধর্মকে মিথ্যা ও তাদের অনুসারীদের পাইকারীভাবে পাপী সাব্যস্ত করে ধর্মীয় কর্তব্য হিসাবে পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ, কোন্দল ও রক্তপাতে লিপ্ত রয়েছে।

❑ হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত জাকারিয়া (আ) মহাত্মা যীশুখৃস্ট, ভক্ত প্রবর প্রহ্লাদ প্রভৃতিরা যে মহাপুরুষ ছিলেন সেকথা সকলেরই জানা রয়েছে। এঁদের কেউ চুরি, ডাকাতি, ব্যাভিচার প্রভৃতি এক কথায় আসল পাপ বলতে যা বোঝায় জীবনে তার ধারেকাছেও যাননি। একত্ববাদের প্রচার এবং নিজ নিজ দেশবাসীর সেবা ও তাদের সত্য ও কল্যাণের পথ প্রদর্শনই ছিল তাঁদের জীবনের ব্রত। অথচ ধার্মিক হওয়ার দাবিদার ব্যক্তিরাই এদের পাপী সাব্যস্ত করে যথাক্রমে এদের প্রথম জনকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছে, দ্বিতীয় জনকে করাত দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করেছে, তৃতীয়জনকে ক্রুশবিদ্ধ করেছে এবং চতুর্থজনকে মত্ত হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ করেছে।

বলাবাহুল্য, এমনি ধরনের বহু উদাহরণই তুলে ধরা যেতে পারে। এতদ্বারা আমি এ কথাই বুঝাতে চাচ্ছি যে এতকাল যাবত পাপী বলে সাব্যস্ত ব্যক্তিদের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা হয়েছে এবং শুধু আসল পাপীদেরই নয়— অনেক পুণ্যবাদ ব্যক্তিকেও যথেচ্ছভাবে পাপী সাব্যস্ত করে হিংসা-বিদ্বেষ এমনকি বহু ক্ষেত্রে প্রতিহিংসার মনোবৃত্তি নিয়ে তাদের ওপর অকথ্য নির্যাতনসহ নিদারুণ হত্যাযজ্ঞও চালিয়ে যাওয়া হয়েছে।

প্রিয় পাঠকবর্গ! সুদূরের সেই প্যাগানদের (বাংলাভাষার বিভিন্ন অভিধানের মতে অসভ্য বর্বর প্রভৃতি) মন-মানসে কিভাবে পাপ ও পাপী সম্পর্কীয় ভ্রান্ত ধারণাসমূহের সৃষ্টি হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে কিভাবে তা ভাষায় রূপ দিয়ে ধর্মীয় বিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং কি ভাবেইবা সেগুলো ঐশীবাণীর মর্যাদা পেয়ে ধর্মবিশ্বাসীদের মন-মানসে স্থায়ী ও কঠোরভাবে শেকড় গেড়ে বসার সুযোগ পেয়েছে এবং তার পরিণতি কিভাবে কোটি কোটি মানুষকে পাপী-সাব্যস্ত করে ঘৃণা-বিদ্বেষ, লাঞ্ছনা-অপমান ও নির্যাতন-নিষ্পেষণের কবলে নিক্ষেপ করেছে এতক্ষণ তারই কিছু তথ্য-ভিত্তিক বিবরণ তুলে ধরা হলো।

এসব বিবরণ পাঠ করার পর— অনেকের মনই বিষণ্ন-ভারাক্রান্ত এবং হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়তে পারে, আর তা-ই স্বাভাবিক। সাধারণভাবে সকল মানুষ এবং বিশেষভাবে সেই সব বিষণ্ন ও হতাশাগ্রস্থ মানুষের অবগতির জন্য বলা যাচ্ছে যে, অবস্থার এটাই সার্বিক পরিচয় নয়; সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন অন্য একটি

www.pathagar.com

দিকও রয়েছে যা শুধু আশাব্যঞ্জক এবং উৎসাহোদ্দীপকই নয়— সত্য ও কল্যাণের মহিমায় প্রোজ্জল এবং প্রাণবন্তও।

এই দিকটির সন্ধান পেতে হলে আমাদের আল্লাহর বিধানের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। আল্লাহর বিধানসমূহ পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব থেকে শুরু করে কিভাবে যুগে যুগে তাদের মন-মানসকে এইসব নির্মম ও ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা-বিশ্বাস থেকে মুক্ত করে সেখানে ন্যায়, সত্য, কল্যাণ ও মানবতাবোধের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে— কিভাবে তাদের প্রতিটি চিন্তা, প্রতিটি কাজ— এমনকি প্রতিটি পদক্ষেপকে পরিশুদ্ধ, প্রাণবন্ত, কল্যাণপ্রদ ও বাস্তবভিত্তিক করে গড়ে তোলার প্রেরণা ও পথনির্দেশ দিয়েছে পরবর্তী নিবন্ধে সে কথা তুলে ধরা হবে।

এই নিবন্ধের উপসংহার স্বরূপ এখানে প্রথমে আমরা পবিত্র কুরআন থেকে এমন কতিপয় বাক্য উদ্ধৃত করবো যা থেকে পাপ না করে কারো পাপী হওয়া, একজনের পাপের বোঝা অন্য জনের ওপর চাপিয়ে দেয়া, একজনের পাপের জন্য অন্য জনকে শাস্তি প্রদান, তথাকথিত পূর্বজন্মার্জিত পাপ বা পুণ্যের জন্য পরবর্তী জন্মে ছোটজাত বা বড় জাত হয়ে জন্মগ্রহণ প্রভৃতি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের অভিমত কি তা জানতে পারা যাবে।

পরে এমন কতিপয় বাক্য উদ্ধৃত করা হবে যা শুধু অভিনব এবং অভূতপূর্বই নয়— বিশেষভাবে বিপ্লবাত্মকও। পবিত্র কুরআন কোনও বিপ্লবী চেতনার মাধ্যমে আবহমানকাল ধরে চলে আসা এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্পূর্ণরূপে পালটিয়ে দিয়ে পাপ ও পাপী সম্পর্কীয় যাবতীয় বিভ্রান্তি ও ঘৃণা-বিদ্বেষের চিরঅবসান ঘটিয়েছে এই বাক্যসমূহ থেকে সেকথা অনায়াসে বুঝতে পারা যাবে।

❑ আল্লাহ তাঁর সৃষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মে মানব (মানবজাতি) সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্টিতে তারতম্য ও পরিবর্তন নেই, এই হচ্ছে স্থির জীবনদর্শন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তার খবর রাখেনা। — আল কুরআন ৩০ঃ ৩০

❑ প্রত্যেক মানুষই স্বীয় উপার্জন অনুসারে ফল পাবে, যা সে পাবে তা তার নিজের উপার্জিত ছাড়া অন্য কিছুই নয় এবং যে জন্য সে জবাবদিহি হবে তাও তার উপার্জন। — ঐ ২ ঃ ২৮৬

❑ প্রত্যেক মানুষ তার উপার্জনের ফলাফলের সঙ্গে আবদ্ধ। — ঐ ২৫ ঃ ২১;

❑ এই একটি দল জীবন কাটিয়ে গেল, তারা যা উপার্জন করে গেল সেই ফলই তাদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে। আর তোমরাও যেরূপ উপার্জন করবে সেইরূপ ফলই পাবে। — ঐ ২ ঃ ১৩৪।

www.pathagar.com

❑ যে ব্যক্তি পুণ্যকাজ করলো সে নিজের স্বার্থেই করলো এবং যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করলো তার দুর্ভোগ— সে নিজেই ভোগ করবে এবং (হে নবী) আপনার প্রভু নিজ বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নন। — আল কুরআন ৪১ : ৪৬।

❑ সেই দিন (বিচারদিবস) মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে কারণ তাদের নিজের কৃতকর্ম দেখানো হবে। কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখবে— অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখবে। — ঐ ৩০; জাল জালা

❑ হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের প্রতিপালক (মহান আল্লাহ) কে ভয় কর। তিনি একজন মানুষ থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের মাধ্যমে অসংখ্য নরনারী অর্থাৎ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। (অতএব জন্মগতভাবে মানুষে মানুষে কোনও ভেদ-বৈষম্য বা ছোটজাত বড়জাত বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারেনা– লেখক) — ঐ ১৬ ঃ ৭২;

❑ (হে মানবমণ্ডলী) তোমাদের এই জাতিগুলো মূলত একই জাতি এবং আমি তোমাদের সকলেরই প্রভু এবং প্রতিপালক। সুতরাং একমাত্র আমারই অর্চনা কর এবং একমাত্র আমাকেই ভয় কর। — ঐ ৩২, ৫২

❑ আমি বিশ্বের সকল মানুষকে সর্বাঙ্গ সুন্দর অর্থাৎ সর্বোত্তম উপাদানে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ করে সৃষ্টি করেছি। (অতএব ছোটজাত বড়জাত বলতে কিছু নেই— থাকতে পারেনা— লেখক) — ঐ ৩০; তীন

❑ পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। (অতএব মানুষ হিসাবে সকলে সমান মর্যাদার অধিকারী সুতরাং পূর্বজন্মার্জিত পাপ-পুণ্য বলতে কিছু থাকতে পারে না— লেখক)

❑ (হে রাসূল!) আপনার প্রভুর অন্যায়ভাবে কোনও বস্তী ধ্বংস করার অভিপ্রায় নেই এবং তিনি চান না যে বস্তীর অধিবাসীরা প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকুক। (তাঁর নিয়ম হলো) যে যেরূপ কাজ করবে সে সেইরূপ মর্যাদা লাভ করবে। আর স্মরণ রাখবেন যে— যে যা করে আপনার প্রভুর তা অজানা নয়। — ঐ ৬ ঃ ১৬২-১৩৪

মানুষে মানুষে ভেদ-বৈষম্য এবং ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্য মানুষই যে সর্বতোভাবে দায়ী সেকথা বলতে গিয়ে পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে যে—

❑ "..... অতঃপর মানুষ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সৃষ্টি করলো। প্রত্যেক দলই নিজেদের যা কিছু আছে তা নিয়েই সুখী।"

— আল কুরআন ২০ ঃ ৫৩।

❑ (হে নবী!) যারা একই দীনকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করেছে এবং ভিন্ন ভিন্ন দল বা জাতি গঠন করেছে তাদের সঙ্গে আপনার কোনও সম্পর্ক নেই। তাদের

www.pathagar.com

ব্যাপার আল্লাহর হাতেই ছেড়ে দিন, তাদের কাজের পরিণাম আল্লাহই তাদের জানাবেন। — ঐ ৬ ঃ ২৬

❑ ইহুদী ও নাছারারা বলে, মানুষ ইহুদী বা নাছারা না হলে বেহেশতে যেতে পারবেনা। এটা তাদের স্বকৌপলকল্পিত ছাড়া অন্য কিছুই নয়। (হে রাসুল) আপনি বলে দিন, যদি তোমাদের কথা সত্য হয় তা হলে দলিল পেশ কর। তবে হ্যাঁ— মুক্তির পথ সম্প্রদায়ভুক্তিতে নয় বরং আল্লাহর উদ্দেশে আত্মসমর্পন, সৎকাজ ও অটুট বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে।— ঐ ২ ঃ ১১১-১১২

❑ ইহুদীরা বলে নাছারাদের ধর্ম কিছু না। তেমনি নাছারারা বলে ইহুদীদের ধর্ম কিছু না অথচ উভয় দলই আল্লাহর কিতাব পাঠ করছে (অর্থাৎ উভয় দলের ধর্মের উৎস একই)। আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে যারা কিছুই জানেনা তারাও একই কথা বলে থাকে। (অর্থাৎ ইহুদী নাছারারা ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়গুলোও কেবল নিজদেরই ধার্মিক তথা মুক্তি পাওয়ার একমাত্র অধিকারী বলে দাবি করে)। ঠিক আছে যে কথা নিয়ে তারা পরস্পর ঝগড়া করছে শেষ বিচারের দিনে আল্লাহই তার ফয়সালা করবেন। — ঐ ২ ঃ ১১৩

মানুষের ভিন্ন ভিন্ন দলভুক্ত হওয়া সম্পর্কে পবিত্র হাদিসের একটি মাত্র উদ্ধৃতি তুলে ধরেই এ প্রসঙ্গের ইতি টানছি ঃ

"বিশ্বের প্রতিটি মানব শিশুই ইসলাম বা প্রাকৃতিক ধর্মের ওপর জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তী সময়ে তাদের পিতা মাতা প্রভৃতিরা তাকে ইহুদী, নাছারা, অগ্নিপূজক প্রভৃতিতে পরিণত করে। — আল হাদিস

এ নিয়ে আর উদ্ধৃতির সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি না। অতঃপর পাপ ও পাপী সম্পর্কে সুদীর্ঘকালের এইসব ভ্রান্ত ধারণা এবং ঘৃণা-বিদ্বেষের চিরঅবসান ঘটানোর জন্য পবিত্র কুরআন কর্তৃক যে সব বিপ্লবাত্মক বাণী ঘোষিত হয়েছে স্থানাভাববশত তার তিনটি মাত্রকে নিম্নে পৃথক পৃথকভাবে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ঃ

❑ পবিত্র কুরআনের সেই বিপ্লবাত্মক ঘোষণার একটি হলো— "…. তাদের (পাপী বা কপটদের) অন্তরে ব্যাধি রয়েছে অর্থাৎ তারা মানসিক রোগগ্রস্থ" (অতএব তাদের সাথে এমন সদয় সহানুভূতিপূর্ণ ও রোগনিরাময়জনক ব্যবহার করা উচিত যা অন্যান্য রোগীদের সাথে করা হয়ে থাকে।)।

— আল কুরআন ১ ঃ ১২

পাপীদের মানসিক রোগগ্রস্থ' হওয়া সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের এই ঘোষণা যে কত বাস্তব এবং সত্যভিত্তিক পাপীদের কাজ-কারবার ও আচার-আচরণ

www.pathagar.com

সম্পর্কে একটু চিন্তা করলেই সেকথা বুঝতে পারা যায়। তথাপি নিম্নে দু'একটি উদাহরণ তুলে ধরা যাচ্ছে—

❑ শিক্ষা, পদ-মর্যাদা, জ্ঞান-প্রজ্ঞা প্রভৃতির দিক দিয়ে প্রথম কাতারের মানুষদের কোনও কোনও মানুষকে যখন মদ্যপান করে মাতলামি করতে অথবা জুয়া খেলায় সর্বস্বান্ত হতে কিংবা সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী ও সতী সাধ্বী স্ত্রীকে ফেলে পর নারী বা বারবণিতার প্রতি আসক্ত হতে দেখা যায় তখন তাকে পাগল অন্ততপক্ষে মানসিক রোগগ্রস্থ ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?

❑ মৃত্যু অবধারিত হওয়া সম্পর্কে শত শত বাস্তব প্রমাণ চোখের সম্মুখে বিদ্যমান থাকার পরও যারা নিজেদের মৃত্যু সম্পর্কে উদাসীন, যারা শক্তির দাপটে ধরাকে সড়া জ্ঞান করে লম্ফঝম্প করে এবং যারা লোভ-লালসায় মত্ত হয়ে যে কোনও পন্থায় বিত্তবিভব ও সম্মান প্রতিপত্তির পাহাড় গড়াকেই জীবনের একমাত্র ব্রত হিসাবে গ্রহণ করে, তাদের মানসিক রোগী ছাড়া আর কি বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে?

❑ অন্তরে বিদ্যমান পশুটাকে আয়ত্বাধীন করে মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনই যেখানে ধর্মের লক্ষ্য সেখানে ধার্মিক হওয়ার দাবিদার কোনও কোনও ব্যক্তিকে যখন নিজেদের গোপন অবস্থা প্রকাশ্য কার্য-কলাপের দ্বারা পশুত্বকেও হার মানাতে দেখা যায় তখন তাদের মানসিক রোগগ্রস্থ ছাড়া আর কিছু বলার সুযোগ কোথায়?

❑ যারা চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার প্রভৃতি পাপে লিপ্ত হয় তাদের এসব কাজ করতে গিয়ে যত বেশি পরিশ্রম, যত বেশি চিন্তা-ভাবনা এবং যত বেশি জীবনের ঝুঁকি নিতে হয় তার চেয়ে অনেক কম পরিশ্রম, কম চিন্তা-ভাবনা এবং সামান্যতম জীবনের ঝুঁকি না নিয়েও তারা সৎভাবে জীবনযাপন করতে পারে। অথচ তারা তা করেনা। বিবেকের দংশন, লোক-লজ্জা, পরকাল, জেল-জুলুম প্রভৃতি সবকিছুকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে তারা একাজ চালিয়ে যায়। এমতাবস্থায় ওসব পাপীকে মানসিক রোগগ্রস্থ ছাড়া আর কিইবা বলা যেতে পারে?

পাপীরা যে আসলে মানসিক রোগগ্রস্থ আশা করি সে সম্পর্কে আর অধিক উদাহরণ তুলে ধরার প্রয়োজন হবে না।

অতএব এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, সেই প্যাগানযুগ থেকে শুরু করে কুরআন-পূর্ব সময় পর্যন্ত পাপী তথা মানসিক রোগগ্রস্থদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ ও অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে শুধু তাদের রোগকেই প্রচণ্ডভাবে বাড়িয়ে তোলা হয়নি অসংখ্য অগণিত ভালো মানুষকেও সংক্রমিত এবং রোগগ্রস্থ করার কাজ চালিয়ে যাওয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

পৃথিবীতে পাপ ও পাপীর সংখ্যা এমন অবিশ্বাস্যভাবে ও দ্রুত গতিতে বেড়ে চলার একমাত্র না হলেও এটাই অন্যতম প্রধান কারণ কি না সহৃদয় পাঠকমণ্ডলীকে সেকথা ভেবে দেখার অনুরোধ জানিয়ে রাখছি।

❑ পবিত্র কুরআন শুধু পাপীদের মানসিক রোগগ্রস্থ বলেই ক্ষান্ত হয়নি— তাদের প্রতি আবহমানকাল ধরে চলে আসা যাবতীয় ঘৃণা-বিদ্বেষ এবং এ ধরনের অত্যাচার নির্যাতনের চিরঅবসান ঘটানোর জন্য তাদের প্রতি নিবদ্ধ বিশ্ববাসীর দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে ফিরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে নানাভাবে এবং নানা ভঙ্গিতে পবিত্র কুরআন যে সবকথা বলেছে তার সারমর্ম হলো— "পাপীরা আসলে মানসিক রোগগ্রস্থ। অতএব তাদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ ও অত্যাচার নির্যাতন প্রভৃতি চালিয়ে যাওয়া অন্যায়, অমানবিক এবং ভ্রান্ত ধারণা-প্রসূত। সুতরাং তোমরা পাপীকে নয়— পাপকে ঘৃণা কর।"

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে দেহের রোগ অপেক্ষা মানসিক রোগ অনেক বেশি জটিল— তার চিকিৎসা এবং সেবা-শুশ্রূষার নিয়ম পদ্ধতিও অনেকটা ভিন্ন ধরনের।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, দৈহিক রোগের জন্য রোগনির্ণয়, ঔষধ ও পথ্য নির্বাচন এবং নিয়মিতভাবে তাদের প্রয়োগ-ব্যবহারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হয়।

পক্ষান্তরে মানসিক রোগের বেলায় প্রয়োজন হয়— রোগীর অবস্থা অনুধাবন করে স্নেহ-ভালবাসা, দয়া-মমতা, সোহাগ-সহানুভূতি আদর-আপ্যায়ন, ক্ষেত্রবিশেষে ক্রোধ প্রকাশ বা ভয় প্রদর্শন, আশা-আশ্বাস প্রভৃতির মাধ্যমে রোগীর মনের ওপর প্রভাব বিস্তারের।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেহের রোগীরা তাদের রোগ সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং নিজেদের উদ্যোগেই রোগ নিরাময়ের প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। পক্ষান্তরে মানসিক রোগীরা আসলে যে রোগী সে বোধই তাদের থাকে না। ফলে ব্যক্তিগতভাবে নিরাময়ের উদ্যোগও তাদের দ্বারা গৃহীত হয় না।

এমতাবস্থায় এই সব রোগীদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য প্রদর্শন, নিষ্ঠুরতা ও অমানবিক ব্যবহার যে কত বেশি ক্ষতিকর সেকথা সহজেই অনুমেয়।

সেই কারণেই পবিত্র কুরআন পাপীদের নয়— বরং পাপকে ঘৃণা করতে বলেছে এবং পাপীরা যে আসলে মানসিক রোগগ্রস্থ সেকথা মনে রেখে তাদের প্রতি সদয় সহানুভূতিশীল ও স্নেহপ্রবণ হতে বলেছে।

শুধু তাই নয়— তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতে হবে মানুষকে তা শেখানোর জন্য স্বয়ং আল্লাহ পাপীদের প্রতি কত দয়াশীল ও স্নেহপ্রবণ তার

www.pathagar.com

নমুনাও তুলে ধরেছে। উদাহরণ স্বরূপ এই নমুনা সমূহের তিনটি মাত্রকে নিম্নে তুলে ধরা হলো।

❑ "বল, হে আমার পাপী বান্দারা! যারা নিজেদের আত্মার ওপরে অন্যায় অত্যাচার করে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছ (তারা) আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পর্কে নিরাশ হয়োনা। (তোমরা যদি অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আস এবং সৎকার্যে রত থাক) নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের সকল পাপ ক্ষমা করবেন। (মনে রেখো) তিনি অসীম ক্ষমাশীল ও পরম দয়াময়। — আল কুরআন ৩৯ ঃ ৫৩।

❑ "(হে আমার পাপী বান্দাগণ!) তোমরা তোমাদের প্রতিপালক (আল্লাহ)-এর কাছে ক্ষমা চাও এবং জান্নাতের দিকে অগ্রসর হও— যার প্রসারতা ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল সদৃশ এবং যা মোত্তাকীদের (খোদাভীরু) জন্য নির্মিত হয়েছে।"

"(হে আমার পাপী বান্দাগণ!) তোমরা স্বচ্ছলতা ও অভাবের মধ্যে দান কর, ক্রোধ সম্বরণ কর, সকলের প্রতি ক্ষমাশীল হও এবং (ভূল, অজ্ঞতা বা উত্তেজনা বশত) কোনও অশ্লীল কাজ ও নিজের জীবনের প্রতি অত্যাচারমূলক কোনও কাজ করে ফেল (তবে) আল্লাহকে স্মরণ কর। (বলতো) তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করার জন্য আল্লাহ ব্যতীত আর কে আছে?"

— আল কুরআন ৪ ঃ ১৩৩-১৩৬

লক্ষ্যণীয় যে, এতদ্বারা সর্বাবস্থায় দান, ক্রোধ সম্বরণ, সকলের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন প্রভৃতি যা কিছু করতে বলা হয়েছে তা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্রাদি নির্বিশেষে সকলের প্রতি প্রযোজ্য। আশা করি, এ থেকে ইসলাম যে সর্বজনীন সেকথা বুঝতে কারো কষ্ট হবে না।

প্রিয় পাঠকবর্গ! উদাহরণের সংখ্যা আর বাড়াতে চাই না। ওপরের এই তিনটি মাত্র উদ্ধৃতি মনোযোগের সাথে পাঠ করুন। তাহলে এ কথাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনাদের মনে জেগে উঠবে যে ঠিক যেন কোনও স্নেহশীল পিতা অন্তরের সকল দরদ, সকল বাৎসল্য এবং সকল ব্যাকুলতা নিয়ে তার অবাধ্য ও বিপথগামী পুত্রদের আদরের সাথে কাছে ডেকে অভয় দিচ্ছেন এবং বলছে— "হে আমার আদরের পুত্ররা! তোমাদের কোনও ভয় নেই, আমার স্নেহ ও দয়ার দুয়ার সর্বদা তোমাদের জন্য আমি উন্মুক্ত করে রেখেছি। তোমরা তোমাদের নিজেদের ভুল বুঝতে চেষ্টা কর। অনুতপ্ত হও এবং ফিরে আস। আর সাথে সাথে সৎ কাজে ব্রতী হও। তাহলে আমি শুধু তোমাদের অতীতের সকল অপরাধ ক্ষমাই করবো না তোমাদের বিশেষভাবে পুরস্কৃতও করবো। মনে রেখো, আমি তোমাদের স্নেহশীল এবং দয়ার্দ্র পিতা! আর আমার মতো স্নেহশীল এবং দয়ার্দ্র পৃথিবীতে কেউ হতে পারে না।"

www.pathagar.com

বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আরবি ভাষায় "ইয়া" অক্ষরটি সম্মান ও ভালোবাসার পরিচয় বহন করে। পবিত্র কুরআনের পাঠকমাত্রই জানেন যে, আল্লাহ যেখানেই পাপীদের লক্ষ্য করে কিছু বলেছেন অথবা তাদের কথা উল্লেখ করেছেন সেখানেই সম্মান ও ভালোবাসার পরিচয় সূচক এই 'ইয়া' অক্ষরটি যুক্ত করে সম্বোধন করেছেন।

উদাহরণ স্বরূপ এ-ধরনের একটি আয়াতের অংশ বিশেষ তুলে ধরা যেতে পারে। যথা— "কুল ইয়া ই'বাদি আল্লাজী আসরাফু আলা আন ফুসিহিম" অর্থাৎ— হে আমার পাপী বান্দারা! যারা নিজেদের আত্মার ওপর অত্যাচার করেছ। ইত্যাদি।"

একথা ভেবে মুগ্ধ এবং বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না যে, এক বা দু' স্থানে— নয় পবিত্র কুরআনের বিশটিরও অধিক স্থানে আল্লাহ পাপীদের সম্বোধন করতে সম্মান ও ভালোবাসার সম্বন্ধ-সূচক এই 'ইয়া' অক্ষরটি ব্যবহার করেছেন। আমাদের শেষ বা তৃতীয় উদাহরণটি হলো ঃ

❑ "(হে রাসূল!) প্রত্যেক জাতির জন্য পথ প্রদর্শক (হাদি) থাকে (প্রেরণ করা হয়) ..."। — আল কুরআন ১০ ঃ ৪৭

একথা বলাই বাহুল্য যে, মানবজাতিকে পথ প্রদর্শনের জন্যই যুগে যুগে এবং দেশে দেশে এই হাদী বা পথপ্রদর্শক পাঠানো হয়েছে। কেউ যদি পাপ পথে না যেতো অর্থাৎ সকল মানুষই যদি সৎপথে চলতো তাহলে এই হাদী বা পথপ্রদর্শক পাঠানোর কোনও প্রয়োজনই হতো না।

অতএব পাপী বা পথভ্রষ্টদের সৎপথ প্রদর্শনের জন্যই যে পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ হাদী বা নবী-রসূল এবং কতিপয় আল্লাহর বিধান পাঠানো হয়েছে সেকথা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আসল কথা হলো— সৃষ্টি-রক্ষা এবং মানুষের কল্যাণের জন্যই তাকে রীপু, ইন্দ্রিয়, কামশক্তি প্রভৃতি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। এসবের সীমা লংঘন বা অপ-প্রয়োগ অশান্তি ও অকল্যাণের কারণ ঘটায় বলেই এই সীমা লংঘন ও অপ-প্রয়োগের কাজকে পাপ বলা হয়ে থাকে।

এ থেকে বিরত থাকার জন্য মানুষকে জ্ঞান, বিবেক, প্রজ্ঞা প্রভৃতি দ্বারা সমৃদ্ধ করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, এই জ্ঞান-বিবেকাদির বিবৃতিকেই পবিত্র কুরআনে 'মানসিক ব্যাধি' বলা হয়েছে।

মানুষের দোষেই এসবের বিকৃতি ঘটে। সুতরাং মানুষই এজন্য দায়ী। মানুষ যে এসবের বিকৃতি ঘটাবে এবং সীমালংঘন ও অপপ্রয়োগ করবে সেকথা বিশ্বস্রষ্টা জানেন— যেহেতু তিনি সর্বজ্ঞ। মানুষ যাতে এ থেকে বিরত থাকে, অন্ততঃ অপ-প্রয়োগ বা সীমালংঘনের পরও ফিরে আসার সুযোগ পায় সেই

www.pathagar.com

কারণে তিনি মানুষের জন্য নবী রসুল ও জীবনবিধান পাঠিয়েছেন এবং সেই জীবনবিধানের মাধ্যমে বিশ্বের পাপী বা সীমালংঘন কারীদের কতখানি দরদ দিয়ে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন পবিত্র কুরআনের ওপরোদ্ধৃত তিনটি বাণী থেকে আমরা সেকথা জানতে পেরেছি। পাপীদের প্রতি আল্লাহ্‌র ব্যবহার সম্পর্কে জানার পর যেহেতু নবী-রসূলগণই হলেন আল্লাহর বিধানের বাস্তব-নমুনা এবং মানুষের আদর্শ অতএব এবারে আসুন সেই নবী-রসুলগণ পাপীদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন অতি সংক্ষেপে সেকথা জানতে চেষ্টা করি।

নবী-রসুলদের প্রত্যেকেই যে তাদের নিজ নিজ সময়ের পাপী বা পথ-ভ্রষ্টদের দ্বারা ভীষণভাবে লাঞ্ছিত অত্যাচারিত হয়েও কোনও প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি বরং সবকিছুকে ক্ষমা-সুন্দর চোখে দেখেছেন, তাদের সেবা করেছেন এবং তাদের কল্যাণ, মঙ্গল ও সৎ পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা করেছেন সেকথা ইতিহাস এবং ধর্মীয় বিধানের পাঠকমাত্রেরই জানা রয়েছে।

বলাবাহুল্য, এই প্রতিশোধগ্রহণ না করার কারণ এটা-ই ছিল যে, তাঁরা জানতেন ঃ পাপীরা মানসিক রোগগ্রস্থ অর্থাৎ— অপ্রকৃতিস্থ। সুতরাং প্রতিশোধগ্রহণের কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না।

এ সম্পর্কে মহাত্মা যীশুখৃস্টের জীবনের ইতিহাস প্রসিদ্ধ একটি ঘটনার কথা তুলে ধরা যেতে পারে ঃ

এক পাপীষ্ঠা রমণী তাঁর কাছে এলে তিনি নিজের চুল দ্বারা সেই নারীর পদ-যুগল মুছিয়ে দিয়েছিলেন। কপট ফারিসিও তা দেখে বিস্মিত ও সমালোচনামুখর হয়ে উঠেছিল।

বলা অবশ্যক যে, এই ঘটনার পর থেকেই ফারিসিওর নামানুসারে কপটতাকে Pharisaism বলে আখ্যায়িত করা হয়ে আসছে।

ফারিসিওর প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা যীশুখৃস্ট বলেছিলেন— "রোগীদের জন্যই তো চিকিৎসকের প্রয়োজন— সুস্থ মানুষের জন্য নয়।"

অতঃপর তিনি যা বলেছিলেন তার সারমর্ম হলো— হে খোদাপ্রেমিক দল! আমাদের ভাগ্যেই বেহেশত; কারণ পাপীরাই দয়ার দাবি রাখে।

পাপী অর্থাৎ বিপথগামীদের দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পবিত্র দাঁত ভেঙ্গে দেয়া, তায়েফের ময়দানে প্রস্তরাঘাতে তাঁর পবিত্র শারীর ক্ষতবিক্ষত করা, অন্যায়ভাবে পুনঃ পুনঃ তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া প্রভৃতি অকথ্য অত্যাচার-নির্যাতন সত্ত্বেও তিনি যে সামান্যতম প্রতিশোধও গ্রহণ করেননি বরং রাষ্ট্র-ক্ষমতা হাতে পাওয়ার সাথে সাথে প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে একবাক্যে সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন সেকথা কারো অজানা নয়।

www.pathagar.com

একথাও কারো অজানা নয় যে, অতি জঘন্যভাবে অত্যাচারিত হওয়ার সময়েও তিনি আকুলভাবে প্রার্থনা করেছেন— হে আল্লাহ! আমি যে ওদের কল্যাণকামী সেকথা ওরা বুঝতে পারছে না; অতএব তুমি এ অত্যাচারের জন্য ওদের দায়ী করোনা! ওদের ক্ষমা করে দাও এবং সৎপথ দেখাও!

পরিশেষে প্রসিদ্ধ মুসলিম শরীফের একটি হাদিস উদ্ধৃত করে এই প্রসঙ্গের ইতি টানছি ঃ

বিশ্বনবী (স) বলেছেন, যাঁর মুঠোয় আমার প্রাণ তাঁর শপথ! যদি তোমরা এমনি হও যে পাপ তোমাদের হবেই না তাহলে আল্লাহ তোমাদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে এমন এক জাতি পাঠাবেন— যারা পাপ করবে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে থাকবে।"

এই বিখ্যাত ও অতি মূল্যবান হাদিসটির তাৎপর্য সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, মানুষ জড়পদার্থ বা পাপ-প্রবণতাহীন ফেরেশতা নয়। যেহেতু মানুষের মধ্যে পাপ-প্রবণতা রয়েছে অতএব তার পক্ষে পাপ করা অন্যায় হলেও অস্বাভাবিক নয়।

বলাবাহুল্য, এই হাদীসের মাধ্যমে সেই স্বাভাবিকতার কথাই বলা হয়েছে। সাথে সাথে তওবা (অনুতাপ) বা ক্ষমা ভিক্ষা করার কথা বলার মাধ্যমে মানুষের নীতিবোধ বিদ্যমান থাকার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

বলাবাহুল্য, এই পাপ-প্রবণতা এবং নীতিবোধের জন্যই মানুষের জীবন সংগ্রামমুখর হতে পেরেছে; আর এই সংগ্রামের জন্যই মানুষের সৃষ্টি— মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব।

একদিকে এই সংগ্রামের মাধ্যমে সে তার নৈতিক শক্তিকে বাড়িয়ে তুলবে অন্যদিকে কোনও দুর্বল মুহূর্তে তার দ্বারা যদি কোনও পাপের কাজ হয়েও যায় বিবেকের দংশন এবং অনুতাপের দহন তাকে একটি পাপের পরিবর্তে অনেক বেশি পরিমাণে পুণ্যের কাজে উৎসাহিত-অনুপ্রাণিত করে তুলবে। ফলে পাপ করে সে যতটুকু পিছিয়ে গিয়েছিল পুণ্যের প্রভাবে তার তুলনায় অনেক বেশি এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

আশা করি, পাপীদের প্রতি আমাদের ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত ওপরের এই আলোচনা থেকে তা বুঝতে পারা যাবে। তবে কেউ যদি মনে করেন যে, পাপীদের রোগী সাব্যস্থ করে তাদের প্রতি এমনি পাইকারীভাবে ক্ষমা, দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শনের নীতি ঘোষণা দ্বারা ইসলাম প্রকৃতপক্ষে পাপের পথকেই প্রশস্ত করেছে তবে তারা প্রচণ্ড ভুল করবেন।

www.pathagar.com

কেন এবং কিভাবে ভুল করবেন সেকথা এখানেই বলা উচিত ছিল। কিন্তু বিশেষ কারণে এখানে তা বলা হলো না। 'হাত কাটার আইন' উপশিরোনাম দিয়ে অতঃপর সেই 'কেন'-র উত্তর দেয়া হবে।

হাত কাটার আইন

এখানে যা লিখতে যাচ্ছি তা পূর্ববর্তী নিবন্ধেরই অংশবিশেষ; পৃথকভাবে না লিখলেও চলতো; দু'টি বিশেষ কারণে পৃথকভাবে লিখা এবং 'হাত কাটার আইন' উপশিরোনাম বেছে নেওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হলো।

সেই দু'টি বিশেষ কারণের একটি হলো— পাপীদের সংশোধনের জন্য পবিত্র কুরআন প্রয়োজনবোধে ভিন্ন যে ব্যবস্থাটি গ্রহণ করতে বলেছে তা তুলে ধরা। আর দ্বিতীয়টি হলো— বিভিন্ন মহল কর্তৃক ইসলামের 'হাত কাটার আইন' সম্পর্কে উদ্দেশ্যমূলকভাবে যেসব বিরূপ সমালোচনা ও ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়ে থাকে তাঁর নিরসন ঘটানোর চেষ্টা করা।

কিন্তু অসুবিধা হলো— উল্লিখিত দু'টি বিষয়েই বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্যাদি সহকারে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। অথচ নানা কারণে এখানে তা সম্ভব হচ্ছে না। অতএব বাধ্য হয়ে অতি সংক্ষেপে কিছু বলেই প্রসঙ্গের ইতি টানতে হচ্ছে।

কেউ কেউ হয়তো বলতে পারেন যে, পবিত্র কুরআনেও পাপীদের জন্য কঠোর ও ভয়াবহ শাস্তি অবধারিত থাকার কথা পুনঃ পুনঃ বলা হয়েছে। স্বয়ং আল্লাহই যেখানে পাপীদের শাস্তি প্রদানের জন্য ভয়ংকর দোজখ সৃষ্টি করে রেখেছেন সেখানে এই পৃথিবীর শান্তিশৃংখলা রক্ষার জন্য যদি কিছু শাস্তির ব্যবস্থা হয় তবে সেটা দোষণীয় হবে কেন?

বলাবাহুল্য, দু'চার কথায় এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। বিষয়টিকে অতি সংক্ষেপে বোঝানোর জন্য একটি উদাহরণ তুলে ধরা যাচ্ছে।

কোনও অভিজ্ঞ চিকিৎসক রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে সুস্থ ব্যক্তিদের সাবধান সতর্ক করার জন্য রোগের ভয়াবহতার বর্ণনা করেন এবং সাধারণত তাঁর বর্ণনা-ভঙ্গি এমনই হয় যে, শ্রোতাদের মনে যেন প্রকৃতই ভয়ের সঞ্চার হয় এবং নিজেদের গরজেই তারা যেন সাবধানতা অবলম্বন করে।

রোগীকে লক্ষ্য করে অনিয়ম এবং অসাবধানতার পরিণাম যে তার রোগকে কিরূপ ভয়াবহ পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারে সেকথাও তিনি বলে থাকেন। কিন্তু কোনও চিকিৎসকই রোগীকে ভয় বা ঘৃণা করতে বলেন না। বরং যে রোগী যত বেশি কঠিন রোগে আক্রান্ত সেই রোগীর প্রতি তত বেশি যত্ন নেয়ার পরামর্শ এবং উপদেশ দিয়ে থাকেন।

www.pathagar.com

আল্লাহ পাপীদের শাস্তি প্রদানের জন্য ভয়াবহ দোযখ সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, দোযখ সৃষ্টি করেছেন বলেই মানুষকে দোযখে যেতে হবে। বরং আসল কথা হলো— মানুষ অন্যায় কাজ করে দোযখে যাবে বলেই দোযখ সৃষ্টি করা হয়েছে।

আল্লাহ মানুষকে দোযখে দিতে চান না বলেই পুনঃ পুনঃ দোযখের ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন, জান্নাতের সুখ-সৌন্দর্যের আশ্বাস দিয়েছেন, লক্ষ লক্ষ নবী-রাসুল ও বহুসংখ্যক কিতাব পাঠিয়ে সৎপথে চলার উৎসাহ ও প্রেরণা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। মনে রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ নির্দয় বা প্রতি-হিংসাপরায়ণ নন, মানুষকে শাস্তি দিয়ে তাঁর কোনও লাভ বা সম্মান বৃদ্ধির প্রশ্নও থাকতে পারে না।

এ সম্পর্কে একটি বিখ্যাত হাদিস (কুদসী)-এর উদ্ধৃতি তুলে ধরার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। উক্ত হাদিসটির হুবহু বঙ্গানুবাদ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

"হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল মানুষ ও জিন মিলে তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যবান ব্যক্তির মত হয়ে যেতে, তা হলেও আমার প্রভুত্বের কিছুমাত্র বৃদ্ধি পেতো না।"

"হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল জিন ও মানুষ মিলে তোমাদের সর্বনিকৃষ্ট পাপীর মত হয়ে যেতে, তাতেও আমার প্রভুত্বের কোনও ক্ষতি হতো না।"

"হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল জিন ও মানুষ মিলে আমার কাছে যার যা খুশি প্রার্থনা করতে এবং আমি প্রত্যেককে তার সম্পূর্ণ চাহিদা মিটিয়ে দিতাম, তাতে আমার ভাণ্ডার একটা শুইয়ের ছিদ্র গলিয়ে যতটুকু পানি পার করা যায় ততটুকুতে একটা মানুষের যদি কোনও ক্ষতি না হয়, আমার হয়ত ততটুকুই হতো।"

"হে আমার বান্দারা! (স্মরণ রাখিও) তোমাদের সব কাজই আমার কাছে সুরক্ষিত থাকে এবং আমি তার যথাযথ ফলাফল তোমাদের ফিরিয়ে দেই। সুতরাং তোমাদের যারা সুফল লাভ কর, তারা যেন আমার প্রশংসা করতে থাক এবং যারা কুফল পাও, তারা যেন নিজেকে ছাড়া আর কাকেও দায়ী না কর।"

এ সম্পর্কে শেষ কথা হলো— সমাজের শান্তি-শৃংখলার স্বার্থে পাপীদের শুধু ন্যায়ভিত্তিক এবং সংশোধনমূলকই হতে হবে; কোনওক্রমেই ঘৃণা-বিদ্বেষ বা প্রতিহিংসামূলক কিংবা অন্যায়-অসঙ্গত হওয়া চলবে না।

এবারে 'হাত কাটার আইনের' কথায় আসা যাক। পবিত্র কুরআন পাপীদের মানসিক রোগ-গ্রস্থ বলেই যে ক্ষান্ত হয়নি তা নিরাময়ের জন্যও যে প্রকৃষ্ট এবং

www.pathagar.com

বিজ্ঞানসম্মত পথ-পদ্ধতির সন্ধান দিয়েছে ইতোপূর্বে সেকথা আমরা জানতে পেরেছি।

কিন্তু সমাজে এমন পাপীও থাকে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থাগ্রহণের পরও নানা কারণে যাদের রোগ নিরাময় না হয়ে উত্তরোত্তর বেড়েই চলে এবং আক্রান্ত অংশে পচন শুরু হয়ে গোটা দেহটাকেই ধ্বংসের সম্মুখীন করে।

সেই অবস্থায় শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে অভিজ্ঞ চিকিৎসক যেভাবে আক্রান্ত ও পচনশীল অংশটাকে বিচ্ছিন্ন করে দেহটাকে রক্ষা করার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন ইসলামও ঠিক সেই ব্যবস্থাই অবলম্বন করতে বলেছে।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, পাপী বা পবিত্র কুরআনের ভাষায় মানসিক রোগগ্রস্থ ব্যক্তিরাও সমাজেরই অংশ-বিশেষ। এমতাবস্থায় যথাযোগ্য ব্যবস্থাগ্রহণের পরও নিরাময়ের সকল সম্ভাবনাই তিরোহিত হয়েছে এবং পচন ধরেছে এমন রোগী বা রোগীদের দ্বারা যদি গোটা সমাজ বা সমাজের কোনও অংশ আক্রান্ত ও পচনের সম্মুখীন হয় তবে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থেই তা সমাজদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।

এটাকে প্রতিহিংসা, নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা বা এ ধরনের অন্য কিছু বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে না। বরং এই অবস্থায় চুপ থাকা বা যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন না করাই যে বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা এবং রোগী ও গোটা সমাজদেহটারই সর্বনাশ সাধন কোনও চিন্তাশীল এবং স্থির-প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই সেকথা অস্বীকার করতে পারেন না।

আর পারেন না বলেই ইসলামের খলিফা তাঁর ব্যভিচারী এবং সংশোধনের সকল আশা তিরোহিত হয়ে যাওয়া পুত্রকে অবিচলিত চিত্তে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন; ইসলামের শেষ এবং শ্রেষ্ঠ নবী (স) উদাত্ত এবং দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর কলিজার টুকরা কন্যাও যদি চৌর্যাপরাধে অপরাধী হয় তবে হস্তচ্ছেদ না করে তাঁকেও রেহাই দেয়া হবে না। বলাবাহুল্য, ইসলামের স্বর্ণযুগের ইতিহাসে এমন বহু ঘটনার বিবরণই প্রোজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

বলাবাহুল্য, ইসলাম চৌর্যাপরাধের জন্য হাত কাটার নির্দেশ দিয়েছে। আমরা জানি, মানুষ অভাবের তাড়না অথবা স্বভাবের দোষে চুরিবিদ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে। অতএব এই অভাব এবং স্বভাবের ক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক কোনও কোনও ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়ে থাকে প্রথমেই সেকথা জানার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ যে নেই পূর্বেই সেকথা বলা হয়েছে। অগত্যা এ সম্পর্কীয় কয়েকটি মাত্র দিকের প্রতি পৃথক পৃথকভাবে আলোকপাত করা যাচ্ছে ঃ

www.pathagar.com

❑ ইসলামী রাষ্ট্র তার মুসলমান নাগরিকদের প্রকৃত মুসলমানরূপে গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করে। যার ফলে তারা এমনই একজন প্রভুর অস্তিত্বে গভীর বিশ্বাসী হয়ে ওঠে— যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিরাজিত এবং সকলের প্রভু ও মহা বিচারক; যাকে ফাঁকি দেয়া এবং বিচার এড়িয়ে যাওয়ার সামান্যতম সুযোগও নেই।

❑ তাদের মনে এ বিশ্বাসও গভীরভাবে গড়ে তোলা হয় যে, প্রতিটি মানুষকেই শেষবিচারের দিনে নিজ নিজ কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে— যেদিন বিন্দু পরিমাণ পাপ বা বিন্দুমাত্র পুণ্যকেও উপেক্ষা করা হবে না।

❑ চুরি, ব্যভিচার প্রভৃতি যে অতি জঘন্য ধরনের পাপ এবং সেজন্য যে পারলৌকিক শাস্তি ছাড়া ইহজগতেও যথাক্রমে হস্তকর্তন ও প্রস্তরাঘাতে প্রাণদণ্ডের বিধান রয়েছে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকেরই সেকথা বেশ ভালোভাবে জানা থাকে।

❑ ইসলামী রাষ্ট্র তার নাগরিকদের কর্ম-সংস্থান, বেকার-বিকলাঙ্গ-অচল ও বৃদ্ধদের ভাতা প্রদান বা সৎভাবে জীবনযাপনের ব্যবস্থা করে থাকে।

❑ ইসলামী রাষ্ট্র তার নাগরিকদের নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়তা করে। অর্থাভাব পত্নীগ্রহণে অসমর্থ এমন ব্যক্তিদের আর্থিক সাহায্য প্রদান করে, সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ এবং একাধিক বিবাহ সমর্থন করে ব্যভিচারের পথ রুদ্ধ করার প্রয়াস পায়।

❑ পর-নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়াতো দূরের কথা পবিত্র কুরআন যে ব্যভিচারের নিকটবর্তী হতেও কঠোরভাবে নিষেধ করেছে এবং পর-নারীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাতকেও অতি জঘন্য এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করেছে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক মাত্রেরই সেকথা অতি অবশ্যই জানা থাকে।

এসব ব্যবস্থার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করার পরও যদি কোনও ব্যক্তি চুরি করেছে বলে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় এবং চুরি করার সপক্ষে গ্রহণযোগ্য কোনও কারণ না থাকে কেবলমাত্র সে ক্ষেত্রেই 'হাত কাটার' বিধানকে কার্যকরী করা হয়ে থাকে।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, সকল দিক পুংখানুপুংখরূপে বিচার বিবেচনা না করে এ দণ্ড দেয়া হয় না। সেই কারণেই দেখা যায় যে, সুদীর্ঘ চার শত বছরের মধ্যে মাত্র ছয়টি ক্ষেত্রে এ দণ্ড কার্যকরী করা হয়েছে। ("ইসলামের শাস্তিনীতি" ২য় পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

এ থেকে সমালোচক ও ঠাট্টা-বিদ্রুপকারীদের চোখ ফুটবে কি না একমাত্র তাঁরাই সেকথা বলতে পারেন।

www.pathagar.com

অনুরূপভাবে ব্যভিচারীর দণ্ড সম্পর্কেও বলা যেতে পারে যে, চরিত্র গঠন, একাধিক বিবাহের ব্যবস্থা, আইনের কঠোরতা প্রভৃতি জানা থাকা সত্ত্বেও কোনও বিবাহিত নরনারী যদি বয়স্ক, বুদ্ধিমান, সত্যবাদী এবং ধর্মভীরু বলে বিবেচিত চার চার জন্য ব্যক্তির সুস্পষ্ট দৃষ্টিসীমার মধ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার মতো বেহায়া, বেপরওয়া এবং উচ্ছৃংখল হয় তবে কেবলমাত্র সে ক্ষেত্রেই ইসলাম প্রাণদণ্ডের বিধান দেয়।

এ নিয়ে আর বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে ইসলামী আইনের সমালোচক এবং ঠাট্টা-বিদ্রুপকারীদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতে চাই যে, আপনারা দয়া করে নিজ নিজ দেশের চোর এবং ব্যভিচারীদের বর্তমান সংখ্যার সাথে আজও যেসব দেশে ইসলামী আইনের ছিটে-ফোটা বিদ্যমান রয়েছে সেসব দেশের চোর এবং ব্যভিচারীদের সংখ্যাটা একবার মিলিয়ে দেখুন, তাহলেই নিজেদের ভুলটা হয়তো আপনারা বুঝতে পারবেন।

পরিশেষে ইসলামের 'হাত কাটার আইন'-এর সমালোচক এবং ঠাট্টা বিদ্রুপকারীদের বলতে চাই যে, পৃথিবীর অন্য অনেক ধর্মেই চোরের শুধু হাত কাটাই নয়— প্রাণদণ্ডের বিধানও রয়েছে। অথচ তা নিয়ে আপনাদের টু শব্দটিও করতে দেখা যায় না। শুধু ইসলামের বেলায়-ই আপনাদের এত গাত্রদাহের কারণটা কি?

প্রচণ্ড স্থানাভাব সত্ত্বেও শুধু আপনাদের অবগতির জন্য অন্য ধর্মের এ সম্পর্কীয় একটিমাত্র শ্লোকের অংশ বিশেষকে নিম্নে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে।

> ধান্যং দশভ্যঃ কুম্ভে ভ্যো হর তোহভ্যধিকং বধঃ।
> শেষেহপ্যে কা দশ গুফ্ দাপাস্তস্য চ তদ্ধনম ॥ ৩২০ ॥
> তথা ধরিম মেয়ানাং শতাদভাধিকে বধঃ।
> সুবর্ণ রজতাদীনা মুত্ত মানাঞ্চ বাস সাম ॥ ৩২১।
> পঞ্চাশতস্ত ভ্য ধিকে হস্তচ্ছেদন মিষ্যতে।
> শেষে ত্বেকাদশ গুণং মূল্যাদ্দণ্ডং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৩২২ ॥

অর্থাৎ— দুইশত পলে এক দ্রোণ পরিমাণ বিশেষ হয়, বিংশতি দ্রোণে কুম্ভ হয়। ঐ একাদশের অধিক কুম্ভ পরিমিত ধান চুরি করলে (রাজা) গুরুলঘু বিবেচনায় তাড়নাদি ও প্রাণবিয়োগ পর্যন্ত বধদণ্ড করবেন। একাদশের মধ্যে হরণে একাদশ গুণ দণ্ড করবেন এবং বীনের মালিককে ধান দেওয়াবেন ॥ ৩২০

তুল্য পরিমাণের যোগ্য সুবর্ণ ও রজতাদি এবং বহুমূল্য উত্তম বস্ত্রের একশত পলের অধিক হরণ করলে বধদণ্ড হবে। ৩২১

www.pathagar.com

পঞ্চাসের অধিক শত পর্যন্ত ঐ সকল দ্রব্য অপহরণে হস্তচ্ছেদ দণ্ড করবেন। একাদিক্রমে ঐ ঐ বস্তুর পঞ্চাশৎ পল পর্যন্তের অপহরণে তার একাদশ গুণ দণ্ড করবেন। ৩২২ ॥

—মনুসংহিতা ৮ম অঃ ৩২০-৩২২ শ্লোক ৭২১ পৃষ্ঠা দ্রঃ

ইতিহাসের পাঠকমাত্রেরই একথা অবশ্যই জানা রয়েছে যে, অতীতে কোটি কোটি মানব অধ্যুষিত এক বিরাট অঞ্চলের ওপর সুদীর্ঘকাল যাবত এই বিধানানুযায়ীই শাসনকার্য পরিচালিত হয়েছে। ফলে সে সময় বহু ব্যক্তিকেই যে চুরির অপরাধে হস্তচ্ছেদ এমনকি প্রাণদণ্ডেও দণ্ডিত হতে হয়েছে সেকথা বলাই বাহুল্য।

যুগে যুগে দেশে দেশে

অতঃপর পবিত্র কুরআনের আলোচ্য বাণীটির সর্বশেষ অংশটুকু উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ঃ

আমি বলেছিলাম— তোমরা সকলে এখান থেকে নীচে নেমে যাও; অনন্তর আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে পথ নির্দেশ (হুদা) উপস্থিত হবে ঃ যারা আমার সেই পথ নির্দেশের অনুসরণ করবে বস্তুত তাদের কোনও ভয় নেই এবং তারা সন্ত্রস্ত বা ক্ষতিগ্রস্থ হবে না এবং যারা অবিশ্বাস করবে ও আমার নির্দেশাবলীর প্রতি অসত্যারোপ করবে তারাই অগ্নির অধিবাসী— তন্মধ্যে তারা সর্বদা অবস্থান করবে।" — আল কুরআন, বাকারা ৩৮-৩৯

লক্ষ্যণীয় যে, মূলে পবিত্র কুরআনের ভাষায় 'হুদা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব পবিত্র কুরআনের বর্ণনা থেকেই এই শব্দটির তাৎপর্য গ্রহণ করা যথোপযুক্ত মনে করি।

মুসলমানমাত্রেরই জানা রয়েছে যে, পবিত্র কুরআনের পরিচয় দিতে গিয়ে একে 'হুদাল্লিলমুত্তাকীন' অর্থাৎ— 'খোদাভীরুদের পথপ্রদর্শক' বলা হয়েছে। অতএব হুদা শব্দের তাৎপর্য হলো— পথ-প্রদর্শক বা পথ-নির্দেশ।

এখন জানা আবশ্যক যে আদি মানবমানবীকে পৃথিবীতে পাঠানোর সময়ে আল্লাহ্ এই হুদা বা পথ-নির্দেশ পাঠানোর যে ওয়াদা করেছিলেন পরবর্তী সময়ে কখন এবং কিভাবে সেই ওয়াদা তিনি কার্যকরী করেছেন।

এ জানার জন্য অর্থাৎ তিনি যে যুগে যুগে এবং দেশে দেশে অন্য কথায় প্রতিটি জাতির কাছে এই 'হুদা' বা পথনির্দেশ পাঠিয়েছেন পবিত্র কুরআনের সে সম্পর্কীয় কতিপয় বাণীর হুবহু বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ঃ

www.pathagar.com

❑ এই হুদা বা পথনির্দেশ পাঠানো সম্পর্কে বিশ্বের সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী (স) কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে— (হে রাসুল) আমি আপনার পূর্বেও অনেক রসূল (পথপ্রদর্শক বা প্রেরিত পুরুষ) পাঠিয়ে ছিলাম। তাদের কতিপয়ের কথা তো আপনাকে বলেছি এবং অনেকের কথাই আপনাকে বলিনি।[১]

❑ (হে নবী!) আমরা যেভাবেই আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করেছি সেভাবে নূহ্ (আ) এবং তার পরবর্তী নবীদের প্রতি করেছিলাম। আর সেইভাবে আমরা ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইয়াকুব বংশ, ইসা, আইউব, ইউনুস, হারুণ এবং সোলাইমানের প্রতি প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করেছি এবং দাউদকে 'যাবুর' দান করেছি।

আর আমরাই সেই সব নবীদের প্রেরণ করেছি যাদের কথা ইতোপূর্বে আপনাকে বলেছি এবং সেই সব নবীকেও যাঁদের কথা আপনাকে বলিনি।"[২]

❑ (হে রাসুল) আপনার আগের জাতিগুলোর খবর জানতে পাননি, নূহের কওম, আদ ও সামুদ কওম এবং তাদের পরবর্তী এরূপ অসংখ্য কওম যাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া আর কারও জানা নেই; এই সকল কওমের ভেতরে তাদের নিজ নিজ নবী সত্যের আলোকবাহীরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। অথচ তারা মুর্খতা ও অহঙ্কারে ডুবে উক্ত নবীদের শিক্ষাকে উপেক্ষা করেছিল।[৩]

❑ (হে নবী) শুরুতে সব মানুষই এক দলভুক্ত ছিল, তারপর বিরোধ ও মতানৈক্য দেখা দিল। আল্লাহ তখন একের পর এক নবী পাঠাতে লাগলেন। তাঁরা ভাল কাজের নির্দেশ দিতেন এবং (মন্দ কাজের বিরুদ্ধে) সতর্ক করতেন। তারা (এই নবীদের) অনেকের সাথে আল্লাহ আল কিতাব (ওহী সঙ্কলন) অবতীর্ণ করেন। মানুষ যেসব বিষয়ে ঝগড়া করে তা তারই মীমাংসা বিধান"।[৪]

❑ "(হে রসুল!) আপনি সতর্ককারী ছাড়া আর কিছুই নন; প্রত্যেক জাতির জন্য একজন পথ প্রদর্শক থাকে।[৫]

❑ "(হে রসুল) প্রত্যেক জাতির জন্য একজন প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত প্রেরিত পুরুষ (রসুল) থাকে; যখন তিনি আবির্ভূত হন তখন সব সমস্যা ও বিরোধের মীমাংসা করা হয়।"[৬]

যুগে যুগে, দেশে দেশে এই সব নবী-রসুল পাঠানোর কারণ বা মূল লক্ষ্য কি সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের কতিপয় বাণীর হুবহু বঙ্গানুবাদ হলো ঃ

---

১. কুরআন ৪০ ঃ ৭৮
২. কুরআন ৪০; ১৬৩-১৬৪
৩. আল কুরআন ১৪ ঃ ৯;
৪. আল কুরআন ২ ঃ ২১৩;
৫. আল কুরআন ১৩ ঃ ৭;
৬. আল কুরআন ১০ ঃ ৪৭;

www.pathagar.com

❑ "(হে নবী! আমার নীতি এই যে) যতক্ষণ আমি নবী বা রসুল পাঠিয়ে পথ প্রদর্শন না করি ততক্ষণ (পাপানুষ্ঠানের অপরাধে) আমি কাউকেও শাস্তি দিতে রাজি নই।"[১]

❑ "(হে নবী!) আপনার প্রভু পাপাচারের জন্য কোনও বস্তিই ধ্বংস করেন না যতক্ষণ তিনি (তাদের পথপ্রদর্শনের জন্য) নবী রাসুল পাঠিয়ে সেখানে আল্লাহর বাণী প্রচার না করান। (অতএব বিশেষভাবে মনে রাখবেন যে) আমি কখনও কোনও বস্তি ধ্বংস করি না যদি না তার অধিবাসীরা অত্যাচারকে তাদের জাতীয় চরিত্র হিসাবে গ্রহণ না করে।"[২]

❑ "আর সন্দেহ নেই যে আমি পৃথিবীর সকল জাতির কাছেই আমার বার্তা-বহ প্রেরণ করেছি। (যাদের শিক্ষা এই ছিল যে) যেন একই উপাস্যের উপাসনা করে এবং 'তাগুত' অর্থাৎ— অকৃতজ্ঞতা ও পাপাচারের কবল থেকে রক্ষা পায়।[৩]

❑ "(হে রাসুল!) আপনার পূর্বে এমন কোনও বার্তাবহ পাঠাইনি যাকে আপনার অনুরূপ শিক্ষামূলক প্রত্যাদেশ পাঠানো হয়নি আর তা এই— "আমি আল্লাহ ব্যতীত আর কোনও প্রভু নেই; অতএব একমাত্র আমারই আরাধনা কর।"[৪]

❑ "আর (দেখ) তোমাদের এই জাতিগুলো মুলত একই জাতি এবং আমি তোমাদের প্রতিপালক প্রভু। সুতরাং আমারই অর্চনার পথে তোমরা ঐক্যবদ্ধ হও এবং একমাত্র আমাকেই ভয় করে চল এবং সৎকর্মে তৎপর থাক।"[৫]

❑ "পৃথিবীতে এমন কোনও জাতি নেই যার কাছে (অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে) আল্লাহর প্রত্যাদেশ-প্রাপ্ত কোনও সতর্ককারী (হাদী) প্রেরিত হয়নি।[৬]

মহান আল্লাহ যে তাঁর ওয়াদা মতো যুগে যুগে পৃথিবীর সকল জাতির কাছে তাদের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে হুদা বা পথ-প্রদর্শক পাঠিয়েছেন পবিত্র কুরআন থেকে তার সুস্পষ্ট প্রমাণস্বরূপ এই উদ্ধৃতিগুলোই যথেষ্ট হবে বলে আশা করি।

যেহেতু এগুলো কুরআনের বাণী অতএব অন্য ধর্মাবলম্বীরা এর প্রতি বিশ্বাস নাও করতে পারেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তাঁদের অবগতির জন্য এসব বাণীর সমর্থন-সূচক কতিপয় বাস্তব নিদর্শন নিম্নে পৃথক পৃথক ভাবে তুলা ধরা যাচ্ছে ঃ

❑ যুগে যুগে দেশে দেশে যেসব সত্যদ্রষ্টা মহা পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে পবিত্র কুরআনের নির্দেশানুযায়ী বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানকে ঈমানের অপরিহার্য

---

১. আল কুরআন ১৭ ঃ ১৫;   ২. কুরআন ১৭ ঃ ১৫
৩. আল কুরআন ১৬ ঃ ৩৬   ৪. আল কুরআন ২১ ঃ ২৫
৫. আল কুরআন ২৩ ঃ ৫২   ৬. আল কুরআন ৩০ ঃ ২৪

www.pathagar.com

অঙ্গ হিসাবে তাঁদের সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে হয়। অন্যথায় কেউ মুসলমান হতে পারে না; এদের কোনও একজনকে বাদ দেয়া বা অশ্রদ্ধা পোষণের সামান্যতম অধিকারও কোনও মুসলমানের নেই।

❑ অনুরূপভাবে আল্লাহর নিকট থেকে যুগে যুগে যে সব বিধান অবতীর্ণ হয়েছে ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে বিশ্বের প্রতিটি মুসলমান আল্লাহর বিধান হিসাবে সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে চলেছে এবং চলতে থাকবে।

সুদূর অতীতের সেই প্যাগান যুগের মানুষেরা যে চন্দ্র, সূর্য, বায়ু, বরুন, অগ্নি, পাহাড়, গাছ-বৃক্ষ, সাপ, বাঘ, ভূত, প্রেত প্রভৃতিকে উপাস্য জ্ঞানে পূজা করতো এ পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে তার বিবরণ রয়েছে।

প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য এত অধিক উপাস্য থাকা সত্ত্বেও তারা যে কোনও না কোনও নামে একজন সর্বশক্তিমান প্রভুর অস্তিত্বের কথাও জানতো তাদের বংশধরদের যারা আজও টিকে রয়েছে তাদের মাধ্যমে সেকথা আমরা জানতে পারি। কেননা আজও তারা পিতৃ-পুরুষদের ঐতিহ্য হিসাবে অনুরূপ ধারণা পোষণ করে চলেছে। উদাহরণ স্বরূপ তাদের কতিপয়ের পরিচয় এবং তাদের দেয়া সর্বশক্তিমান প্রভুর নাম নিম্নে পৃথক পৃথকভাবে তুলে ধরা হলো ঃ

বিভিন্ন উপজাতীয় সমাজের নাম	সৃষ্টিকর্তা বা প্রধান উপাস্যের নাম
১। কুকি, লুসাই, খুমী	পাথিয়ান
২। মুরং	তুরাই
৩। সেন্দুজ, পাঙ্খো, বনযোগী	পত্যেন
৪। খাসিয়া	উব্লাই নাং খাউ
৫। গারো	তাতারা রাবুগা
৬। সাঁওতাল বাংলাদেশী	ঠাকুর জিয়ো
" ছোট নাগপুরী	সিংবোংগা
৭। ওরাঁও	ধরমেশ বা ধরমীর
৮। চাকমা	চুঙুলাং
৯। মগ, হাজং, টিপরা রাজবংশী	ঈশ্বর বা পরমেশ্বর
১০। গড়, বৈগা	নারায়ণ
১১। গাদারা, করব	ভগবান
১২। কোল, মুণ্ডা, খাড়িয়া	বেরো, গিরিং দোবো
১৩। মালে	ধরমের গোঁসাই
১৪। পারস্যের আদিম অধিবাসী	আহুরা মজদা
১৫। পূর্ব আফ্রিকার বানতু,	লেজা (Leza)
বোটসে, মা-রোটসে	নিয়ামবে (Nyembe)

www.pathagar.com

বিভিন্ন উপজাতীয় সমাজের নাম	সৃষ্টিকর্তা বা প্রধান উপাস্যের নাম
১৬। ফো	মুবু (Mowu)
১৭। মিসরের প্রাচীন অধিবাসী	উসায়রিষ
১৮। মহেঞ্জোদারোর প্রাচীন অধিবাসী	আদন বা দীদাদকুন
১৯। গ্রীস দেশের প্রাচীন অধিবাসী	কেউস (Qutos)
২০। প্রাচীন রোমক সম্প্রদায়	ডেইউস (Deus)
২১। আদ্ মামুদ, আমালেকা, হেক সুস, মওয়াবী, আশুরী, আকাদী, সোমেরী, ঈলামী, আরামী, ইব্রানী ইত্যাদি।	আল-ইলাহ, উলুহু, এলাহিয়া, এলোহীম, ঈল, এলি প্রভৃতি।

এ নিয়ে তালিকা আর দীর্ঘায়িত করার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি না। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন মানব সম্প্রদায়গুলো দেব-দেবী, ভূত-প্রেত, চন্দ্র-সূর্য, পুতুল-প্রতিমা প্রভৃতি যত উপাস্য নিয়েই মত্ত থাকুক না কেন তাদের মনের মণিকোঠায় একজন সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার অনুভূতিও যে বিদ্যমান রয়েছে আশাকরি এ থেকে তা বুঝতে পারা যাবে।

এখন-প্রশ্ন হলো— তাদের মনে কিভাবে এ অনুভূতির সৃষ্টি হলো? এই প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তরই হতে পারে, আর তা হলো— তাদের প্রত্যেকের কাছে আল্লাহর প্রতিশ্রুত হুদা বা পথ-প্রদর্শক এসেছে এবং একত্ববাদের প্রচার করেছেন।

কিন্তু সময়ের দূরত্ব এবং প্যাগানিজমের ধুম্রজাল সেই একত্ববাদের শিক্ষাকে দিনে দিনে আচ্ছন্ন ও আড়ষ্ট করে ফেলেছে।

এ প্রসঙ্গে ইহুদী ও খৃস্টানদের উদাহরণ তুলে ধরা হলে বিষয়টি সহজ-বোধ্য হবে বলে আশা করি।

ইহুদি এবং খৃস্টানরা নিজদের একত্ববাদী বলে দাবি করেন। আল্লাহর বিধান নিয়ে তাদের কাছে নবী-রসুল আবির্ভূত হয়েছেন বলে সুস্পষ্ট প্রমাণও বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু খোঁজখবর নিলে দেখা যাবে যে, প্যাগানিজমের প্রভাব, অন্ধ-বিশ্বাস এবং গোড়ামির কারণে সেই একত্ববাদী শিক্ষা থেকে এত শীঘ্রই তাঁরা বহু দূরে সরে গিয়েছেন।

ভারতীয় হিন্দুদের বেলায়ও সেই একই কথা প্রযোজ্য। তাঁদের মধ্যেও যে আল্লাহর প্রতিশ্রুত হুদা বা পথ-প্রদর্শক এসেছেন সে সম্পর্কে সন্দেহের সামান্যতম অবকাশও থাকতে পারে না।

কিন্তু সেই প্যাগানিজমের আমলে প্রকৃতি ও প্রতীক পূজার নামে তাদের মাঝে বহুদেববাদ, অহংবাদ, সোহংবাদ, সর্বেশ্বরবাদ প্রভৃতির যে সীমাহীন

www.pathagar.com

ধুম্রজাল সৃষ্টি হয়েছিল- তা কাটিয়ে ওঠা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অর্থাৎ— সেই আবর্জনারাজি তাঁদের কাছে প্রচারিত একত্ববাদকে ভীষণভাবে আচ্ছন্ন ও আড়ষ্ট করে ফেলেছে। এ সম্পর্কে একটি মাত্র উদাহরণই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি ঃ

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে
ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম।
স কারণং করণাধিপাধিপো
ন চাহস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥

অর্থাৎ— এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডে সেই পরমেশ্বরের পতি কেউ নেই, তাঁকে আদেশ দিতে সমর্থ হয় এরূপ কেউ নেই, হেতু দর্শনে তাঁর অনুমান করা যেতে পারে এরূপ কোনও বস্তুও ব্রহ্মাণ্ডে দৃষ্ট হয় না। তিনিই সকলের কারণ, সর্ব কারণাধীশ্বরের অধীশ্বর, তাঁর জনকও নেই, অধীশ্বরও নেই, এই প্রকারে সেই পরমাত্মাকে জানতে পারলেই মুক্তিপদ লাভ হয়।

— শ্বেতাশ্বতরোপ নিষৎ ষষ্ঠ অধ্যায় ৯ম শ্লোক

বলাবাহুল্য, এটা একত্ববাদ সম্পর্কীয় এমনই অতি মূল্যবান ও তাৎপর্যপূর্ণ একটি শ্লোক যা পাঠ করার সাথে সাথে মন ভাবে ও বিস্ময়ে আপ্লুত হয়ে ওঠে। অথচ এই উপনিষদেরই চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে—

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্য স্তদ বায়ু স্তদু চন্দ্র মাঃ
তদেব শুক্রং তদ ব্রহ্ম তদা পস্তৎ প্রজাপ্রতিঃ" ॥

অর্থাৎ— তিনিই বহ্নি, তিনিই আদিত্য, তিনিই পবন, তিনিই সোম, তিনিই শুক্র, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই সলিল এবং তিনিই প্রজাপতি। সেই পরমাত্মা ব্যতীত এই ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই নেই। এই অখিল সংসার ব্রহ্মময়।

একটু লক্ষ্য করলেই এটা যে কেউ উপলব্ধি করতে পারবেন যে প্রথম শ্লোকটি নির্ভেজাল একত্ববাদের আর দ্বিতীয়টির মধ্যে রয়েছে প্রকৃতিবাদ, বহুত্ববাদ এবং সর্বেশ্বরবাদ-এর শিক্ষা যা প্যাগানিজমের সময়ে মন-মস্তিষ্কে শেকড় গেড়ে বসেছিল।

এই উপনিষদের অন্য যে শ্লোকটি দ্বারা উল্লিখিত প্রকৃতিবাদকে নস্যাৎ করা হয়েছে সেটি হলো—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং
নেমা-বিদ্যুতো ভার্ন্তি কুতো হয় মগ্নি ঃ
তমেব ভান্তমনু ভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সবর্ব মিদং বিভাতি ॥

www.pathagar.com

অর্থাৎ— আদিত্যদেবও সেই পরমাত্মার নিকটে প্রকাশ পেতে সমর্থ নন তাঁকে আলোকিত করে চন্দ্রেরও এমন সামর্থ নেই, তারকারা তাঁকে প্রকাশিত করতে পারে না সুতরাং বহ্নি তৎসকাশে কিরূপে প্রকাশ পাবে? তিনি স্বয়ং প্রকাশিত, তাঁরই অনুকরণ করে সেই পরমাত্মার দীপ্তি দ্বারাই ব্রহ্মাণ্ড আলোকিত হচ্ছে। — শ্বেতাশ্বতরোপ নিষৎ ষষ্ঠঅধ্যায় চতুর্দশ শ্লোক

উদ্ধৃতির সংখ্যা আর বাড়াতে চাই না। মোট কথা হিন্দু সম্প্রদায় নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, গাছ-বৃক্ষ, চন্দ্র-সূর্য, পশু-পাখি, ভুত-প্রেতাদি নির্বিশেষে তেত্রিশ কোটি দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাসী এবং তাদের পূজায় মশগুল হয়েও তাঁদের মনের মণিকোঠায় ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান, প্রজাপতি, প্রভৃতি বিভিন্ন নামে একজন অযোনি-সম্ভব, স্বয়ম্ভু, সর্বশক্তিমান ও সার্বভৌম সত্তার অনুভূতি বিদ্যমান রয়েছে। আর এই বিদ্যমান থাকার কারণ— তাঁদের মাঝেও আল্লাহর প্রতিশ্রুত হুদা বা পথ-প্রদর্শক এসেছেন।

এখানেই প্রসঙ্গের ইতি টানতে পারলে ভাল হতো। কিন্তু আলোচনার অঙ্গহানি হবে বলে একান্ত বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে যে, বেদ যে মানুষের সৃষ্ট এবং একটি মাত্র বেদ ছাড়া অন্য তিনটি বেদের প্রতিটি মন্ত্রের শুরুতেই যে উক্ত মন্ত্রের রচয়িতার নাম, কোন ছন্দে পাঠ করতে হবে, কোন দেবতার উদ্দেশে রচিত এবং কোন কাজে প্রয়োগ করতে হবে প্রভৃতি লিখিত রয়েছে এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

যে বেদটির কথা সেখানে বলা হয়নি তার নাম— 'অথর্ববেদ'। উক্ত বেদের কোনও মন্ত্রের শুরুতে অন্য তিনটি বেদের মতো তার রচয়িতা দেবতা, ছন্দ প্রভৃতির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে আমার লিখিত "আমি কেন ইসলামগ্রহণ করলাম" নামক পুস্তকখানা পাঠ করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কথা হলো— উক্ত বেদে তার উৎপত্তির সূত্র সম্পর্কে একটি শ্লোক রয়েছে। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উক্ত শ্লোকের যে অর্থ করেছেন তা ১৩৩৩ সালে শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক কোলকাতার 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির' থেকে প্রকাশিত 'কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় শ্বেতাশ্বতরোপ নিষৎ' নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পাঠকবর্গের অবগতি ও ভেবে দেখার জন্য উক্ত পুস্তক থেকে সেই শ্লোকটি এবং তার বঙ্গানুবাদ নিম্নে হুবহু উদ্ধৃত করেই এই প্রসঙ্গের ইতি টানছি ঃ

অল্লা ইল্লল্লা আনাদিস্বরূপায় অথর্বণীং শখাং হ্রীং জানানাম
পশু সিদ্ধান জল চরাণ অদৃষ্টং কুরু কুরু ফট্ ॥

www.pathagar.com

অর্থাৎ— "অথর্বা ঋষি যে বেদ শাখা দর্শন করেছিলেন তার এক দেশ এই উপনিষদকে জগতের বীজভূতা মায়ার জন্মদাত্রী অল্লা মানববৃন্দের নিত্য সিদ্ধস্বরূপ আবির্ভাব করে দিবার বাসনায় উক্ত ঋষিকে দেখিয়ে ছিলেন।"

"সেই আমি অথর্বাঋষি সেই এই উপনিষদ দেখিয়ে প্রার্থনা করছি— হে অল্ল! তুমি মানববৃন্দকে স্থলে, সর্বভূতের সমীপে স্বাধীনতা দাও। জলে ও শূন্যে সর্বত্রই স্বাধীনতা প্রদান কর, স্বাধীনতা প্রদান কর।"

অথর্ব ঋষি বা অন্য কেউ যে এই বেদ শাখাটি রচনা করেননি বরং 'অল্ল' কর্তৃক তা অথর্ব ঋষিকে দেখানো হয়েছিল শুধু এই কথাটি মনে রাখার জন্য সুধী পাঠকবর্গকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

অথর্বা ঋষি কর্তৃক 'অল্ল' শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় অনেকেই বিস্মিত হতে পারেন— সমালোচনাও করতে পারেন। কিন্তু আসলে বিস্মিত ও সমালোচনামুখর হওয়ার কোনও কারণ নেই। কেননা অল্ল, অল্লা, আল্লাহ, এলোহিম প্রভৃতি শব্দগুলো সেই প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিশ্বস্রষ্টার প্রকৃত নাম হিসাবে প্রচলিত রয়েছে।

এই শব্দ বা নামটি যে কত গুরুত্বপূর্ণ উক্ত বেদেরই অন্য একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি থেকে তা জানতে পারা যাবে—

হ্রাং অল্লোহ রসুর মহমদ রকং বরস্য অল্লো অল্লাং
আদলা বুক মেককং অল্লা-বুকং নিকাতকম ॥

অর্থাৎ— সেই অল্ল অর্থাৎ পরমাত্মারূপী ইন্দ্র, ঈশ্বর অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ, অল্লকে গ্রহণ করা ঈশ্বরকে গ্রহণ করা অপেক্ষা কল্যাণকর। কারণ ঈশ্বরও তৎসকাশে পরিমাণে ক্ষুদ্র, পরমাত্মা নিত্যপূর্ণ, এই হেতু তিনি ঈশ্বরেরও জননী, ঋকসমূহে এই কথা বর্ণিত আছে। (উক্ত পুস্তকের ৩০ ও ৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

উল্লেখ্য, শুধু শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ই নন হিন্দু ও খৃস্ট সমাজের অন্যান্য অনেক প্রখ্যাত পণ্ডিতও 'অল্ল' শব্দের এই একই অর্থ করেছেন।

দীন, ধর্ম, রিলিজন

দীন, ধর্ম এবং রিলিজন তিন ভাষার এই তিনটি শব্দ নানা কারণে বহুকাল যাবত একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসার ফলে এগুলোর পরস্পরের মধ্যে শুধু ভাষার দিক দিয়েই নয়— তাৎপর্যের দিক দিয়েও যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে সেকথা আমরা প্রায় সকলে ভুলেই যাইনি আমাদের অধিকাংশের দৃষ্টিতে এই পার্থক্যের প্রশ্নটাই অবান্তর এবং প্রচণ্ডভাবে দোষণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বলাবাহুল্য, প্রতিটি ভাষায়ই এমনকিছু শব্দ থাকে যা একান্তরূপেই সে ভাষার নিজস্ব এবং অন্য কোনও ভাষায় তাদের হুবহু প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া

www.pathagar.com

যায়না। অগত্যা গোঁজামিল দিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে হয়। ফলে গোঁজা মিলের পরিণতি যা হওয়া স্বাভাবিক সেই পরিণতিই ভোগ করতে হয়। উল্লিখিত শব্দ ত্রয়ের বেলায়ও সেই একই কথা প্রযোজ্য।

বিশ্বের আদি মানব-মানবীর পার্থিব জীবন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে 'হুদা' বা পথনির্দেশ পাঠানোর ওয়াদা যে আল্লাহ পূরণ করেছেন ইতোপূর্বের তথ্য-ভিত্তিক আলোচনা থেকে সেকথা আমরা জানতে পেরেছি।

প্যাগানিজমের উদ্ভব এবং সেই প্যাগানিজমই দিনে দিনে কিভাবে ধর্ম বলে পরিগণিত এবং প্রায় সকল মানুষের মন-মানসে শেকড় গেড়ে বসেছে এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেকথা তুলে ধরা হয়েছে।

'ধর্ম' শব্দের ব্যুৎপত্তি-গত তাৎপর্য সম্পর্কে একটি বিখ্যাত অভিধানের উদ্ধৃতি তুলে ধরে উক্ত তাৎপর্য থেকে ধর্মের প্রকৃত পরিচয় লাভ করা সম্ভব কিনা তা নিয়ে সেখানে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং ধর্মের তাৎপর্য সম্পর্কে এখানে আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই।

অতঃপর দীনের তাৎপর্য সম্পর্কে দুকথা বলতে গিয়ে প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যুগে যুগে দেশে দেশে পৃথিবীর প্রতিটি মানবসম্প্রদায়ের কাছে তাদের পরিবেশ ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে যেসব 'হুদা' বা পথনির্দেশ এসেছে দীনের সাথে তার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অতএব হুদা বা পথনির্দেশ আসার কথাটি স্মৃতিপটে জাগরূক রেখে আসুন আমরা দীনের তাৎপর্য অনুধাবনে ব্রতী হই।

স্থানাভাববশত বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে অতি সংক্ষেপে বলা যাচ্ছে যে, আরবি ভাষায় দীন শব্দটির এক অর্থ— প্রভুত্ব, প্রাধান্য, শক্তিমত্তা, আধিপত্য প্রভৃতি। দ্বিতীয় অর্থ— আনুগত্য এবং দাসত্ব। তৃতীয় অর্থ— প্রতিফল, কর্মফল, শেষবিচারের দিবস প্রভৃতি। চতুর্থ— পথ, পদ্ধতি, আইন, জীবন-বিধান।

পবিত্র কুরআনের যেখানেই দীনের প্রসঙ্গ এসেছে সেখানেই এই শব্দটির সাথে আলিফ এবং লাম যুক্ত করে বলা হয়েছে— 'আদ-দীন'। বলাবাহুল্য, এর অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ রয়েছে।

ইংরেজিতে The man বলতে যেমন সুনির্দিষ্টরূপে একটি মানুষকে বোঝায় আদ-দীন দ্বারাও ঠিক তেমনই একটি বিশেষ দীন বা একটি মাত্র দীনকে বোঝানো হয়েছে।

এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, পবিত্র কুরআন আদ-দীন বলতে কোন বিশেষ দীনটিকে বোঝাতে চায়?

www.pathagar.com

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে ছোট একটি পটভূমিকার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। উক্ত পটভূমিকাটি হলো ঃ

আমরা জানি, মানুষ একটি প্রগতিশীল জীব। অতএব এগিয়ে চলাই তার কাজ। একদিন গুহাজীবন থেকে যাত্রা শুরু করে আজ অনন্ত আকাশে পাড়ি জমানো সেই প্রগতিশীলতারই সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বহন করেছে।

বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিরা অবশ্যই এই প্রগতির সাথে বাস্তব এবং প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত রয়েছেন। আজ থেকে পঞ্চাশ, ষাট বছর পূর্বের অবস্থার সাথে পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার তুলনা করে তাঁদের অনেককেই নির্বাক বিস্ময়ে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকতে দেখা যায়।

সেই হিসাবে হাজার হাজার বছর পূর্বের অবস্থা কিরূপ ছিল তা অনুমান করা খুব কঠিন হয় না। তা ছাড়া পৃথিবীর সকল দেশ একই সময়ে এবং একই তালে উন্নত-অগ্রসর হয়ে উঠেছিল না। সকল দেশের পরিবেশ, প্রয়োজন এবং গ্রহণযোগ্যতাও একই রূপ ছিল না।

অতএব যুগে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন মানবসম্প্রদায়ের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব হুদা বা পথনির্দেশ এসেছে তা যে সংশ্লিষ্ট মানব-সম্প্রদায়ের পরিবেশ, প্রয়োজন এবং গ্রহণযোগ্যতার সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল অন্যথায় তা গ্রহণ করা এবং মেনে চলা যে তাদের পক্ষে সম্ভবই হতো না সেকথা সহজেই অনুমেয়।

যেখানে যখন যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে সেখানে তখন সেরূপ হুদা বা পথনির্দেশ পাঠানো হয়েছে বলে অতীতের এই হুদা বা পথনির্দেশসমূহের কোনওটিই যে পূর্ণাঙ্গ অর্থাৎ সকল সমস্যার সমাধানোপযোগী সর্বজনীন এবং সর্বকালীন ছিল না সেকথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না।

অবশ্য বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগাযোগের অভাব, এবং গ্রহণযোগ্যতার তারতম্য প্রভৃতি নানা কারণে পূর্ণাঙ্গ, সর্বজনীন ও সর্বকালীন হুদা বা পথ-নির্দেশ পাঠানোর প্রয়োজন এবং পরিবেশও তখন গড়ে উঠেছিল না।

অন্যদিকে লেখ্য ভাষার অভাবে সংরক্ষণের সুযোগ না থাকা, কালের দীর্ঘতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মানুষের ভুলপ্রবণতা ও ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ, ভাবাবেগ, শত্রুপক্ষ বা বিরোধী শক্তির নাশকতা প্রভৃতি নানা কারণে অতীতের হুদা বা পথ-নির্দেশসমূহের অধিকাংশই ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়; অন্যগুলো বিকৃত, অতিরঞ্জিত কিংবা যুগের অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

এই অবস্থায় বোধগম্য কারণেই নতুন করে হুদা বা পথ-নির্দেশের প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে এ সময়ে অনুকূল পরিবেশও গড়ে ওঠে। এই

www.pathagar.com

প্রয়োজন এবং পরিবেশের প্রেক্ষিতে সকল যুগের, সকল দেশের এবং সকল মানুষের জন্য আদ-দীন বা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানরূপে যে হুদা বা পথ-নির্দেশ অবতীর্ণ হয় তারই নাম— আল কুরআন।

এখানে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, যেহেতু সত্য মাত্রই সনাতন, চিরন্তন এবং সর্বজনীন আর যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে সমাগত এসব হুদা বা পথ-নির্দেশসমূহও সত্য ব্যতীত কিছু নয় এমতাবস্থায় ওগুলোর যুগের অনুপযোগী হয়ে পড়া কি করে সম্ভব হতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের ইসলামের সাথে পরিচিত হতে হবে।

ইসলাম শব্দের অর্থ— 'শান্তি' এবং স্রষ্টার উদ্দেশে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পন"। এ কথার তাৎপর্য হলো— শান্তিই মানবজীবনের চরম এবং পরম কাম্য। সেই কারণেই মানুষ ছোট বড় যা কিছু করে তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য থাকে শান্তি লাভ করা। অন্তত নিজের জীবনে সামান্যতম অশান্তিও সৃষ্টি হোক কোনও মানুষই তা চায় না, অথচ শান্তি লাভের প্রকৃষ্ট পথ কোনটি কোনও মানুষেরই তা জানা নেই।

সেই কারণেই দেখতে পাই যে, একজন শান্তির আশায় ঘর বাঁধে আবার অন্যজন শান্তির আশায় ঘর ছাড়ে। একজন শান্তির আশায় অপরের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে, আবার অন্যজন সেই শান্তির আশায় পরের কল্যাণে নিজের সবকিছু বিলিয়ে দেয়। একজন শান্তির জন্য অপরকে হত্যা করে, আবার অন্যজন শান্তির আশায় পরের জীবনরক্ষার জন্য নিজের জীবনকে বিসর্জন করে। একজন শান্তির আশায় মদ্যপান করে; অন্যজন সেই শান্তিরই আশায় মদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে। অতএব মানুষ যে প্রকৃত শান্তির পথ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ সেকথা অনায়াসে বুঝতে পারা যাচ্ছে।

সর্বশেষ পর্যালোচনা থেকে এটা জানা গিয়েছে যে, স্রষ্টার উদ্দেশে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং তাঁরই প্রদত্ত হুদা বা জীবনবিধানের বাস্তবায়ন ছাড়া প্রকৃত শান্তি লাভ সম্ভব হতে পারে না।

বলাবাহুল্য, যুগে যুগে এই আত্মসমর্পণের শিক্ষা এবং শান্তির প্রকৃষ্ট পথপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই আল্লাহর পক্ষ থেকে হুদা বা জীবনবিধান পাঠানো হয়েছে। যেহেতু এই হুদা বা জীবনবিধান ছাড়া শান্তি লাভের বিকল্প আর কোনও পথই নেই সেই কারণে তার নাম রাখা হয়েছে ইসলাম বা শান্তি। অন্য কথায়— শান্তির পথ।

www.pathagar.com

লক্ষ্যণীয় যে, ইসলামে শিক্ষার দুটি দিক রয়েছে। একটিকে বলা হয়— 'দীন'; অন্যটিকে বলা হয় 'শরা'। দীন হলো ধর্মের মূল; আর শরা হলো তার শাখা-প্রশাখা বা পথ ও পদ্ধতি।

দীন চিরকালই এক, অভিন্ন এবং অপরিবর্তিত রয়েছে। দীনের মূল কথা হলো— লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'। অর্থাৎ— আল্লাহ ব্যতীত আর কোনও 'ইলাহ' বা উপাস্য নেই। অন্য কথায়— আল্লাহ্ ব্যতীত উপাসনা, আরাধনা এবং আনুগত্য লাভের শক্তি এবং যোগ্যতা আর কারো নেই— থাকতে পারে না।

বিশ্বের সকল প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষই— তাঁদের নিজ নিজ কওম বা সম্প্রদায়ের কাছে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই মহাসত্যই প্রচার করে গিয়েছেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে— শরা অর্থ— দীন বাস্তবায়নের পথ ও পদ্ধতি। যুগে যুগে মানুষের জীবন-জীবিকা, শিক্ষা-দীক্ষা, চিন্তা ও কর্ম এবং মন ও মানসিকতার পরিবর্তন সাধিত হয়েছে; এক যুগের শরা বা পথপদ্ধতিও সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অন্য যুগে অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। ফলে সংস্কার সংশোধন করে তাকে যুগের উপযোগী করে নেয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

পূর্বে একথা বলা হয়েছে যে, অতীতের হুদা বা পথনির্দেশসমূহের সবগুলোই স্থানীয় পরিবেশ ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছিল বলে সেগুলোর কোনওটাই পূর্ণাঙ্গ, সর্বজনীন ও সর্বকালীন ছিলনা। তাছাড়া ওগুলো নানা কারণে বিলুপ্ত অথবা বিকৃত হয়ে পড়েছিল। এই অভাব পূরণ ছাড়াও পূর্ববর্তী শরা বা পথ-পদ্ধতিকেও যুগের উপযোগী ও স্থায়ীত্বশীল করে নেয়ার প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছিল।

সেই কারণেই একটি পূর্ণাঙ্গ, সর্বজনীন ও সর্বকালীন জীবনবিধান (দীন ও শরা) রূপে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহর ঘোষণাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। উক্ত ঘোষণায় বলা হয়েছে ঃ

"..... আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন (আদ-দীন)কে পূর্ণাঙ্গতা দান করলাম এবং তোমাদের ওপর আমার (এ সম্পর্কীয়) দান (নিয়ামত)কেও সম্পূর্ণ করলাম, আর দীন ইসলামকেই (তোমাদের জীবনবিধান রূপে) মনোনীত করলাম।" — আল কুরআন ; মাএদা।

বলাবাহুল্য, পৃথিবীতে এটাই যে পূর্ণাঙ্গ, সর্বজনীন ও সর্বকালীন একমাত্র দীন বা জীবনবিধান সেকথা বোঝানোর জন্যই পবিত্র কুরআনে একে দীনের পরিবর্তে 'আদ-দীন বলা হয়েছে। স্থানাভাববশত রিলিজন শব্দের তাৎপর্য এখানে তুলে ধরা সম্ভব হলো না।

www.pathagar.com

সারকথা

প্রখ্যাত মাওলানা মরহুম আবুল কালাম আজাদ-এর উম্মুল কুরআন থেকে এই শিরোনামটি গ্রহণ করা হলো। পবিত্র কুরআন বা পূর্ববর্ণিত এই পূর্ণাঙ্গ, সর্বজনীন ও সর্বকালীন জীবনবিধানটির প্রয়োজনীয়তা এবং মাধুর্য সম্পর্কে তাঁর এই নিবন্ধটির মাধ্যমে তিনি অতি মূল্যবান কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেছেন যা এখানে তুলে ধরার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। তিনি লিখেছেন ঃ

১। "কুরআন অবতীর্ণ হইবার সময়ে গোত্রীয়, বংশীয় ও পারিবারিক সীমাবদ্ধ জীবনপদ্ধতির মতই ধর্মও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক শুধু নিজেদেরই সত্য ভাবিত। মুক্তি ও সৌভাগ্য তাহাদের এক চেটিয়া সম্পদ ভাবিত। নিজ সম্প্রদায়ের বাহিরে কাহাকেও মুক্তি লাভের অধিকারী বলিয়া ভাবিত না।

২। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে শুধু বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানই ধর্মীয় সত্য বলিয়া বিবেচিত হইত। যেমন বিশেষ পদ্ধতির উপাসনা ও উৎসর্গ, বিশেষ ধরনের আহার গ্রহণ ও বিশেষ কয়েকটি অনুষ্ঠান পালনকেই তাহারা মুক্তি ও সৌভাগ্যের জন্য যথেষ্ট ভাবিত।

৩। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সামাজিক ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা এক নহে বলিয়া তাহাদের আচার অনুষ্ঠানও বিভিন্নরূপ হইত। তাই এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে ভ্রান্ত বলিত। কারণ তাহাদের আচার অনুষ্ঠান অন্যরূপ।

৪। প্রত্যেক সম্প্রদায় শুধু নিজেদের সত্য বলিয়াই দাবি করিত না; পরন্তু অন্য সব সম্প্রদায়গুলিকে ভ্রান্ত ঘোষণা করিত। তাই এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়াইত। এই অবস্থাটি মানবজাতির ভিতরে স্থায়ী কোন্দর জিয়াইয়া রাখিল। খোদার নাম নিয়াই প্রত্যেক সম্প্রদায় অন্য সব সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াইত ও তাহাদের হত্যা করা বৈধ মনে করিত। অথচ কুরআন গোটা মানবজাতির সামনে এক সর্বজনীন সত্য ধর্মের নীতি ঘোষণা করিল। যেমন ঃ

ক) সে শুধু সব ধর্মের সত্যতাই স্বীকার করিল না; বরং সাফ সাফ বলিয়া দিল, খোদার ধর্ম খোদার অন্যান্য দানের মতই সর্বজনীন ও সকল দলের

www.pathagar.com

ভাগ্যেই উহার অংশ পড়িয়াছে। কোনও বিশেষ দলকে একচেটিয়া করিয়া দেওয়া হয় নাই।

খ) সে বলে, খোদার প্রকৃতির অমোঘ বিধানগুলির মত আত্মিক জগতেও খোদার অমোঘ বিধান রহিয়াছে। আর তাহাও একক ও সর্বজনীন বিধান। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বড় ভ্রান্তি হইল খোদার সেই একক সত্য ধর্মকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া মানুষের ভিতরে বিভেদ ও কোন্দল সৃষ্টি করিয়াছে।

গ) সে বলে, খোদার ধর্ম তো মানুষের সব বিভেদ মিটাইয়া তাহাদিগকে একই খোদার অর্চনায় ঐক্যবদ্ধ করা। তিনি তো মানুষে মানুষে অনৈক্য ও কোন্দল সৃষ্টির জন্য ধর্ম পাঠান নাই। সুতরাং ইহার চাইতে বিভ্রান্তি আর কি হইতে পারে যে, যাহা পাঠানো হইয়াছে বিভেদ দূর করার জন্য তাহা আসিয়া বিরোধ আরও বাড়াইয়া তুলিতেছে?

ঘ) সে বলে, দীন এক জিনিস আর শরিয়ত আরেক জিনিস। একটি মত আরেকটি পথ। মত এক পথ বহু। দীন তাই সকলেরই এক। অবশ্য শরিয়ত ভিন্ন ভিন্ন। আর এই বিভিন্নতা অপরিহার্য ছিল। কারণ সব যুগের সব মানুষ এক ছিল না। সুতরাং যখন যেরূপ অবস্থা যেখানে দেখা দিয়েছে, সেই অনুসারে শরিয়ত রচিত হইয়াছে। তাই শরিয়তের বিচ্ছিন্নতা দীনের পার্থক্য প্রমাণ করে না। তোমরা দীন ভুলিয়া বিভিন্ন শরিয়ত লইয়া মারামারি করিতেছ।

ঙ) সে বলে তোমাদের ধর্মীয় দলাদলি এবং তাহার ভিত্তিতে রচিত ভিন্ন ভিন্ন আচার অনুষ্ঠান কখনও মুক্তি ও কল্যাণের কাজে আসিতে পারে না। এই সাম্প্রদায়িক গণ্ডি তো তোমাদের হাতে গড়া। আদৌ খোদার নির্ধারিত নহে। খোদার দীন তো এক। সেই সত্য হইল, এক খোদায় বিশ্বাস ও তাহার নির্ধারিত ভাল কাজ করা।

চ) সে পরিষ্কার ঘোষণা করে, তাহার প্রচারের উদ্দেশ্য হইল সকল ধর্মের সত্যতা স্বীকার। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া দেওয়া যে, সকল ধর্মানুসারীই সত্য ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। যদি তাহারা হৃত সত্য পুনরুদ্ধার করিতে পারে তবেই তাহার উদ্দেশ্য সার্থক। তাহা হইলেই তাহাকে মানা হইল। সে সর্বসম্মত একমাত্র সত্য ধর্মের নাম দিয়েছে— 'আদ-দীন' ও 'আল ইসলাম'।

ছ) সে বলে, খোদার ধর্ম মানুষে মানুষে বিদ্বেষ সৃষ্টির স্থলে ভালবাসা সৃষ্টির জন্য আসিয়াছে। সবাই একক প্রভুর দাসত্বের নিগড়ে ঐক্যবদ্ধ হইবে। যখন সকলের প্রতিপালক একক, সবারই উদ্দেশ্য তাঁহার অর্চনা, প্রত্যেক মানুষই যখন নিজ কর্মের জন্য নিজেই দায়ী, তখন আর ধর্ম ও খোদার নামে এত কোন্দল কেন?

www.pathagar.com

৫। ধর্ম জগতের মত-বিরোধ শুধু মত-বিরোধ রহিলনা; পারস্পরিক বিদ্বেষ ও ঝগড়ায় পরিণত হইল। এখন প্রশ্ন হইল— এই ঝগড়া দূর করিবার উপায় কি? সব ধর্মের সব দাবি মানিয়া লওয়া তো আর চলেনা। কারণ প্রত্যেক ধর্ম শুধু নিজের সত্যতা দাবি করিয়াই ক্ষান্ত হয় না অপর গুলি যে ভ্রান্ত সেই দাবিও করিতে ছাড়েনা। সুতরাং তাহাদের দাবি মানার অর্থ হইল, একই সঙ্গে সব ধর্মের সত্যতাও মানিতে হয় আবার অসত্যতাও ঘোষণা করিতে হয়।

সুতরাং এই ঝগড়া মিটাইবার একমাত্র পথ হইল— কুরআনের দাবি মানিয়া লওয়া। তাহা এই— আসল দীন হিসাবে সব ধর্মই সত্য, তবে ধর্মানুসারীরা সেই সত্য দীন ছাড়িয়া নিজেদের খেয়াল খুশীমত ধর্মীয় কোটারী সৃষ্টি করিয়াছে। এখন যদি তাহারা সকলেই মূল সত্যে প্রত্যাবর্তন করে, তাহা হইলেই সব ধর্মীয় কোন্দলের পরিসমাপ্তি ঘটে। সবাই দেখিতে পাইবে আসল ধর্ম তো সকলেরই এক। সকল ধর্মে সর্ব-সম্মত সেই মতবাদ হইল— 'আদ-দীন', উহাই 'আল ইসলাম'— বিশ্ব মানবতার শাশ্বত ধর্ম।

৬। মানব জাতির পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতির যত সম্পর্ক ছিল, সবই তাহাদের হাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। একই আদমের গোষ্ঠী পরে অনেক শ্রেণীতে পরিণত হইল। একই মানবজাতি বহু জাতিতে পরিণত হইল। একই দেশের মানুষ বিভিন্ন দেশের বাসিন্দা হইল। সমান মর্যাদার মানুষ বিভিন্ন মর্যাদায় বিভক্ত হইল।

এরূপ অবস্থায় এমন কোনও সম্পর্ক আছে, যাহা সব বিভেদের উপরে জয়ী হইতে পারে কিম্বা দুনিয়ার সকল মানুষকে একই কাতারে দাঁড় করাইতে পারে?

কুরআন বলে— তাহা হইল খোদার অর্চনার সম্পর্ক। এই একটি মাত্র সম্পর্ক দুনিয়ার সকল বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ও শত্রুভাবাপন্ন মানুষকে আবার একই পরিবারভুক্ত করিতে পারে। আমাদের সকলের প্রতিপালক এক এবং সবাইকে একইভাবে তাঁহার পদমূলে মাথা ঠুকিতে হয়— এই বিশ্বাস একমুখী ও ঐক্যবদ্ধ হইবার এরূপ দুর্জয় প্রেরণা জোগায় যাহা মানুষের হাতে গড়া বিভেদের প্রাচীর চুরমার করিয়া ফেলিতে পারে।"

লক্ষ্যণীয় যে, এই উদ্ধৃতির প্রতিটি বাক্য এমনকি প্রতিটি শব্দের মধ্যে মরহুম মওলানার প্রাণের আকুতি দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মানুষ দীন ইসলামের শিক্ষায় অজ্ঞতা, অন্ধ-বিশ্বাস এবং হিংসা-বিদ্বেষের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়ে এক 'বিশ্ব পরিবার' গড়ে তুলবে এই সাধ বুকে নিয়ে তিনি জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

www.pathagar.com

তাঁর এই প্রাণের আকুতি মৃতকল্প জাতিকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষাগ্রহণ এবং তার আলোকে এক সুখী ও সমৃদ্ধিশালী 'বিশ্বপরিবার' গঠনে উদ্বুদ্ধ অনুপ্রাণিত করুক মহান আল্লাহর দরবারে সকাতরে এই প্রার্থনাই করি।

বলাবাহুল্য, 'বিশ্বপরিবার' গঠনের এই শিক্ষা পবিত্র ইসলামেরই শিক্ষা। এ সম্পর্কে বিশ্ব নবী (স)-এর একটি অমর বাণী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করি। সেই অমর বাণীটি হলো ঃ

"এই বিশ্ব আল্লাহর পরিবার; আর আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তি তত বেশি প্রিয় যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবারকে যত বেশি ভালোবাসে।"

— আল হাদিস (বায় হাকি, মেশকাত)।

এ থেকে বুঝতে পারা সহজ যে গোটা বিশ্বকে আপন ও একাত্ম করে নেয়াই ইসলামের মহান শিক্ষা।

'ইসলাম' শব্দের তাৎপর্য এবং ইসলাম যে সারা বিশ্বের জন্য আল্লাহর মনোনীত দীন (আদ-দীন) তার বহু প্রমাণই ইতোপূর্বে তুলে ধরা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (স) যে বিশ্বনবী সে সম্পর্কেও কতিপয় প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে। তথাপি কারো মনে যদি এ সম্পর্কে সামান্যতম দ্বিধা-দ্বন্দ্বও থেকে থাকে তা নিরসনের জন্য অতঃপর এ সম্পর্কীয় কতিপয় প্রমাণ নিম্নে পৃথক পৃথকভাবে তুলে ধরা হলো ঃ

❑ পৃথিবীর অন্যকোনও ধর্মই নিজেকে 'বিশ্বধর্ম' বলে দাবি করেনি বরং নিজেদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গণ্ডি সৃষ্টি করে তার মাঝে অপরের প্রবেশকে অতি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের পাইকারীভাবে পাপী সাব্যস্ত করে তাদের সংশ্রব বর্জন করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে অপরিসীম ঘৃণা-বিদ্বেষের ইন্ধন যুগিয়েছে।

❑ অনুরূপভাবে সেসব ধর্মের ধারক এবং বাহকরাও কুত্রাপি নিজেকে বিশ্বধর্মের ধারকবাহক এবং বিশ্ববাসীর পথপ্রদর্শক বলে দাবি করেননি, বরং নিজেদের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সংশ্রব থেকে কঠোরভাবে দূরে রেখেছেন, অন্যান্য ধর্ম এবং তাদের সম্মানিত মহাপুরুষ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন।

❑ পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের কোনও একখানাও নিজের মৌলিকতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে বলে দাবি করতে পারে না; ওগুলোর প্রত্যেকখানাই যে নানা কারণে ক্ষতিগ্রস্থ, বিকৃত অথবা অতিরঞ্জিত হয়েছে তার অকাট্য এবং নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আমাদের হাতে বিদ্যমান রয়েছে।

❑ ঐসব ধর্মগ্রন্থের উৎপত্তি, সংকলন, সংরক্ষণ প্রভৃতি সম্পর্কেও নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য কোনও তথ্য প্রমাণ বিদ্যমান নেই।

www.pathagar.com

❑ অন্যান্য ধর্মের মহাপুরুষদের বেলায়ও সেই একই কথা প্রযোজ্য। তাঁদের জন্ম, জীবনযাত্রা ও অন্যান্য কার্যকলাপের কোনও নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রমাণ যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়নি। বরং তাঁদের জীবন চরিত সম্পর্কে যেসব পুস্তক-পুস্তিকা এবং ধর্মগ্রন্থে তাদের সম্পর্কীয় যেসব বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে তা এমনই অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য, অলৌকিক, অতিমানবিক এবং প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত কেচ্ছা-কাহিনীতে ভরপুর করে তোলা হয়েছে যে তা থেকে তাঁদের সত্যিকারের জীবনী উদ্ধার করে আনা আজ আর কোনওক্রমেই সম্ভব নয়।

❑ পক্ষান্তরে ইসলাম তার সূচনা থেকেই নিজেকে বিশ্বধর্ম বলে দাবি করে আসছে এবং ভাষা, বর্ণ, গোত্র, জাতীয়তা প্রভৃতি নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য নিজের দুয়ার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে রেখেছে। শুধু তাই নয়— বিশ্বের সকল মানুষকে এই মহান বিশ্বভ্রাতৃত্বে শরিক হওয়ার উদাত্ত ও প্রাণস্পর্শী আহবান জানিয়ে চলছে।

❑ পবিত্র কুরআন থেকে এ সম্পর্কীয় দু'তিনটি মাত্র উদাহরণ নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে ঃ

ক) হে বিশ্ববাসী! (একমাত্র) তোমাদের প্রতিপালক প্রভুরই উপাসনা কর যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের সৃষ্টি করেছেন, (২ ঃ ২১)

খ) হে বিশ্ববাসী! পৃথিবীতে যেসব বৈধ ও পবিত্র (উপযোগী) দ্রব্য রয়েছে তা থেকে আহার্য গ্রহণ কর। (এ ব্যাপারে) তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিওনা। (২ ঃ ১৬৮)

গ) মহা মর্যাদা সম্পন্ন আল্লাহ যিনি তাঁর বান্দাদের ওপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন; যেন তা সমগ্র বিশ্ববাসীকে সতর্ক করতে পারে (২৫ ঃ ১ঃ)।

ঘ) (হে নবী! আপনি) বলুন ঃ (কুরআন প্রচারের জন্য) আমি তোমাদের কাছে কোনও প্রতিদান চাই না। কেননা এটা (এই গ্রন্থ) সমগ্র বিশ্বের জন্য (আল্লাহ প্রদত্ত) উপদেশ। (৬ঃ৯)

❑ ইসলামের সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর নবীজীবনের শুরু থেকেই নিজেকে 'বিশ্বনবী' বলে দাবি করে এসেছেন, সকল ক্ষেত্রের এবং সকল মানুষদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন, তাঁকে বিশ্বনবী এবং ইসলামকে বিশ্বধর্ম বলে গ্রহণ করার জন্য উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। অবশ্য নিজে থেকে একাজ তিনি করেননি পবিত্র কুরআনের এ সম্পর্কীয় ঘোষণার মাত্র তিনটিকে নিম্নে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে—

www.pathagar.com

ক) হে নবী! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সত্যসহ গোটা বিশ্ববাসীর কাছে সতর্ককারী এবং সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেছি। (২ ঃ ১১৯)

খ) (হে নবী!) বলুন, তোমরা এবং আমার মধ্যে আল্লাহই সাক্ষ্যরূপে বিরাজমান। এবং এই কুরআন আমার প্রতি প্রত্যাদেশরূপে অবতীর্ণ করা হয়েছে যাতে তোমাদের এবং যাদের কাছে এটা পৌছেনি তাদের সতর্ক করতে পারি। (৬ঃ ১৯)

গ) (হে নবী!) আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির কাছে আমার অনুগ্রহ স্বরূপ প্রেরণ করেছি। (অতএব) আপনি বলুন— আল্লাহই গোটা বিশ্বের একমাত্র প্রভু এবং উপাস্য এটা প্রচার করার জন্যই (এই কুরআন) আমার কাছে অবতীর্ণ হয়। (২১ ঃ ১০৭-১০৮)

❑ বর্তমান বিশ্বে পবিত্র কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যার অবতারণ, সংরক্ষণ এবং লিপিবদ্ধকরণ প্রভৃতির অকাট্য এবং ঐতিহাসিক প্রমাণ বিদ্যমান। অদ্যাপি তা যে সম্পূর্ণরূপে অক্ষত ও অবিকৃত রয়েছে এবং থাকবে তার বহু জাজ্জল্যমান প্রমাণেরও অভাব নেই।

❑ পবিত্র কুরআন যে নির্ভুল, নিঃসন্দিগ্ধ এবং আল্লাহর বিধান শুধু সেকথা বলেই কুরআন ক্ষান্ত হয়নি। একাকী বা সমবেত প্রচেষ্টায় এর সুরার মতো একটা সুরা বা তার অংশবিশেষ রচনা করে আনার জন্য পুনঃ পুনঃ পণ্ডিত ব্যক্তিদের চ্যালেঞ্জ দিয়েছে। অথচ আজ পর্যন্ত বহু চেষ্টা করেও কেউ সে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়নি।

❑ অনুরূপভাবে গোটা বিশ্বে হযরত মুহাম্মদ (স)ই একমাত্র মহাপুরুষ যাঁর জন্ম থেকে শুরু করে গোটা জীবনের ছোট বড় প্রতিটি কাজ এবং প্রতিটি কথাকে অতীব বিশ্বস্ততার সাথে এবং নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। এমনকি বিবিদের সাথে তিনি যেসব ব্যবহার করেছেন এবং কথাবার্তা বলেছেন তাঁর জীবনী থেকে তাও বাদ দেয়া হয়নি। কেননা, তিনি ছিলেন বিশ্ববাসীর আদর্শ; অতএব তাঁর জীবনের প্রতিটি কাজ এবং কথা মানুষ যাতে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে পারে তাঁর জীবনী লিপিবদ্ধকরণ এবং সংরক্ষণের এটাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য।

এসম্পর্কে স্বয়ং তিনি যেসব কথা ঘোষণা করে গিয়েছেন হাদিসের পাতায় তা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তা থেকে দুটি মাত্রকে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

"তোমরা যদি আমার জীবনের একটি কথাও জান তবে তা অপরের কাছে পৌছে দেবে, অন্যথায় তোমাদের শেষবিচারের দিনে 'বোবা শয়তান' রূপে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে।" — আল হাদিস

www.pathagar.com

অন্যত্র তিনি বলেছেন ঃ "আমি রাতের অন্ধকারে যেসব কাজ করি তোমরা দিনের আলোকে সে সবকে মানুষের কাছে তুলে ধরবে।" — আল হাদিস

প্যাগানিজম থেকে শুরু করে কিভাবে ধর্মের 'উদ্ভব' ঘটেছে এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন তথ্য প্রমাণাদি সহকারে সে কথা তুলে ধরা হয়েছে।

আর যুগে যুগে বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কিভাবে হুদা বা পথনির্দেশ 'অবতীর্ণ' হয়েছে পরবর্তী অধ্যায়সমূহে পবিত্র কুরআনের বাণী ও অন্যান্য তথ্য প্রমাণাদি দিয়ে সেকথা বোঝানোর চেষ্টাও করা হয়েছে।

ইসলাম যে বিশ্বধর্ম এবং হযরত মুহাম্মদ (স) যে বিশ্বনবী তার কতিপয় প্রমাণও এখানে তুলে ধরা হলো। আল্লাহর পক্ষ থেকে 'অবতীর্ণ' হুদা বা পথনির্দেশের সমষ্টিকেই যে দীন (আদ-দীন) বলা হয় আশা করি এই আলোচনা থেকে সুধী পাঠকবর্গ সেকথা বুঝতে পেরেছেন। তথাপি কারো যদি বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে তাদের পরিষ্কারভাবে বলা যাচ্ছে যে, ভয়-ভীতি ও মানবীয় চিন্তাধারা থেকে ধর্মের 'উদ্ভব' ঘটেছে। পক্ষান্তরে দীন (আদ-দীন) 'অবতীর্ণ' হয়েছে মানুষকে সত্য ও কল্যাণের পথ প্রদর্শনের জন্য স্বয়ং বিশ্বপতি আল্লাহর নিকট থেকে। ধর্ম ও দীনের এই পার্থক্য হতে সুস্পষ্টরূপেই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে ইসলাম ধর্ম নয়— দীন (আদ-দীন)। অথচ নানা কারণে ইসলামকে (অন্তত এই উপমহাদেশে) ধর্মের পর্যায়ভুক্ত এবং ধর্ম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

লক্ষ্যণীয় 'ইসলাম ধর্ম' এই শব্দটিকেই ভুল-প্রমাণের ওপর গড়ে তোলা হয়েছে। কেননা, ইসলাম একটি বিশুদ্ধ আরবি শব্দ আর ধর্ম শব্দটির ভাষা হলো সংস্কৃত। আরবি এবং সংস্কৃত মিলে কোনও শব্দ গঠন বা নামকরণকে ভুল-প্রমাণ ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে?

www.pathagar.com

উপসংহার

পশুদের মধ্যে হস্তী একটি বিশেষ স্থান দখল করে রয়েছে। তার বিরাট দেহ, শক্তিমত্তা, শুড়, দন্ত, প্রভৃতির কার্যকারিতা সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করার পরে যখন দেখা যায় যে হস্তীর তুলনায় অতিক্ষুদ্র এবং নগণ্য কোনও এক ব্যক্তির ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র একান্ত বাধ্য ও ভয়াতুর ভৃত্যের মতো সে পরিচালিত হয় তখন বিস্ময়ের কোনও সীমা-পরিসীমা থাকেনা।

তখন অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে ঃ এত বিশাল শক্তি-সুযোগের অধিকারী হয়েও কেন সে তার তুলনায় অতিক্ষুদ্র ও নগণ্য ব্যক্তির ইঙ্গিতে পরিচালিত হচ্ছে?

খুব সম্ভব এই প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তরই হতে পারে। আর তা হলো—হস্তী তার নিজের পরিচয় জানে না বলেই তার এই দুর্দশা।

অবশ্য হস্তীর আত্মপরিচয় না জানার সঙ্গত কারণও রয়েছে। সেই কারণ হলো ঃ

শরীরের তুলনায় তার চোখ দু'টি খুবই ছোট; ঘাড়টি ভীষণভাবে খাটো হওয়ার কারণে ঘাড় ফিরিয়ে গোটা দেহটাকে দেখবে তেমন সুযোগও তার নেই শুধু কি তাই? ঐ ছোট ছোট চোখ দিয়ে পেছনের দিকে দেখতে গেলেই চোখের পাশের বিরাট আকারের কান দুটো ছুটে এসে দেহটা আড়াল করে দাঁড়ায়। ফলে দেহটাকে দেখা তথা আত্মপরিচয় লাভ করা তার পক্ষে আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। চোখ থেকে কান মাত্র এতটুকু সম্বল করে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে তাকে সারাটা জীবন গোলামির জিঞ্জির টেনে চলতে হয়।

বড় দুঃখে হস্তীর উদাহরণ তুলে ধরতে হলো। এতদ্বারা আমি এ কথাই বোঝাতে চাচ্ছি যে মানুষ সৃষ্টির সেরাজীব; এক বিরাট সম্ভাবনা তার মাঝে বিদ্যমান। অথচ অতি নগণ্য সংখ্যক সম্মানজনক ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সকল মানুষই নিজেদের পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ, উদাসীন অথবা ভ্রান্ত ও সর্বনাশা ধারণার শিকারে পরিণত হয়ে রয়েছে।

বলাবাহুল্য, আত্মবিশ্বাস ছাড়া কোনও দায়িত্ব গ্রহণ এবং কোনও প্রকারের উন্নতি অগ্রগতি সম্ভব হতে পারেনা। আর আত্মবিশ্বাস সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন হয় আত্মপরিচয় জানার।

www.pathagar.com

অন্য কথায় বলা যেতে পারে যে, মানুষ যদি তার সৃষ্টির লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং সেই লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার পথপদ্ধতি ও নিজের যোগ্যতা বা আত্মপরিচয় সম্পর্কে অনবহিত থাকে অথবা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে তবে যদৃচ্ছ ও স্বেচ্ছাচারীভাবে চলা এবং সীমাহীন বিপর্যয়ের সৃষ্টি হওয়াই অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। এক কথায় যাকে বলা যেতে পারে ঃ "উচ্ছন্ন হয়ে চলা আর উৎসন্ন হয়ে যাওয়া"।

বিশ্বব্যাপী দ্বন্দ্ব-কলহ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, হত্যা-ব্যাভিচার, নির্যাতন-নিপীড়ন, মারণাস্ত্রের হুংকার, বিশ্ব বিধ্বংসী মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতা, দুঃখ-দৈন্য, আর্তনাদ হাহাকার প্রভৃতি যা কিছু চলছে এটাকে উচ্ছন্ন হয়ে চলা আর উচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?

পাঠকবর্গের ভেবে দেখার জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত এ সম্পর্কীয় কয়েকটি মাত্র খবর নিম্নে অতি সংক্ষেপে তুলে ধরা যাচ্ছে—

❑ ৩/৬/৮০; বাংলাদেশের কতিপয় সংবাদপত্রের প্রকাশিত একটি খবর হলো ঃ

"প্রতিবছর বাংলাদেশে ৭৩০ কোটি টাকার সিগারেট খরচ হয়, এর মধ্যে ২০০ কোটি টাকা খরচ হয় অতি মূল্যবান বিদেশী মুদ্রায়। টুথপেস্ট, স্নো, পাউডার প্রভৃতি প্রসাধনী বাবদ খরচ হয় মাত্র কয়েক হাজার কোটি টাকা!

বলাবাহুল্য, মদ, গাজা, তামাক, বিড়ি প্রভৃতির খরচ এর মধ্যে ধরা হয়নি। অথচ বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের মানুষেরা অধিকাংশই তামাক সেবনে অভ্যস্ত।

❑ কয়েক বছর পূর্বে একটি সমীক্ষায় দেখেছিলাম, পৃথিবীতে প্রায় ৮০ লক্ষ একর জমিতে তামাকের চাষ হয়। খাদ্যশস্যের অভাবে যেখানে কোটি কোটি মানুষকে অভুক্ত অর্ধভুক্ত থাকতে হয় সেখানে ৮০ লক্ষ একর জমিতে তামাকের চাষ।

❑ ১৩৮৭। ৩০শে জ্যৈষ্ঠ দৈনিক বাংলার খবর ঃ বিশ্বের প্রতি বছর অস্ত্র সজ্জার খরচ ৫০ হাজার কোটি ডলার!

❑ ২০/৬/৮০ তারিখে ভয়েস অব আমেরিকা থেকে বলা হয়েছে— প্রেসিডেন্ট কার্টার নাকি বলেছেন, পৃথিবীতে যত খাদ্য মওজুদ রয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে মওজুদ রয়েছে গোলা আর বারুদ।

শক্তির দম্ভ, বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা, নররক্ত ললুপতা, পরমত সহিষ্ণুতার অভাব প্রভৃতি কারণে আধুনিক সভ্য জাতিগুলোর মধ্যে যেসব যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাতে যে বিপুল পরিমাণে সম্পদ ও শিশু-নারী-বৃদ্ধ নির্বিশেষে বিরাট সংখ্যক নির্দোষ নিরপরাধ এবং শান্তিকামী মানুষের প্রাণসংহার ঘটে ও অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার সৃষ্টি হয় এ প্রসঙ্গে সেকথাটিও ভেবে দেখা দরকার।

তালিকা আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না। শুধু অপরিসীম বেদনার সাথে জানতে চাই যে এগুলোকে 'পাগলের পাগলামি' অথবা 'উচ্ছন্নভাবে চলার আর উচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া' ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?

এখন প্রশ্ন হলো ঃ এই পাগলামি বা উচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি?

www.pathagar.com

বলাবাহুল্য, এই পুস্তকের মাধ্যমে সেই প্রশ্নেরই উত্তর দেয়া হয়েছে। এখানে তারই সারসংক্ষেপ হিসাবে বলা যাচ্ছে যে, একমাত্র আল কুরআনই বিশ্ববাসীকে এই পাগলামি বা উচ্ছন্নভাবে চলা আর উচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে সক্ষম। কেননা সুন্দর, সুখময়, এবং শান্তিপূর্ণ ও প্রগতিশীল জীবন গড়ার প্রেরণা ও পথ-নির্দেশ একমাত্র পবিত্র কুরআনরূপী পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানেই রয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আত্মপ্রত্যয় ছাড়া কোনও দায়িত্ব গ্রহণ সম্ভব নয়; আর আত্মপরিচয় জানা না থাকলে আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি হতে পারে না। পবিত্র কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যার মাঝে মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা, প্রস্তুতি-পর্ব, আদি মানব-মানবীর সৃষ্টি, পৃথিবীতে আবির্ভাব প্রভৃতির ইতিহাসসহ সৃষ্টির উদ্দেশ্য যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করার প্রেরণা ও পথনির্দেশ বিদ্যমান রয়েছে। বলাবাহুল্য, এসব কিছু রয়েছে বলেই পবিত্র কুরআনকে 'পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান' বলা হয়ে থাকে।

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, এমন এক অনবদ্য ও পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান বিদ্যমান থাকার পরেও মানুষের এই পাগলামি বা উচ্ছন্নভাবে চলা আর উচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ার কাজ অব্যাহত রয়েছে কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর বড়ই মর্মান্তিক এবং বেদনাদায়ক; শুধু তাই নয়— ভীষণভাবে হতাশা-ব্যঞ্জকও।

মর্মান্তিক হওয়ার কারণ হলো— এই পাগলামি বা উচ্ছন্ন হয়ে চলার ফলেই যে গোটা বিশ্বের শান্তি, কল্যাণ এবং মানবতা আজ নিশ্চিত ধ্বংসের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে সেকথা মানুষ জানে— মানবচরিত্রের আমূল পরিবর্তন ছাড়া এ ধ্বংসকে রোধ করা যে সম্ভব নয় সে উপলব্ধিও মানুষের রয়েছে, চরিত্রের পরিবর্তন ঘটানোর জন্য মানবোদ্ভাবিত পথ-পদ্ধতি যে পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ হয়েছে সেকথাও কারো অজানা নয়।

আশ্চর্যের বিষয় এতকিছুর পরও মানুষ শান্তির অন্বেষায় সেই ব্যর্থতার পথ ধরেই আকাশ-পাতাল তোলপাড় করে চলেছে; অথচ হাতের কাছে বিদ্যমান আল্লাহর দেয়া এই পূর্ণাঙ্গ, সর্বজনীন ও সুপরীক্ষিত জীবনবিধানখানা তাদের নজরে পড়ছে না।

এটাকে ভয়ংকরভাবে হতাশাব্যাঞ্জক এই জন্যই বলা হয়েছে যে, হাতের কাছে বিদ্যমান এই পূর্ণাঙ্গ, সর্বজনীন ও সুপরীক্ষিত জীবন-বিধানখানাকে এর ধারক এবং বাহক হিসাবে বিশ্ববাসীর কাছে যথাযথভাবে তুলে ধরার দায়িত্ব যাদের ওপর অর্পিত হয়েছিল সেই মুসলমানসমাজই আজ বিভ্রান্ত, দিশাহারা এবং বিপথগামী।

উক্ত জীবন-বিধানের সাহায্যে জীবন গড়ার মাধ্যমে বিশ্বের আদর্শ এবং অনুকরণীয় হওয়ার অলঙ্ঘ্য দায়িত্ব যাদের ওপর অর্পিত হয়েছিল সেই মুসলমানসমাজই যেখানে বিভ্রান্ত, বিপথগামী এবং আদর্শ-বিহীন সেখানে অন্যের কাছে আর কি আশা করা যেতে পারে?

www.pathagar.com

পথ-প্রদর্শক যদি পথ-ভ্রান্ত এবং বিপথগামী হয় তবে যাত্রী সাধারণের অবস্থা কি হতে পারে অর্থাৎ কি হওয়া স্বাভাবিক সেকথা সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু অবস্থার এখানেই শেষ নয়। পবিত্র কুরআনের মতো এমন এক পূর্ণাঙ্গ এবং অনবদ্য জীবন-বিধানের ধারক-বাহক হয়েও অতি নগণ্য সংখ্যক সম্মানজনক ব্যতিক্রম ছাড়া মুসলমানসমাজের এই বিভ্রান্তি এবং পথ-ভ্রষ্টতা গোটা বিশ্ববাসীকে পবিত্র কুরআন তথা ইসলাম সম্পর্কেই ভীষণভাবে সন্দীহান করে তুলেছে।

অতএব বিশ্বের এই পাগলামী অর্থাৎ— উচ্ছন্নভাবে চলা এবং উচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ার জন্য মুসলমানসমাজই মূখ্যত দায়ী। মুসলমানসমাজকে এককভাবে দায়ী করার কারণ হলো—

যাঁরা মানুষকে চরিত্রবান করে গড়ে তোলার মাধ্যমে বিশ্বে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন গড়ে তুলে নিজস্ব পথ-পদ্ধতিতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, যাঁরা বিশ্ব শান্তির জন্য বিশ্ব-বিধ্বংসী মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতায় নেমেছেন এবং যাঁরা খোদাদ্রোহীতাকেই শান্তি ও কল্যাণ লাভের একমাত্র উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছেন— তাঁরা কেউ অজ্ঞান বা অশিক্ষিত নন। শান্তির অন্বেষায় তাঁরা আকাশপাতাল তোলপাড় করতে পারলেন আর হাতের কাছের পবিত্র কুরআন খানা একবার তাঁরা খুলে দেখতে পারলেন না? অতএব এ ব্যাপারে তাঁরা কোনওক্রমেই নিজেদের দায়িত্বকে এড়িয়ে যেতে পারবেন না।

আল্লাহর অন্যান্য অবদানের মতো পবিত্র কুরআনেও যে সকল দেশের সকল মানুষের সমান অংশ এবং অধিকার রয়েছে আর তাই যে স্বাভাবিক এই সহজ সরল কথাটা এত জ্ঞানীগুণী হয়েও তাঁরা বুঝতে পারলেন না। সেকথাই বা কি করে বিশ্বাস করা যেতে পারে?

এমতাবস্থায় ইতিহাস অর্থাৎ মানবসৃষ্টির সূচনা থেকে শুরু করে তারে সৃষ্টির সেরা বা আল্লাহর প্রতিনিধি হয়ে গড়ে ওঠার পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা সম্বলিত যে ইতিহাস পবিত্র কুরআনে বর্ণিত রয়েছে তাকে এমন নিদারুণভাবে অবহেলা করার কারণে— সেই ইতিহাস সাধারণভাবে সকল মানুষ এবং বিশেষভাবে মুসলমানসমাজকে লক্ষ্য করে কি কথা বলে অর্থাৎ কি কথা বলা সঙ্গত এবং স্বাভাবিক আশা করি অতঃপর সেকথা খুলে বলার আর কোনও প্রয়োজন হবে না।

এই পূর্ণাঙ্গ ও সর্বজনীন জীবনবিধান বিশেষ করে এতে মানবজাতির আদি পিতা-মাতার যে ইতিহাস বর্ণিত রয়েছে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে গোটা মানবজাতি উদ্বুদ্ধ অনুপ্রাণিত হয়ে উঠুক, সকল দ্বন্দ্ব, সকল কোলাহল, সকল অন্যায় এবং সকল অসত্যের ধ্বংসস্তুপের ওপরে এক সুখী, শান্তিপূর্ণ এবং প্রগতিশীল 'বিশ্ব পরিবার' গড়ে উঠুক— মহান বিশ্বপতির দরবারে আকুলভাবে এই প্রার্থনাই করি। আমিন।

####

www.pathagar.com

ISBN 984-8747-88-5
9 8 4 8 7 4 7 8 8 5

www.pathagar.com